ইন্দ্রজিতের খাতা

ইন্দ্রজিৎ

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬

প্রমীলাকে—

প্র-না-বি’র ভূমিকা

দেশ পত্রিকার পাঠকদের সৌভাগ্যকে ঈর্ষা করি। পূরা এক বৎসরকাল তাঁহারা ইন্দ্রজিতের খাতা পড়িবার সুযোগ পাইয়াছেন। খুব সম্ভব ইন্দ্রজিৎটা ছদ্মনাম। এত নাম থাকিতে লেখক কেন ইন্দ্রজিৎ নাম গ্রহণ করিলেন জানি না, তবে পৌরাণিক ইন্দ্রজিৎ যে-বাহিনীর উদ্দেশ্যে শরক্ষেপ করিয়াছিল, আধুনিক ইন্দ্রজিতের মনে তেমন কোন ইঙ্গিত যে ছিল না, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত; তার একটা প্রধান কারণ, যদিচ দুইজন ইন্দ্রজিৎ-ই অলক্ষ্যচারী, তথাপি দ্বিতীয় জনের নিক্ষিপ্ত বস্তু আদৌ অস্ত্র নয়। ইহুদীরা যখন মুসার নেতৃত্বে ‘Promised Land’এর দিকে চলিয়াছিল, মরুভূমির মধ্যে যখন তাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল, তখন আকাশ হইতে অদৃশ্য হস্ত তাহাদের সম্মুখে Manna বর্ষণ করিয়াছিল, দুর্গম পথের দুর্লভ পথ্য, সে এক অপূর্ব খাদ্য। আমাদের ইন্দ্রজিতের সাপ্তাহিক অধ্যায়গুলি অদৃশ্য লেখকের সেই Manna বর্ষণ, বাঙলা জর্নালিজমের ধূসর মরুভূমিতে। এবারে গোটা বৎসরের সঞ্চয় গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়া বিপণির পণ্যরূপে শোভা বর্ধন করিবে আশা করা যায়। এতক্ষণ পাঠকের সৌভাগ্যের কথা বলিলাম, কিন্তু প্র-না-বি’র সৌভাগ্যও অল্প নয়। অনেক পাঠক তাঁহাকে ইন্দ্রজিৎ মনে করিয়া প্রশংসাসূচক চিঠি পাঠাইতেন। তাঁহারা অকাট্য যুক্তিসংযোগে প্রমাণ করিয়া দিতেন যে, ও-লেখা প্র-না-বি’র না হইয়া যায় না। সাহিত্য সমালোচনা করিয়াই নাকি তাঁহাদের হাড় পাকিয়াছে। পাকা হাড়ে আঘাত লাগিলে আর জোড়া না লাগিতেও পারে, আশঙ্কায় তাঁহাদের ভুল ভাঙিবার চেষ্টায় বিরত ছিলাম। তাছাড়া পরের প্রশংসা আত্মসাৎ করিবারও একটা সুখ আছে, এ যেন প্রশংসার

পকেটমারা। এতদিন যদি চাপিয়া ছিলাম, তবে এখন আবার প্রকাশ করিতে গেলাম কেন? না করিয়া করি কি? ইন্দ্রজিতের মতো তো আর সত্যই লিখিতে পারি না, কাজেই স্বীকার করিয়া ফেলিয়া উদারতা প্রদর্শন করাই এখন বুদ্ধিমানের কাজ। অপরের মতো লিখিবার বিদ্যা না থাকিতে পারে, কিন্তু অপরের প্রশংসা যে দীর্ঘকাল চাপিয়া রাখা উচিত হয় না, সেটুকু বুদ্ধি আশা করাও কি নিতান্ত অন্যায় আশা!

প্র-না-বি

ছদ্মনাম

নামকে যাঁরা নামমাত্র মনে করেন আমি তাঁদের দলে নই। তর্কশাস্ত্রে বলা হয়েছে, নাম জিনিসটা একটা অর্থহীন সংজ্ঞা মাত্র। শাস্ত্রবাক্য হলেও আমি সে কথা মেনে নিতে রাজি নই। নামের অর্থ না থাকতে পারে কিন্তু অনর্থ ঘটাবার ক্ষমতা নিশ্চয় আছে। ধরুন কারো নাম যদি রাখা হয় বৃষকেতু বর্মন তবে তার কি আর ভবিষ্যতে কোন আশা থাকে? রবীন্দ্রনাথ যতই বলুন তারিণী তলাপাত্র কক্ষণো দেশের নেতা হতে পারেন না, নিবারণ চক্রবর্তীর কবিখ্যাতিতেও আমি বিশ্বাস করি না। লোকটা যে শেষ পর্যন্ত টিকবে না সে আপনারা নিশ্চয় ওর নাম দেখেই বুঝে নিয়েছিলেন। নাম মাহাত্ম্য বড় হেসে উড়িয়ে দেবার কথা নয়। অথচ নামকরণ সম্বন্ধে এখনও আমাদের সমাজে আশ্চর্য রকমের শৈথিল্য দেখা যায়। চিঠির গায়ে সীল মারবার মত একটা যা হোক কিছু নামের ছাপ মারলেই হল। এ বিষয়ে পূর্ববঙ্গের চাইতে পশ্চিম বঙ্গে আরো বেশি শৈথিল্য—ষষ্ঠীচরণ, কেনারাম, ফেলারাম কিম্বা লম্বোদর—এ সব নাম পূর্ববঙ্গে বড় একটা দেখা যায় না। নামকরণে যদি ব্যক্তিত্বের লঘুকরণ হয় তবে সেটা বাস্তবিকই শোকাবহ। আমার মতে মানুষের জীবনের চাইতেও নামের মূল্য বেশি। জীবনটা চিরকাল থাকবে না, কিন্তু নামজাদা হতে পারলে নামটা থেকে যেতেও পারে। জীবন অমর হয় না, নামই অমর হয়।

আমাদের যখন জন্ম হয়েছে তখনও নবজাত শিশুর নামকরণের জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্না দেবার রেওয়াজ হয়নি। বাপ-মা আপন বুদ্ধি বিবেচনা অনুযায়ী নাম রাখতেন; সেটা নাম না হয়ে প্রায়ই বদনামে

দাঁড়াত! বাপ-মা আবার ছেলেমেয়েদের বলতেন বড় হয়ে নাম রাখতে হবে। আমাকেও আমার কর্তৃপক্ষ তাই বলেছিলেন। কিন্তু কি করে নাম রক্ষা করতে হয় সে প্রক্রিয়া আমি আজও ভাল করে শিখিনি! পাছে নাম ডুবিয়ে দিই এই ভয়ে আমার নামটাকে প্রকাশ্যে বড় একটা ব্যবহারই করি না। এই ক'রে কোনো রকমে ঢেকে ঢুকে নামটা আজ পর্যন্ত রক্ষা করে এসেছি।

উপরে যে নামটা ব্যবহার করছি সেটা আত্মরক্ষা কিম্বা নামরক্ষারই একটা উপায়। আত্মরক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা আত্মগোপন। আপনারা সকলেই জানেন আত্মগোপনের কৌশল সর্বাগ্রে আবিষ্কার করেছিলেন বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ। মেঘের আড়াল থেকে লড়াই করতেন, নিক্ষেপ করতেন নাগপাশ অস্ত্র কিম্বা আর কোন অগ্নিবাণ। আজকাল সাহিত্য-রথীরা ছদ্মনামের আড়ালে থেকে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করেন। শত্রুর বর্মভেদ না হলেও পাঠকের মর্মভেদ হয়।

বাঙলা সাহিত্যের আসরে এঁরাই এখন ছদ্মনামের মুখোস পরে জাঁকিয়ে বসেছেন। মুখোস দেখে কাউকে চিনবার উপায় নেই, মাঝে মাঝে চেনা গলার আমেজ পাওয়া যায়, এই পর্যন্ত। কিন্তু এ বড় অদ্ভুত রীতি বলতে হবে। আপনারা বলেন সমাজ এবং সাহিত্য একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট অথচ সমাজনীতি এবং সাহিত্যনীতি দেখছি বিভিন্ন। কেউ যদি বেনামা চিঠি লেখেন সমাজের চোখে সেটা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার হয়, অথচ সাহিত্যে বেনামা প্রবন্ধ গল্প কবিতা লেখাটা একরকম ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। হিন্দি সাহিত্যে প্রত্যেকটি কবি ছদ্মনামে লিখে থাকেন। স্বনামে লিখবার রেওয়াজই ওখানে নেই। এর কারণ আমি খুঁজে পাইনি। কবিতা লেখাটা কি তবে লজ্জার ব্যাপার যে কেউ নিজ নামে প্রকাশ্যে লিখতে চান না? ইংরেজ সাহিত্যিক জি কে চেস্টারটন বলেছিলেন—

I hope some day to see an anonymous article counted as dishonourable as an anonymous letter.

সত্যি বলতে কি আমিও ছদ্মনামের বিরোধী। বিশেষ করে, স্বনামে এবং বেনামে দুভাবেই যাঁরা লিখে থাকেন আমি তাঁদের মনোভাবের প্রশংসা করতে পারিনে। বেনামা সম্পত্তি ক্রয় করবার মধ্যে যেমন সন্দেহজনক মতলব থাকে, বেনামা লেখার মধ্যেও গুপ্ত কোন মতলব থাকা স্বাভাবিক, বোধ করি ফাঁকি দিয়ে ডবল যশ আদায় করবার চেষ্টা। প্রমথ চৌধুরী মশায় দিগ্বিজয়ী লেখক, অমনিতেই যশের অন্ত নেই। আবার বীরবল সেজে আর এক দফা যশের ট্যাক্সো আদায় করেছেন, এতো রীতিমত Exploitation। গল্প উপন্যাস কবিতা যখন লিখেছেন তখন তিনি প্রমথ চৌধুরী আর হাল্কা সুরে কঠিন কথা যখন বলেছেন তখন তিনি বীরবল। চলন্তিকা অভিধান কিম্বা পরিভাষামূলক প্রবন্ধ লিখবার বেলায় রাজশেখর বসু আর সমাজকে ব্যঙ্গ করবার সময় কুঠারধারী পরশুরাম। দেখুন তো ব্যাপার—যাঁরা নামে এক, বেনামে আর, তাঁদের ওপরে আমরা আস্থা স্থাপন করি কেমন করে? অবশ্য বনফুলের কথা আলাদা। বনফুলের গল্প পড়ে আমরা যতখানি আনন্দ পাই বলাইচাঁদ বাবুর গল্প পড়ে কি ততখানি আনন্দ পেতাম? অনেককাল আগে দিকশূন্য ভট্টাচার্য্য নামে এক ব্যক্তি 'সমালোচনী' পত্রিকায় দু-একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিরা অনেক সময় দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে থাকেন বটে কিন্তু তাই বলে দিকশূন্য নামটা মোটেই কবিজনোচিত নয়। পরে যখন সেই কবিতা গ্রন্থসন্নিবিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হয় তখন দেখা গেল কবির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কবি দিকশূন্য অল্পকাল মধ্যেই দিগন্তে মিলিয়ে গেছেন। কিন্তু ইস্কুলে যখন পড়তাম তখন পদাবলীর কবি ভানুসিংহ যে জ্ঞানদাস কিম্বা গোবিন্দ দাসের সমকালীন এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। শরৎবাবু

নারীচরিত্র বিশারদ, কিন্তু নারীর আসল মূল্য যাচাই করতে গিয়ে তাঁকেও ঘোমটা টেনে অনিলা দেবী সাজতে হয়েছিল। আমাদের ছদ্মনামা লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সোরগোল বাধিয়ে ছিলেন অপরাজিতা দেবী। সে রহস্য আজ পর্যন্তও উদ্‌ঘাটিত হয় নি। শুনেছি অতি মাত্রায় উৎসাহী পাঠকেরা নাকি এক সময়ে ডিটেকটিভ লাগাবার কথাও ভেবেছিলেন। আর দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে কাজ নেই। ছদ্মনামাদের মধ্যে আরো অনেকেই আজ যশস্বী লেখক। সে যশ তাদের ন্যায্য পাওনা; তাঁরা সকলেই সার্থক লেখনী।

পাতা ঢাকা ফুল এবং ঘোমটা আটা মুখের প্রতি যেমন স্বভাবতই কৌতুহলটা বেশি হয়, চাপা দেওয়া নামও তেমনি অতি সহজে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে ছদ্মনামটা যদিও আত্ম-গোপনের চেষ্টা বলে মনে হয়, আসলে কিন্তু ওটা আত্মপ্রচারেরই কৌশল। কাজেও দেখা গেছে বেনামী লেখকেরা যত সহজে নাম করেছেন স্বনামীরা তত সহজে নয়। অপরাজিতা দেবীকে ছন্দে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

এইতো দেখনা, নাম ঢাকা তব নাম
নামজাদা খ্যাতি ছাপিযে যে ওর দাম।

কিছু মিথ্যা বলেন নি। এখন আমার ছদ্মনাম গ্রহণের আসল কারণটা বোধকরি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। নামটা যাতে চতুর্দ্দিকে ছড়িযে পড়ে সেই জন্যই অত করে নাম গোপনের চেষ্টা। অবশ্য ইন্দ্রজিৎ নামটাতে গৃহিণী প্রমিলা দেবী একটু আপত্তি করেছিলেন। একের মুখের নাম পাছে দশের মুখে ঘুরে বেড়ায় এইটেতেই ওঁর আপত্তি।

আড্ডা

আমার ঘরে নিত্য একটি আড্ডা বসে। আড্ডাটি ছোট, কিন্তু ছোট বলেই খুব জমাট। দশ হাত লম্বা আট হাত চওড়া ছোট্ট ঘরটিতে বসে আমরা এই বিপুলা পৃথ্বীর বৃহত্তম সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করি, আবার ক্ষুদ্রতম জিনিসও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তুচ্ছ জিনিসকে আমরা তাচ্ছিল্য করি না, সামান্যকে অসামান্য করে নিই। আড্ডার রস ওখানেই জমে বেশি। মুখে মুখে কথা পাক খেয়ে বেড়াতে থাকে আর তার নির্যাসটুকু জমা হয় গিয়ে ইন্দ্রজিতের খাতায়। গল্প আছে, কবি ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' গ্রন্থ সমাপ্ত করে গিয়েছেন রাজসভায়। গ্রন্থখানা মহারাজের হাতে তুলে দিয়ে বললেন, মহারাজ ভালো করে ধরুন, রস গড়িয়ে পড়ে না যায়। গল্পটা শুনে আপনারা বলবেন, ওটা অতিশয়োক্তি। হলই-বা অতিশয়োক্তি। রায়গুণাকর যে রসের কারবার করতেন, সেটা আদিরস—সেটা গড়িয়েই যায়, মনকে রসসিক্ত করে না। আমাদের কারবার অন্ত্যরসের—সব পরীক্ষা পার হয়ে যে বাক্য রসোত্তীর্ণ হল, তাকেই বলে রসমাধুরী। এই সান্ধ্য আড্ডাটিতে বসে আমরা রসসিন্ধু মন্থন করি। সে মন্থনে যে অমৃতটুকু ওঠে, সেটিই হচ্ছে ইন্দ্রজিতের কথামৃত।

মানুষের মুখের কথা যে কত মনোহারী তা আমি জীবনভর আড্ডা দিয়ে বুঝেছি। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু আড্ডারূপেন সংস্থিতা, আমি সেই দেবীর পূজারী। আমি আসলে কথক মানুষ—লেখক নই। সব মানুষই কথক, কেন যে মানুষ লেখে! কথাটাই নিয়ম, লেখাটাই ব্যতিক্রম। In the beginning was the Word. বিধাতার প্রথম সৃষ্টি 'কথা', শব্দই ব্রহ্ম। লেখার সৃষ্টি থেকে কথার আর্ট নষ্ট হয়ে

গেছে। ভালো লেখেন অনেকে, ভালো কথা বলেন ক'জন? আমাদের কথক সম্প্রদায় আজ কোথায়? এককালে তাঁরাই ছিলেন লোকরঞ্জন শিক্ষক। এখন হয়েছে ছাপার বইয়ের মারফৎ শিক্ষা, এইজন্যই শিক্ষার এই দুর্গতি। আগে ছিল চারণ কবি, ইয়োরোপের মিনস্ট্রেল বা ট্রুবেদর সম্প্রদায়। এখন যত সব কালিতে ছোপানো কবি। কবিত্বের আদর কি আগের মতো আছে? হিন্দি ভাষায় আজ পর্যন্তও কবিতামাত্রই গান করে শোনানো হয়। ইংরেজি সাহিত্যে দিগ্বিজয়ী নাম রেখে গেছেন ডক্টর জনসন। লিখেছেন কতটুকু? একখানা অভিধান—সে অভিধান আজ কেউ ব্যবহার করে না। আর লিখেছেন —Lives of the Poets. সে গ্রন্থের মতামত আজ অগ্রাহ্য। তবু কেন সাহিতেব সিংহাসনে তাঁর আসন অটল হয়ে আছে? তার কারণ তিনি ছিলেন অপরাজেয় কথাশিল্পী (প্রচলিত অর্থে নয়)। ডক্টর জনসনের সাহিত্য আর কিছু নয় তাঁর কথামৃত। তাঁর মুখনিঃসৃত অগণিত বাক্য প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছে। কোলরিজ উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনিও লিখেছেন যৎসামান্য। সমালোচকদের মতে তাঁর উল্লেখযোগ্য সব কবিতা মিলিয়ে কুড়ি পাতা হবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু আলাপচারী হিসেবে তিনি ছিলেন অসাধারণ, হ্যাজলিটের লেখায় তার সাক্ষ্য। কোলরিজের এক বন্ধু বলেছিলেন—He talks far above singing. কোথায় লাগে গান, মুখের কথার কাছে!

ঐ দেখুন কথার এমনি মোহ, কোন কথা থেকে কোথায় চলে এসেছি। বলছিলুম, আমাদের আড্ডার কথা। গোড়ার দিকে যা বলেছি, তা থেকেই বুঝতে পারছেন, এই কথামৃত আমার একলার নয়। আমাদের এই মধুচক্রে আমি একমাত্র মক্ষিকা নই, সকলে মিলে মধু সংগ্রহ করেছি। আমি শুধু পরিবেশনকারী। এখন গৌড়জন সুধাপানে আনন্দিত হলেই হয়। এই আড্ডাচারীদের কাছে আমার

ঋণের অন্ত নেই। এঁরা বয়সে আমার চাইতে ছোট, কিন্তু আন্তরিকতায় বড়। আমার সম্বন্ধে এঁদের অকৃপণ উদারতা। আমার মধ্যে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং মানসিক দুর্বলতা আছে। অপরের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। আপনাদেরও লাগে, যদিচ আপনারা সেটা স্বীকার করতে চান না। নিন্দা কিংবা প্রশংসায় যাঁদের যায় আসে না, তাঁরা অবশ্যই মহাপুরুষ। তাঁদের আমি দূর থেকে ভক্তি করি, কিন্তু নিজের বেলায় দেখেছি অত্যন্ত নির্বোধ ব্যক্তির প্রশংসায়ও আমি পুলকিত হয়ে উঠি। যার রসবোধের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই, তার নিন্দায়ও অতিশয় মর্মাহত হয়েছি। এ হেন প্রশংসা-লোভী ব্যক্তি যদি গুণীলোকের প্রশংসা পায়, তবে তো কথাই নেই। আমার আড্ডাচারীরা সকলেই গুণী—কেউ-বা লেখক কেউ-বা সমালোচক। আমি লিখি যৎসামান্য! কোনক্রমে যদি এক পাতা লিখে উঠতে পারি, তবে আর তর সয় না। খাতাটা খুলে বলি, একটা জিনিস লিখতে শুরু করেছিলাম, কেমন হয়েছে দেখুন তো। পড়তে না পড়তে উল্লাসধ্বনি শুরু হয়, চমৎকার হয়েছে, খাসা হয়েছে। এইতো মুস্কিল করলেন, আদ্ধেকটা শুনিয়ে রাখলেন, কালকে এসে বাকীটুকু না শোনা পর্যন্ত সোয়াস্তি নেই। জানি এ সবই অতিশয়োক্তি; কিন্তু তাতে কি এসে যায়, যদি এঁদের উচ্চকণ্ঠ তারিফের তাগিদে আমার লেখাটি পরদিনের মধ্যে শেষ করে ফেলতে পারি। এই প্রশংসাবারিটুকু সিঞ্চিত না হলে আমার মনে লেখার ফসল কক্ষনো ফলত না। আড্ডার আর সব বন্ধুরাও স্বীকার করেছে যে, পরস্পরের প্রশংসায় তাঁদেরও যথেষ্ট উপকার হয়েছে। প্রশংসায় কখনো কারো ক্ষতি হয় না—প্রশংসা জিনিসটা Twice blest, it blesses him that gives and him that receives.

এমনকি, আত্মপ্রশংসাও কিছু খারাপ জিনিস নয়, আমি সেটা

প্রচুর পরিমাণে করে থাকি। আমাদের আড্ডায় পরনিন্দা, পরচর্চাও যে কিছু কিছু হয় সেটা বলাই বাহুল্য; নইলে আড্ডার ঠিক রূপটি ফুটে ওঠে না। আমাদের একজন সভ্য বলেন, এক-আধটু পরচর্চা না করলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে না।

আড্ডা এমনি জিনিস—শ্মশানের মতো এখানে এলে সকলকে সমান হতে হয়। বিভিন্ন মতবাদীরা ফ্রয়েড আর মার্কস, বেদান্ত দর্শন আর কনফিউসিয়াস এর জারক রস মিশিয়ে অপূর্ব মাদক-দ্রব্য প্রস্তুত করেন। পরস্পর-বিরোধী মতবাদীরা মিলে মিশে এক হয়ে যায়। এমন যে কমিউনিষ্ট সেও পার্টির কথা ভুলে যায়। আর বিদেশী যে ভদ্রলোকটি এখন আমাদের নিয়মিত সভ্য, তিনি জুতো খুলে ট্রাউজার গুটিয়ে দিব্য জোড়াসন হয়ে লেপটিয়ে বসেন। পাত্রের অভাবে অপাত্রে, অর্থাৎ গেলাসে চা খান। ভদ্রলোক প্রথমটায় ছিলেন অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত। গোড়াতেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনাদের কি ধরণের আলোচনা? বললুম—

We discuss about the whatness of which and the whichness of what.

অর্থাৎ ছোটবড় খুটিনাটি সব কিছু। ওঁর ধারণা ছিল—আমরা নব্য ইণ্টেলেকচুয়েলের দল, এখানটায় বসে বিরাট বিশ্ব-সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করি। কিন্তু প্রথম দিনের আলাপ শুনে তিনি তো অবাক—রাশিয়ান ফ্রণ্ট, আধুনিক কবিতা থেকে শুরু করে ফুলুরি ভাজা, এমনকি, ব্যাঙাচির প্রাণতত্ত্ব কিছুই বাদ যায় নি। ভদ্রলোকের মুখ দেখে বুঝলুম, উনি নিরাশ হয়েছেন। জিজ্ঞেস করলুম, কেমন লাগল? হ্যাঁ তা ভালই ত। তারপরে একটু ইতস্তত করে বললেন—

But we must make the world safe for democracy.

আমি হেসে বললুম, নিশ্চয়, নিশ্চয়, ডিমক্রেসি বিপন্ন হলে তো আড্ডাও বিপন্ন।

Our immediate task is to make the world safe for আড্ডা।

স্নব

বাঙলা প্রবন্ধের ইংরেজি নাম কোন কাজের কথা নয়। কিন্তু 'স্নব' শব্দটার বাঙলা প্রতিশব্দ অনেক চেষ্টা করেও খুঁজে পাইনি। যাহা নাই ভাষাতে তাহা নাই দেশেতে—একথা যদি বলতে পারতুম, তবে খুবই সুখের কথা হত। দুঃখের বিষয়, স্নবারি জিনিসটা ক্রমে সংক্রামক রোগের মত আমাদের সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে। এইতো দেখুন না আপনারা এ পর্যন্ত ইন্দ্রজিতের খাতার দুটি পাতা মাত্র পড়েছেন, তা থেকে আর কিছু মালুম হোক বা না হোক এটুকু অন্ততঃ বুঝতে পেরেছেন যে, আমি একটি প্রথম শ্রেণীর স্নব। যাঁরা এখনও বুঝতে পারেন নি, তাঁদের কাছে আমার স্বরূপটা ক্রমশ প্রকাশ্য।

আমাদের ভাষায় স্নব কথার প্রতিশব্দ যে আজ পর্যন্ত দেখা দেয়নি, তার কারণ এ-জীবটি আমাদের সমাজে হালের আমদানী। এ জীবটি বঙ্গজ, কুলীন নয়, বিজাতীয় কুলীন। ওর কৌলিন্য জন্মগত নয়, আচারগত—অশন-আসন, বসন-ভূষণে। বংশগত কৌলিন্যের দিন গিয়েছে, এ-যুগের কৌলিন্য শিক্ষাগত এবং রুচিগত। আবার যে জিনিস শিক্ষার দ্বারা অধিগত হয়, সে জিনিস ক্রমে মজ্জাগত

হয়ে আসে। কিন্তু স্নবের যে কৌলিন্য, সেটা হাড়ে-মাংসে-মজ্জায় লাগে না বাইরের একটা প্রলেপ মাত্র। ওটা একটা সামাজিক প্রসাধন। যে কালচার বা মানসিক কৌলিন্য একমাত্র সাধনার দ্বারা লভ্য, সে জিনিস প্রসাধনের দ্বারা লাভ করা অসাধ্য।

স্নবারি আমাদের সমাজে হালের আমদানী বললে কথাটা স্পষ্ট হয় না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ইংরেজ আমলের আগে আমাদের দেশে স্নব ছিল না। হঠাৎ একটা নতুন জিনিস এসে চোখ ধাঁধিয়ে দিলে যে দশা হয়, সেটাই স্নবের মূর্ত্তি। মাইকেল মধুসূদন বোধ করি আমাদের দেশের সর্বপ্রথম স্নব। মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তিরও যে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে, মধুসূদন তার দৃষ্টান্ত। এক মোহর দিয়ে চুল ছাটিয়ে বন্ধুদের কাছে এসে বাহাদুরি করা কিংবা বাঙলা কি একটা ভদ্রলোকের ভাষা, ও-ভাষা ভুলে যাওয়াই ভাল—এসব হচ্ছে স্নবের উক্তি। অত্যুজ্জ্বল প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলেই সেই স্নবারি থেকে তিনি পরে মুক্তি পেয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর স্নবারি তাঁকে বিসদৃশ করেনি, ইণ্টারেষ্টিং করেছে। প্রথম ইংরেজিয়ানার উন্মাদনায় অনেকেরই সেদিন মতিভ্রম হয়েছিল। স্নবারির বন্যায় বোধ করি দেশ ভেসে যেত যদি না বিদ্যাসাগর তার গতিরোধ করতেন। বিদ্যাসাগর পরশুরামের ন্যায় কুঠার হস্তে সে-যুগের স্নবকুল নির্মূল করেছিলেন। ভূদেব ও রাজনারায়ণও এ-কাজে সহায়তা করেছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশায় সাময়িকভাবে মাত্র ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। তার পরে আবার এসেছে বন্যা, দ্বিগুণ বেগে। দেখা দিল ইঙ্গ-বঙ্গ স্নবের দল, কুঞ্চিত ভ্রূ, উদ্যত-নাসা—নেটিভ, সব কিছুর প্রতি নিদারুণ অবজ্ঞা। এরা এক বছর বিলেতে থেকে পঁচিশ বছরের দিশী মাটি জল হাওয়ার আবরণ ঘুচিয়ে আসতেন। পুণ্যসলিলা টেমস্ নদীতে স্নান করে স্নবারি-ধর্মে দীক্ষা নিতেন। আজকাল তো আর অত হাঙ্গামা করতেই হয় না।

ফারপোতে লাঞ্চ খেয়ে চৌরঙ্গীর হাওয়া গায়ে লাগালেই স্নবারির স্বর্গোদ্যানে পাসপোর্ট পাওয়া যায়। পশ্চিমী সভ্যতা ধীরে ধীরে আমাদের সভ্যতার ভিত্তিকে জীর্ণ করে দিয়েছে। আমাদের সভ্যতার বাহন মন, পশ্চিমের সভ্যতার বাহন যন্ত্র। যান্ত্রিক মন স্নবারির জন্মভূমি।

এই সূত্রে স্নবারির জন্মবৃত্তান্তটা সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে য়ুরোপের সমাজেও স্নবের দর্শন মিলে না। এর আগে ও-দেশেও ছিল বংশগত কৌলীন্য। যে-জিনিস বনেদি, সে জিনিসের মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। কৃত্রিম শিক্ষা ও ধার করা রুচিকেই বলে স্নবারি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউশন। তার ফলে য়ুরোপীয় সমাজে হঠাৎ এক নতুন শ্রেণী দেখা দেয়। এরা বংশগত কুলীন নয়, ব্যবসাগত। হঠাৎ অর্থাগমে এরা সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেছে, পুরানো অভিজাতদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসেছে। হালচাল, কায়দা-কানুনগুলো ওদের কাছ থেকে রাতারাতি অনুকরণ করেছে। এই অনুকরণসাধ্য আভিজাত্যের নাম স্নবারি। গোড়ার দিকে ছিল দুটি মাত্র শ্রেণী—মুষ্টিমেয় ধনিক আর সকলেই শ্রমিক। ক্রমে উচ্চ মধ্যবিত্ত, পরে দেখা দিল নিম্ন মধ্যবিত্ত। পূর্ব্বোক্ত অনুকরণপ্রয়াস ক্রমেই সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, স্নবারিও সেই পরিমাণে বিস্তৃত হয়েছে' এভাবেই স্নবের জন্ম এবং ক্রমে বংশবৃদ্ধি। আয় যৎসামান্য, কিন্তু ঠাট বজায় রাখতে হবে, এটিই হল নিম্ন মধ্যবিত্তের ট্র্যাজেডি তথা স্নবারির ট্র্যাজেডি। ঠাট রাখতে প্রাণান্ত, সেই সঙ্গে যদি ঠাটান্ত হত, তবে সমাজ রক্ষা পেত।

আমাদের দেশেও ইংরেজি শিক্ষা এবং পাশ্চাত্য যান্ত্রিক সভ্যতার আমদানীর সঙ্গে সঙ্গে স্নবের উৎপত্তি হয়েছে। সদ্য ইংরেজি শিক্ষার গরবে এরা নির্লজ্জভাবে সাহেবিয়ানার মহড়া দিয়েছে। আর একদল ব্যবসার দৌলতে রাতারাতি বড়লোক হয়েছে। এরা

হঠাৎ-গজানো ভদ্দর লোক সম্প্রদায়—আধা দিশি, আধা বিলিতি। রুচি যেখানে বিকৃত, সেখানে ফ্যাশানের জন্ম। ফ্যাশান হচ্ছে রুচির জারজ সন্তান। কথাটা আর একটু স্পষ্ট করে বলা দরকার। আমি যাদের স্নব বলছি, তাদের নিজস্ব রুচি বলে কোন বালাই নেই, এরা ফ্যাশানধর্মী। এদের রুচি পরকীয়। পররুচি খানা, পর রুচি পরনা, পররুচি সব কুছ্ করনা। নিজের ভাল লাগা না লাগাকে বিসর্জন দিয়েছে সামাজিক রুচির কাছে। বিংশ শতাব্দীর রাজসভায় এই জীবটি হচ্ছে দশম রত্ন—নাম পর্ রুচি। ইচ্ছে করলে এই নামটি আপনারা স্নবের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করতে পারেন।

যাক্‌গে, স্নবদের অনেক নিন্দে করলুম তাই বলে আপনাদের নিন্দে করিনি কিন্তু। মিছিমিছি কেউ নিন্দে গায়ে পেতে নেবেন না যেন। বরং নিজেকেই গাল দিয়েছি, বলেছি তো আমি নিজে একটি স্নব। কিন্তু স্নবদের ভালোর দিকটাও দেখতে হবে। নিখুঁত এদের ভদ্রতা। তাতে সামান্য একটু আতিশয্য আছে, সেটাতে একটু পিনের খোঁচার মত লাগে। তাছাড়া পরোক্ষভাবে এঁরা সমাজের কিছু কল্যাণও করেছেন। এঁরা আমাদের জীবন-ধারণের মান অর্থাৎ standard of living একটু বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেজন্য এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। ভালো খেতে হবে, ভালো পরতে হবে, ভালো থাকতে হবে—সমাজে এই বোধ জন্মানো নিতান্ত প্রয়োজন।

অবশ্য কালাবাজারের কাদা মাটিতে ইদানীং এক অভিনব স্নব সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। কালাবাজারের চুণকালি মাখা এদের মূর্ত্তি। এরা স্নবকুলকলঙ্ক। দোহাই আপনাদের এদের কখনো প্রশ্রয় দেবেন না। জীবনের সমস্ত decency-কে এরা পায়ে মাড়িয়ে মেরেছে, একথাটি ভুলবেন না। কে যেন বলেছেন—

the best way to treat a snob is to tread on his toes until he apologizes.

কালোবাজারী স্নবদের দেখলে দয়া করে একথাটি স্মরণ রাখবেন।

ভিড়

আমার এই বন্ধুটি ভিড় একেবারে সইতে পারেন না। তিনি ভিড়ের মানুষ, কার্যব্যপদেশে ওঁকে ভিড় ঠেলাঠেলি করতে হয়। সেই কারণেই ভিড়ের প্রতি ওঁর এতটা বিরাগ জন্মেছে। আমি ঘরকুনো মানুষ, জনতার সঙ্গে আমার তেমন যোগ নেই; হতে পারে সেজন্যই ভিড়ের প্রতি আমার একটা স্বাভাবিক মোহ আছে। বন্ধুরা বলেন ওটা নাকি আমার অবাস্তব কল্পনাবিলাস। অনেক সময় কবিত্ব করে ওঁদের কাছে বলেছি শঙ্খের মধ্যে কাণপেতে শুনলে যেমন মহাসমুদ্রের কল্লোল শোনা যায় রাজপথে কানপেতে শুনলে তেমনি মহামানবের প্রাণ-স্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। বন্ধুরা শুনে হাসেন। বলেন, ভিড়ের ঠেলায় আগে প্রাণ বাঁচলে তবে তো মহামানবের প্রাণস্পন্দন, আপনিও যেমন! দেখছি ভিড় বলতেই ওরা একটু ঘর্মাক্ত ক্লেদাক্ত কটুগন্ধযুক্ত বিভীষিকা চোখের সামনে খাড়া করেন; বলেন, আসল বস্তুর সঙ্গে আপনার যোগ নেই কিনা তাই অমন জিনিস নিয়েও আবার কবিত্ব করেন।

ওঁরা যখন এই বাস্তব অবাস্তবের কথা তোলেন তখন আমার বড় মনে লাগে। আরে, চল্লিশ কোটি লোকের দেশে আমাদের বাস, ভিড়কে ভয় করলে চলবে কেন? ভিড়ের দেশে জন্ম, ভিড়ে আমাদের জন্মগত অধিকার। আমাদের দেশে সর্বত্র ভিড়—রাস্তায় ভিড়, দোকানে

ভিড়, রেলে ষ্টীমারে ভিড়, ঘরে ভিড়, বাইরে ভিড়। ভিড়ের মাঝে জন্ম যেন ভিড়ের মাঝেই মরি—একথা কেবল ভারতবাসীই বলতে পারে। এহেন দেশে ভিড়কে ভয় করাইতো আমার কাছে একটা অবাস্তব বিলাস বলে মনে হয়। সমালোচকরা একে বলেছেন, পলায়নী বৃত্তি। ভিড়ের ভয়েই তো আমাদের মুনি ঋষিরা বনে কিম্বা পর্বতগুহায় আশ্রয় নিয়েছেন। আজকালের সাধুসন্তরা আশ্রয় নেন মঠে কিংবা আশ্রমে। সঞ্জীববাবু তো বলেই রেখেছেন মুনিঋষিরা প্রতিবেশীহীন গৃহী মাত্র। কাজেই এঁরা যে পলাতক এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। প্রতিবেশী যে কি ভয়ংকর প্রাণী তা আর আজকের দিনে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। কতখানি হিংস্র হলে তবে এর ভয়ে লোকে বনে গিয়ে আশ্রয় নেন। বনের পশু বরং শ্রেয় তবু প্রতিবেশী নয়। অবশ্য সঞ্জীববাবু যে সব ভয়ের উল্লেখ করেছিলেন সেগুলো যৎসামান্য। প্রতিবেশীর ছাগল এসে আমার পুষ্পবৃক্ষ নিষ্পত্র করলে এমন কিছু অনর্থ ঘটে না, কিন্তু প্রতিবেশীর ছেলে যদি ছোরা হাতে এসে আমার বংশ নিপাত করে তবে ব্যাপার অবশ্যই গুরুতর হয়ে ওঠে। পুরাকালে প্রতিবেশীর ভয়ে লোকে আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে, এযুগে refugee campএর ব্যবস্থা হয়েছে।

অতি সাধারণ ভিড়ের কথা বলতে গিয়ে বড় বড় সমস্যার কথা এসে যাচ্ছে। তা আসুক না। ভিড়ের মধ্যেই সমস্যা আবার ভিড়ের মধ্যেই সমাধান। ভিড়ের মধ্যেই শক্তি, ওখানেই মিলনের ক্ষেত্র। যেখানে গা ঘেঁসাঘেঁসি নেই সেখানেই মন কষাকষি। ইংরেজি প্রবাদবাক্য বলে—In the crowd there is wisdom. আমি ঐ প্রবাদবাক্যে বিশ্বাস করি। অথচ আমার বন্ধুরা যেমন জনতার প্রতি অবিচার করেছেন, কত কত মহারথীরাও তাই করেছেন। ধরুন সেক্সপিয়র—অনেক সব Villainএর চরিত্র এঁকেছেন, সে সব

Villainএর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে। কিন্তু তা ছাড়াও তাঁর গ্রন্থে আর একটি Villain আছে। তার নাম হচ্ছে Mob. জনতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল না। জুলিয়স সিজার নাটকের mobকে একটি Villain চরিত্র হিসাবেই ধরা যায়।

We'll mutiny. Go fetch fire. With the brands burn the traitors' houses. Pluck down benches. Pluck down forms, windows, anything.

এই জাতীয় mobএর সঙ্গে ইদানীং আপনাদের বিলক্ষণ পরিচয় হয়েছে। আমার বন্ধুরা বলেন, এর পরেও যদি জনতার প্রতি আপনার ভক্তি অচলা থাকে তবে আমরা নাচার। আমি সত্যি বলছি জনতার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমেনি। Mobএর যে ভয়াবহ মূর্তিটা আপনারা হালে দেখেছেন সেটা তার একটা দিক মাত্র। অপর দিকটাও আবার দেখুন। এই mobই তো Bastille ধ্বংস করেছে, বুরবোঁ অত্যাচারের অবসান ঘটিয়েছে, এই mobএর কাছেই পরাজয় স্বীকার করেছে—the Czar of all the Russias. দোষ জনতার নয়, জননায়কের। আমাদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্বন্ধে খবরের কাগজে প্রায়ই দেখি—there must be brain behind the thing. আমি বলি কি—এর পেছনে মস্তক আছে, কিন্তু মস্তিষ্ক নেই। থাক্‌গে এসব কথা। আমার আসল বক্তব্যে ফিরে আসা যাক্‌।

পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্ম নগরে, আমাদের সভ্যতার জন্ম তপোবনে অর্থাৎ ওদের সভ্যতা ভিড়কে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, জনতার সঙ্গে তার যোগ প্রত্যক্ষ। সেজন্য সে সভ্যতা বাস্তব সভ্যতা। সবাই হাত লাগিয়েছে, সকলে মিলে সভ্যতার ইমারত গড়ে তুলেছে। আমাদের সভ্যতার বাস্তব ভিত্তি নেই, কারণ পথচারী জনতার সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নেই। একান্ত নিমগ্ন মহাপুরুষের সাধনার মধ্যে তার জন্ম—

লোকালয়ের বাইরে। আমাদের সভ্যতা লোকাতীত সভ্যতা। সে জিনিস যতই বড় হোক্, সাধারণ মানুষের মনে ততখানি সাড়া জাগায় না, কারণ জনসাধারণ সে সভ্যতাকে নিজ হাতে গড়ে তোলেনি। যে জিনিসের আয়োজনে আমার হাত নেই সে জিনিসে আমার প্রয়োজনও নেই।

মহামানবের যুগ গিয়েছে, এখন বহু-মানবের যুগ (ইংরেজী ডিমোক্রেসি কথাটা আমার পছন্দ নয়)। যেখানে বহুমানবের মিলন সেখানেই শক্তির মিলন, সেখানেই সিদ্ধি। এসব কথা পুরাকালের লোকেরা যে একেবারে না বুঝতেন এমন নয়। মেলার প্রথা নইলে কিসের থেকে হ'ল? এ যুগেও বাঙালীর জাতীয় একতার প্রথম চেষ্টা হয়েছে নবগোপাল মিত্র প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু মেলা'র ভেতর দিয়ে—ইউরোপেই বরং এ জিনিসটা ছিল না। ওদের দেশের exhibition ইত্যাদির চলন হালের আমলে। বোধ করি, এদেশ থেকেই শেখা।

আমাদের দেশে তীর্থে তীর্থে ভিড়। আপনারা অনেকেই তীর্থভ্রমণ করেছেন। আমি এক আধ যায়গায় মাত্র গিয়েছি। দেবদ্বিজে আমার ভক্তি নেই, দেবতার প্রতি আকর্ষণ নেই। কিন্তু তীর্থস্থানে আমিও আমার প্রণাম রেখেছি। দেবতার পায়ে নয়—বহুমানবের পায়ে—সেই আমার তীর্থক্ষেত্র। ভক্তেরা পাঠ করেন বৈষ্ণব পদাবলী, আমি পাঠ করি পদ-চিহ্নের পদাবলী।

থার্ড ক্লাশ

বন্ধুরা বলছেন, ভিড় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি আসল কথাটা এড়িয়ে গিয়েছি। ওঁরা বলেন, ভিড় বলতে আমরা বুঝি ট্রামে-বাসের ভিড়, রেল-ষ্টীমারের ভিড়, হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে ঝুলে যাওয়া, ট্রেনের ছাতে উঠে বসা ইত্যাদি। অর্থাৎ ভিড় বলতে এমন ভিড় যা দেখে লোকের ভির্মি লাগে। তা বেশ, তবে ভিড়শ্রেষ্ঠ (বীরশ্রেষ্ঠর অপভ্রংশ) থার্ড ক্লাশ কামরার কথাই বলা যাক। থার্ড ক্লাশের ভিড় সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আপনাদের কারো চেয়ে কম নয়। কারণ আমি বরাবর থার্ড ক্লাশের যাত্রী। গ্লাডষ্টোনের মতো আমি ফোর্থ ক্লাশের অভাবে থার্ড ক্লাশে চলি না; অমন সস্তা প্রিন্সিপ্‌ল, এ আমি বিশ্বাস করি না। গান্ধীজীর থার্ড ক্লাশ ফিলজফিতেও (দয়া করে কদর্থ করবেন না) আমার আস্থা নেই, বিশেষ করে সেই থার্ড ক্লাশ যখন স্পেশ্যাল ক্লাশ হয়ে দাঁড়ায়। সত্যি কথা বলতে কি, সেকেণ্ড ক্লাশের পয়সা নেই বলেই থার্ড ক্লাশে চলি। মধ্যম শ্রেণী সম্বন্ধে আমার নিজেরই আপত্তি আছে; আমি বড় কিম্বা ছোট হতে রাজি আছি কিন্তু মাঝারি হতে রাজি নাই।

গান্ধীজী বহুদিন পূর্বে থার্ড ক্লাশকে নরকের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। আমার বন্ধুরা সে কথার উল্লেখ করে বলেছেন, নবক হচ্ছে ভিড়েরই নামান্তর। যেখানে ভিড়, সেখানেই নরক। অবশ্য নরকে কি পরিমাণ ভিড়, সে বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই। তবে আমার মনে হয়, নরকের চাইতে স্বর্গেই বেশি ভিড়; কারণ মৃত ব্যক্তিমাত্রকেই আপনারা স্বর্গীয় বলে থাকেন। যাকগে, যাত্রীরা সবাই মিলে থার্ড ক্লাশ কামরাটিকে যে একটি নরককুণ্ড করে রাখেন, সে বিষয়ে কোন

সন্দেহ নেই। এ যে কত বড় লজ্জার কথা, কি বলব। এটি আমাদের একটি জাতীয় কলঙ্ক। রাষ্ট্রপতি কৃপালনী একবার কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমরা পরাধীন জাতি, কিন্তু কোন কোন ব্যাপারে এত স্বাধীনতা পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, কলার খোসা, কমলালেবুর ছোবরা, চিনেবাদামের খোসা কামরার ভেতরেই ফেলে স্তূপাকৃতি করা—এসব ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা আমাদের যেমন আছে, এমন আর কোন জাতির নেই। আমাদের থার্ড ক্লাশ কামরাটি হচ্ছে একটি অজিয়ান রাজার আস্তাবল।

অথচ ভেবে দেখুন থার্ড ক্লাশ কামরা ভারতবর্ষের বৃহত্তম ইনষ্টিটিউশন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে এটি একটি বিরাট মিলন-ক্ষেত্র, বলা চলে শিক্ষা কেন্দ্র। এখানে হিন্দুস্থান পাকিস্থান নেই, চলমান জনপ্রবাহে ভেদজ্ঞান নেই। কিন্তু যেইমাত্র ষ্টেশনে এসে গাড়ি থামল, অমনি হিন্দু চা, মুসলিম বিড়ি। প্রবাহ স্তব্ধ হলেই—সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে। আমাদের নেতারা বলেছেন—The nation lives in the village. সেই সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি—The nation moves in the third class carriage. ঐখানেই জাতির হৃৎপিণ্ডটা নিরন্তর ধুক্‌ধুক্ করছে। ঐখানটা সুস্থ হলেই জাতির দেহ সবল হয়ে উঠবে। আমাদের অন্তবর্তী মন্ত্রিসভার সর্ব-প্রথম কর্তব্য থার্ড ক্লাশের উন্নতি বিধান। যে অগণিত মানুষ প্রতিদিন অকথ্য ক্লেশ সহ্য করে, এমন কি প্রাণ বিপন্ন করে থার্ড ক্লাশে যাতায়াত করছে, তাদের সুব্যবস্থা হোক। তাহলেই লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতিদিন গ্রামে-গ্রামে, ঘরে-ঘরে এই বার্তা নিয়ে যাবে যে, স্বদেশী মন্ত্রিসভা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের হালচাল বদলেছে, দরিদ্র জন-সাধারণের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা হচ্ছে। নিত্য চলমান জনপ্রবাহের মুখে মুখে যে প্রপাগাণ্ডা, তার চাইতে বড় প্রপাগাণ্ডার যন্ত্র কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। জনগণের আস্থা ও সহানুভূতি লাভের

এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। নতুন মন্ত্রিসভার দৃষ্টি সর্বাগ্রে এদিকেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত। সুভাষচন্দ্র বলতেন—'First things first.' কিন্তু তা কি হবে? তৃতীয় শ্রেণী যে সকলের পরে। শুনছি নাকি ভাড়া কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হবে।

রেল-ষ্টীমার হল চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এজন্য আর সব দেশ বলে—Travel you must. আর আমাদের দেশে হল—Travel when you must. শুনুন কথা, বোঁচকা ঘাড়ে নিয়ে প্রাণ হাতে করে লোকে যাতায়াত করবে, তাও বলচে যেয়ে কাজ নেই। আর কিছু না, অল্প ভাড়ায় সুষ্ঠু, স্বচ্ছন্দ, পরিচ্ছন্ন ভ্রমণ ব্যবস্থা করে দাও। শিক্ষা-দীক্ষা-রুচি দুদিনে সব যাবে বদলে। সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় মিলে এতদিনে যা করতে পারেনি, থার্ড ক্লাশ কামরা তাই করবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বিশ্বের সমস্ত বিদ্যা লয়প্রাপ্ত হয়েছে, কারণ কিনা ওগুলো বিদ্যার মিউজিয়াম, প্রাচীন মৃত বিদ্যার অস্থি-সংগ্রহ মাত্র। চলমান জগতের বিদ্যায়তনও হবে চলমান, গতিশীল।

নাঃ, আজকেও আমার কথাবার্তাগুলি একটু উচ্চাঙ্গের হয়ে যাচ্ছে। তৃতীয় শ্রেণী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আলোচনাটা যদি প্রথম শ্রেণীর হয়ে যায়, তবে জিনিসটা বেমানান হয়ে পড়ে। অতএব এইখানে আলোচনা ক্ষান্ত করে আসল কথাটাই বলি। থার্ড ক্লাসের ভিড়কে আপনারা যেমন ভয় করেন, আমি তেমন করিনে। বরং ভালোই লাগে। কারণটাও বলছি, শুনে অবশ্য আপনারা হাসবেন। বরাবর দেখেছি, ভিড়ের মধ্যে আমি অতিমাত্রায় আত্মসচেতন হয়ে উঠি। কেবলি মনে হয়, এই জনসমাগমের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি। থার্ড ক্লাশের একটি কোণে খবরের কাগজ খুলে চুপটি করে বসে থাকি খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে। ঠেলাঠেলি চেঁচামেচির দিকে আমার নজরই নেই। আমি কারো দিকেই তাকাচ্ছি না। কিন্তু বেশ যেন টের পাচ্ছি,

অনেকেরই চোখ আমার উপর নিবদ্ধ। অনেকদিন আগে বার্ক সম্বন্ধে একটা কথা পড়েছিলাম। লেখক বলছিলেন, বার্ক এমন মানুষ যে, হাজার লোকের ভিড়ের মধ্যেও সবার দৃষ্টি ওঁর উপরেই পড়বে। ধরুন, হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি এসেছে আর রাস্তার যত লোক দৌড়ে এসে একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়িয়েছে। মনে করুন, তার মধ্যে বার্কও এসে দাঁড়িয়েছেন। সবাই ফিসফিস করে বলবে, ইনি কে? সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে American Taxation সম্বন্ধে বক্তৃতা করতে হবে না। সামান্য দু-একটা কথাও যদি বলেন, ধরুন আবহাওয়া সম্বন্ধেই, তাহলেও লোকে মনে করবে, ইনি অসাধারণ ব্যক্তি। নিজেকে বার্কের সমগোত্রীয় মনে করে মনে-মনে ভারি একটি স্বব-সুলভ আত্ম-প্রসাদ লাভ করি। আর কামরার ভেতরে সবজান্তা ধরণের কেউ যদি থাকেন, চুপি চুপি হয়ত বলবেন, আরে একে জানেন না? 'দেশ' পত্রিকায় ইন্দ্রজিতের খাতা পড়েছেন তো? এই ইনিই তো—এ্যাঁ: তাই নাকি? জোড়াজোড়া চোখের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি আমার মুখে এসে পড়বে। আঃ ভাবতেই রোমাঞ্চ হচ্ছে। নাঃ, আর লেখা নয়, এবার শুয়ে পড়তে হবে। শুয়ে শুয়ে এই রোমাঞ্চটি মনে-মনে লালন করব, তবেই উপভোগটা সম্পূর্ণ হবে।

কামিনী-কাঞ্চন

ট্রেনের কামরায় বসে আমার সহযাত্রীদের কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা করছিলাম। ইতিপূর্বে আমি অনেকের মুখে শুনেছি যে, রেল-ষ্টীমারের সাধারণ যাত্রীরা নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা বলে তার শতকরা নব্বুই-ভাগ নাকি ধর্মসম্বন্ধীয়। শুনে আমি খুব বেশি অবাক হইনি। ধর্মভূমি ভারতবর্ষে লোকে ধর্ম সম্বন্ধেই প্রধানত কথা কইবে, এতে আর বিচিত্র কি। তবে আমি নিজে কখনো এ-জিনিসটা লক্ষ্য করিনি। আগেই বলেছি, ধর্মে আমার মতি নেই, কাজেই নেহাৎ কানের কাছে হলেও ধর্মকথা সহজে আমার কানে ঢোকে না। অবশ্য ইদানীং যে পথে-ঘাটে ধর্ম সম্বন্ধেই বেশির ভাগ কথা হয়, সেটা অমনিতেই অনুমান করা যেতে পারে। কারণ এখন ধর্ম মানে দাঙ্গা, ধর্ম রক্ষা করার অর্থ দাঙ্গা করা। ধর্ম শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ, যা আমাকে ধারণ করে অর্থাৎ রক্ষা করে। যতদিন ধর্ম মানুষকে রক্ষা করত, ততদিন না হয় একরকম ছিল। এখন মানুষ ধর্মকে রক্ষা করতে শুরু করেছে, তারই ফলে অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে সব জিনিসেরই প্রকৃতি বদলে যাচ্ছে। আগে রাজাকে বলা হত প্রজাপালক, কারণ তিনি প্রজাদের পালন করতেন। এখন প্রজারাই রাজাকে পালন করে—ইংল্যাণ্ড তার দৃষ্টান্ত। রাজা এবং রাজত্ব সেজন্য এতো হাস্যকর হয়ে উঠেছে। যে জিনিসকে পালন কিম্বা লালন করতে হয়, সে জিনিসের প্রয়োজন নিঃসন্দেহে শেষ হয়ে গেছে। কাজেই ধর্ম এবং রাজতন্ত্র এ দুটির মেয়াদ ফুরিয়েছে বলতে হবে। দুর্বলকে রক্ষা করে কি হবে? যারা তাকে রক্ষা করে, তাদেরও সে দুর্বল করে।

ঐ দেখুন যে বিষয় নিয়ে কথা শুরু করেছিলাম, সেখান থেকে এরই মধ্যে দূরে চলে গিয়েছি। আমার সুমুখের বেঞ্চিতে বসে যে ক'টি গ্রাম্য ব্যক্তি কথাবার্তা বলছিলেন, তাঁরা মুখ্যত ধর্ম সম্বন্ধে কথা না বললেও ভেবে দেখলাম, বিষয়টা মূলত সকল ধর্মের সারবস্তু। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে তাঁর শ্রোতাদের কিঞ্চিৎ উপদেশ দিচ্ছিলেন। শুনে আমি একদিকে যেমন কৌতুক, অপরদিকে তেমনি বিরক্তি বোধ করছিলাম। জীবন-সম্ভোগের জন্ম যে দুটি জিনিস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকরণ, সে দুটিই যে সংসারে সকল দুর্ভোগের মূলে, এ কথাটা আমাদের শাস্ত্রে খুব ভালো করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। দেখলুম এরা যদিচ বলতে গেলে নিরক্ষর ব্যক্তি তথাপি অর্থ যে অনর্থম্ এর মূলে এবং নারী যে নরকস্য দ্বারী, এ সমস্ত আপ্তবাক্য শুধু বাঙলা ভাষায় নয় একেবারে সংস্কৃত ভাষায় এদের জানা আছে। সহজেই বোঝা যায় ঠিক এ দুটি জিনিস থেকেই এরা জীবনে বঞ্চিত হয়েছে; কাজেই একটু শাস্ত্র-বাক্যের প্রলেপ লাগাতে না পারলে মন সান্ত্বনা পায় না। নিজেরা তো বঞ্চিত হয়েছেই, অপরেও যাতে বঞ্চিত থাকে, সে বিষয়ে এদের চেষ্টার কমতি নেই। ক্ষুদ্রচিত্তদের সেটাও একটা মস্ত সান্ত্বনা। আমাদের দেশে এই একটি ট্র্যাজেডি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসকেও ছেঁটে-কেটে বাদ-ছাদ দিয়ে আমরা জীবনটাকে এমন আটপৌরে করে তুলেছি যে, তার মধ্যে আর কোন শ্রী-সৌন্দর্য নেই। যেটুকু নিতান্ত দরকার মাফিক তার মধ্যে সৌন্দর্যের অবকাশ কোথায়? প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটুকু, সেটুকুর মধ্যেই সৌন্দর্যের আয়োজন। বাড়িটা প্রয়োজনীয়, বাগানটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং অতিরিক্ত বলেই তাতে বাড়ির সৌন্দর্যবৃদ্ধি। আমাদের দেশে কত পুরুষ আছে নিজের স্ত্রী ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে সারা জীবনে কথা বলেনি। এইজন্যই তো জীবন এত নীরস, এত অস্বাস্থ্যকর। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে

বলেছিলেন, আমাদের জন্ম হয়েছিল নারীহীন রাজ্যে। এ কি কম দুঃখের কথা। সে দুরবস্থা আজ পর্যন্তও কাটে নি।

আমি অপরের উপদেশ একেবারে সইতে পারি না। অবশ্য মাঝে মাঝে আমিও অপরকে উপদেশ দিয়ে থাকি। সে উপদেশ শুনে অপরের মনের অবস্থা কেমন হয়—সেটা অবশ্যি কথনো ভেবে দেখিনি। যদিচ সহযাত্রী ব্যক্তিটির উপদেশাবলী আমাকে উদ্দেশ করে নয়, তথাপি কানের কাছে ঐ ধরণের কথাবার্তা শুনে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। বিশেষ করে কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে কোন রকম কথা শুনলেই আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। যে বিষয়ে মানুষের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি আছে, সে বিষয়ে উপদেশ দিলেও না হয় একটা মানে হয়। কিন্তু যেখানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু অত্যন্ত পরিমিত পরিমাণেও জোটে না, সে বিষয়ে উপদেশ দিলে কার না মেজাজ বিগড়ায় আপনারাই বলুন। বলা বাহুল্য, আপনাদের সকলের মতো আমারও একটিমাত্র স্ত্রী, যদিচ শাস্ত্রে দেশে দেশে কলত্রানির উল্লেখ রয়েছে। এর চাইতে কম থাকা সম্ভব নয় বলেই ঐ ব্যবস্থা হয়েছে। এই তো গেল কামিনীর কথা, কাঞ্চনের কথা মোটে না বলাই ভালো। দিন-মজুরি করে কাঞ্চন-মূল্য যেটুকু জোটে সেটা মেমসাহেবের অতি হ্রস্ব স্কর্টের মতো এদিক টানলে ওদিক উঠে যায়, ওদিক টানলে এদিক! অন্ন জুটলে বস্ত্র জুটে না, বস্ত্র জুটলে অন্ন নয়।

এ সব কারণ ছাড়াও কামিনী-কাঞ্চন তত্ত্ব সম্বন্ধে আমার মন অতিশয় স্পর্শকাতর। তার একটি বিশেষ কারণ আছে। কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে জীবনে আমাকে দু-দুবার উপদেশ শুনতে হয়েছিল এবং দুবারই অতি বড় কৌতুকের সঞ্চার হয়েছিল। তারই একটি কাহিনী আজ বলছি, অপরটি বারান্তরে বলব। তথন আমার বয়স অল্প, তারই সুযোগ নিয়ে আমার প্রতিবেশী র-বাবু আমাকে নানা-বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

সেবারে পর পর ছুটি দুর্ঘটনায় ভদ্রলোক বিশেষ কাবু হয়ে পড়েছিলেন। প্রথমে তো ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেলেন। অল্প দিনের মধ্যেই আবার ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে সারা জীবনের যাকিছু সঞ্চয় সব নষ্ট হল। স্ত্রীবিয়োগের ধাক্কাটা যদি-বা সামলে উঠেছিলেন ব্যাঙ্ক ফেলের ধাক্কায় ভদ্রলোক একেবারে মুসড়ে পড়লেন। সবাই ওঁকে এড়িয়ে চলত, বলত ওঁর মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে নিরীহ শ্রোতা পেয়ে একদিন এসে কামিনী-কাঞ্চনের অসারতা সম্বন্ধে ঝাড়া দু-ঘণ্টা আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। এই দুটি মোহ থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যে কি অপার আনন্দ উপভোগ করছেন, নানাবিধ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে আমাকে তাই বোঝাতে লাগলেন। ব্যাপারটা প্রায় ওঝা দিয়ে ভূত ছাড়ানোর মত হয়ে উঠেছিল। এদিকে আমি তখন সবেমাত্র বিয়ে করেছি। অদূরে পর্দার আড়ালে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে যে হাস্যসম্বরণের বিফল চেষ্টা চলচে, এ ঘরে বসে আমি সেটি বেশ টের পাচ্ছিলাম এবং ভেতরে ভেতরে ঘামিয়ে উঠছিলাম। র-বাবু নিতান্ত মুক্ত পুরুষ বলেই কিছু টের পান নি। তিনি উঠে যাবার পরে সেই অবরুদ্ধ হাসির বাঁধ সেদিন যেভাবে শতধা বিদীর্ণ হয়েছিল, সেকথা মনে পড়লে আজও দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বাবাঃ দরকার নেই আমার মোহ-মুক্তিতে। বেঁচে থাক কামিনী, বেঁচে থাক কাঞ্চন; এ ছুটি গেলে আমরা কি নিয়ে এ-সংসারে বেঁচে থাকব?

কামিনীর মোহে ট্রয় নগর ধ্বংস হয়েছিল, তাই নিয়ে মহাকাব্য রচনা হয়েছে। ঐ কারণেই স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংস হয়েছিল। আমাদের শ্রেষ্ঠ কাব্য সীতা-হরণের কাহিনী ইউরোপের শ্রেষ্ঠ কাব্য হেলেন-হরণের কাহিনী। আবার ঐ কামিনীর মোহেই রাজা অষ্টম এডোয়ার্ড রাজত্ব হারিয়েছেন। কই তা নিয়ে তো মহাকাব্য রচনা হয়নি, এমনকি, একটা চতুর্দশপদী কবিতা লেখা হয়েছে বলেও শুনিনি। ভাবলে একটু

অদ্ভুত ঠেকে, মনে হতে পারে, এ-যুগের মানুষের বুঝি যথেষ্ট পরিমাণে রসবোধ নেই। কিন্তু কেন যে এই নিয়ে কাব্য রচনা হয়নি, তার আভাস আমি পূর্ব প্রবন্ধেই দিয়েছি। বলেছিলাম যে প্রজাপালিত রাজা সত্যিকারের রাজা নয়, বিকল্পে রাজা। যে রাজার আপন ইচ্ছানুযায়ী বিয়ে করবার পর্যন্ত অধিকার নেই, সে রাজার রাজ-মহিমা কোথায়? অক্ষম ব্যক্তি কখনো মহাকাব্যের নায়ক হতে পারে না। দুর্বল ব্যক্তির ট্র্যাজেডিও দুর্বল। যিনি ছিলেন রাজা, তিনি হয়েছেন ডিউক—এইটুকু মাত্র অধোগতি। অপরদিকে তাঁর Commoner পত্নী হয়েছেন ডাচেস—সেটা তো বলতে গেলে কমেডি।

অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে, এ-যুগে কামিনীর চাইতে কাঞ্চনের মোহ বেশি। সীতা উদ্ধার কিম্বা হেলেনের উদ্ধারের জন্য যেমন প্রলঙ্করী যুদ্ধ হয়েছিল এযুগে তা অসম্ভব। এ-যুগের সব যুদ্ধের মূলে কাঞ্চন অর্থাৎ ব্যবসার লোভ। মহাভারতের যুদ্ধকে যদি বলি ধর্মসংস্থাপনায়, এ-যুগের যুদ্ধকে বলব বাণিজ্য-সংস্থাপনায়।

নাঃ ভেবেছিলাম এবার কোনো আলোচনাই তুলব না। শুধু আমার পূর্ব প্রতিশ্রুত অভিজ্ঞতার কাহিনীটি আপনাদের কাছে বলব। কাহিনীটি অতিশয় কৌতুকাবহ, কিন্তু সেই কৌতুকটি আমাকে বেশ একটু চড়া দামে কিনতে হয়েছিল। এই কাহিনীটিকে সালঙ্কারে পক্ষ-বিস্তার করে বলতে গেলে রীতিমতো একটি গল্প হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মুস্কিল এই যে, গল্পটা যত বড় হয় আমি নিজে তত ছোট হয়ে যাই। কাজেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে কাহিনীটা বলছি, শুনুন। কয়েক বছর আগের কথা। রাত্তিরের গাড়িতে কলকাতায় আসছিলাম। আমার সঙ্গে বোঝা-পত্তর কিচ্ছু নেই। সেজন্য মনটা খুব হাল্কা ছিল, কারণ বরাবর দেখেছি বোঝাপত্তর সঙ্গে থাকলে সেগুলো প্রায়ই গন্তব্যস্থল পর্যন্ত গিয়ে পৌছে না। ষ্টেশনে এসে বিপদ; আমাদের সু-বাবুর বোন যাচ্ছেন কলকাতায়,

সঙ্গে বোঝা-পত্র কিছু কম নয়। সুতরাং বোনটিকে তিনি আমারই হেপাজতে পাঠাতে চান। তিনি আমাকে ভালো করে জানতেন না বলেই অমন গুরুভার আমার উপরে চাপিয়েছিলেন। বোনটি অবশ্য বারম্বার বলেছিলেন যে, তিনি অনায়াসেই একলা যেতে পারবেন, দাদা মিথ্যে ভাবছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। অতি অল্পক্ষণের জন্য গাড়ি দাঁড়ায় কোনো রকমে মালপত্র তোলা হল। তাড়াহুড়া হৈ-চৈ এর মধ্যে ভদ্রলোক আর এক দফা স্মরণ করিয়ে দিলেন, আপনার ওপরেই ভার রইল, ওকে একেবারে বাড়ি অবধি পৌছে দেবেন। গাড়িতে বেশ ভিড়, বিশেষ করে যাত্রীরা অনেকে দিব্যি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে কেউ কেউ কুঁকড়ে মুঁকড়ে বসে আছে। মেয়েটি প্রথমে তো মালপত্রগুলো গুণে দেখলে ঠিক আছে কিনা, তার পর দু একটা জিনিস এদিক ওদিক ঠেলে-ঠুলে সরিয়ে রাখল। বলাবাহুল্য আমার সাহায্যের কোন অপেক্ষা রাখেনি। তারপরে একটি দীর্ঘশয়ান ব্যক্তিকে বেশ ভদ্রভাবে একটু স্থান সংকুচন করতে বলে বসবার একটু যায়গা করে নিলে। আমি তখন স্থানাভাবে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছি। মেয়েটি এক নজর আমার দিকে তাকিযে বেঞ্চির তলা থেকে একটা হোল্ড অল টেনে বের করে দরজার কাছটাতে চালান করে দিল; বল্লে এই নিন আপনি এটার ওপরে বসুন। আমি বল্লুম, আহা আমার জন্য ব্যস্ত—মেয়েটি জবাব না দিয়ে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। মনে মনে লজ্জিত হলেও বেশ আরাম করে হোল্ড অলটিতে চেপে বসলুম। বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কোন একটা ষ্টেশনে জেগে উঠে দেখি আমার দুধারে দুটী ব্যক্তি হোল্ড অল এর ওপরেই বসে আছেন। একই বিড়ি দু'জনে ভাগাভাগি করে ফুঁকছেন এবং অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে কামিনী-কাঞ্চন তত্ত্ব নিয়ে দুজনের মধ্যে আলোচনা চলছে। কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে রসগ্রাহী

আলোচনাটা একেবারে মন্দ লাগেনি। আধা তন্দ্রা আধা জাগরণে ওদের কথাবার্তা যেন অনেক দূর থেকে আমার কানে এসে পৌছচ্ছিল। সকালবেলায় জেগে দেখি আমার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি দুটি কখন নেবে গেছে আমি টের পাইনি। রাজরাজাতলায় টিকিট চেকার এসে টিকিট চাইলে। পকেটে হাত দিযে আমার চক্ষুস্থির, আমার মানিব্যাগটি নেই। কিঞ্চিৎ কাঞ্চন এবং আমার টিকিট ওরই মধ্যে ছিল। টিকিট চেকার হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে হোল্ড অলের এপাশ ওপাশ খুজে ভদ্র লোককে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করছি। লোকটি বিরক্তিমুখে এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন ওসব বাজে কথা শুনতে চাইনে। একটা হাঙ্গামাই হোত যদি না মেয়েটি সে মুহূর্তে নিজের টিকিট বের করে এবং যুক্তি প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিত যে একত্র যাত্রী হিসেবে আমার টিকিটটাও অবশ্যই কেনা হয়েছিল। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র এবং সুন্দর মুখের যুক্তি অকাট্য। সুতরাং টিকিট চেকারকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। এত সহজে ফ্যাসাদ বেঁচে যাওয়াতে যেটুকু আরাম বোধ করেছিলাম মেযেটির মুখে ঈষৎ কৌতুকের হাসি দেখে সেটাও পুরোপুরি উপভোগ করা হল না। আমতা আমতা করে বল্লুম, আশ্চর্য মাণিব্যাগটা যাবে কোথায়? মেয়েটি হেসে বল্লে, তা ওটার সদ্গতিই হয়েছে। ঐ পরমহংস দুটির ভোগে লেগেছে। পরমহংস? হ্যাঁ, যে কামিনী-কাঞ্চন সম্বন্ধে আপনাকে উপদেশ দিচ্ছিল, ওদেরই কাজ কিনা। যা মনযোগ দিয়ে তত্ত্বকথা শুনছিলেন, হবে না?

হাওড়া ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে মেয়েটি ট্যাক্সি ভাড়া করে বললে, আসুন আপনাকে পৌছে দিই। না, না, আমি হেঁটেই—মেয়েটি বল্লে, পাগল হয়েছেন, তাই কি হয়?—অগত্যা ট্যাক্সিতে উঠতে হোল। সারাপথে একটি কথা বলিনি, মেয়েটিও না। গলির মোড়ে এসে

আমার নির্দেশে ট্যাক্সি যখন থেমেছে তখন মেয়েটি হেসে বললে, দাদা ভালো লোকের সঙ্গে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। কাঞ্চন যা ছিল তা ত গেছেই কামিনীটি যে কোন রকমে—চোখ মুখ বুজে ট্যাক্সি থেকে নেমে মনে মনে বল্লুম, ধরণী দ্বিধা হও।

সত্য-মিথ্যা

সেদিন একটি ছেলের অটোগ্রাফ খাতা ওলটাতে গিয়ে দেখলুম একটি স্বাক্ষর লিপিতে লেখা আছে—সদা সত্য কথা কহিয়ো না। দেখেই মনটা ভারি খুশি হয়ে উঠল। সংসারে হিতবাক্য অতিশয় সুলভ কিন্তু মনোহারী বাক্য বাস্তবিকই দুর্লভং বচঃ। দৈবাৎ কেউ যদি বলেন মনটা আপনি প্রসন্ন হয়ে ওঠে। স্বাক্ষর দাতার নাম প্র না বি। প্র না বি সত্য নাম গোপন করেছেন অথচ মিথ্যা নাম প্রচার করেন নি। সত্য কথা না বললেও যে মিথ্যা বলা হয় না প্র না বি নামটাতেই তার প্রমাণ। আপনাদের মতো আমিও প্র না বি-র একজন গুণগ্রাহী। সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনি আমার অগ্রজ (বয়সের দিক থেকে কিনা বলতে পারি নে)। এমন কি 'দেশ' পত্রিকার পাতায়ও তিনি আমার পূর্বগামী, আমি তাঁর অনুগামী। আমি সবে মাত্র তাঁর জুতোটায় পা ঢুকিয়েছি। প্র না বি উক্ত বালকটিকে যে উপদেশটি লিখে দিয়েছেন আমি সাহস করে বোধকরি স্বহস্তে লিখে ঐ উপদেশ কাউকে দিতে পারতুম না যদিচ আমি নিজে ঐ উপদেশটি বরাবর মেনে চলি অর্থাৎ আমি সদা সত্য কথা বলি না। মুখে যাই বলি লিখবার সময় একটু সাবধান হতে হয়। আমাদের শাস্ত্রে বলেছে—শতং বদ মা লিখ। এই উপদেশটা বোধকরি মিথ্যা কথা সম্বন্ধেই বলা

হয়েছে। কারণ, মুখের কথা বেমালুম অস্বীকার করা চলে, কিন্তু মুখের কথা কালির আখরে লিখে একবার ছেড়ে দিলে ব্যুমেরাং-এর মতো ফিরে এসে লেখককেই ঢুঁ মারতে পারে। এজন্য শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করে আমি শতকথা মুখে বলি কিন্তু লেখায় লিখি না। অবশ্য আমার কথার মধ্যে যে বহুল পরিমাণে মিথ্যা মিশ্রিত থাকে বলাই বাহুল্য। কারণ ভারতচন্দ্র বলেছেন—সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।

বলতে বাধা নেই আমার সত্য মিথ্যা জ্ঞানটা একটু ঢিলে। তার কারণ, আমি কথক মানুষ। আসর জমাতে গিয়ে দেখেছি—খাঁটি নিষ্করুণ সত্য কথা বলতে গেলে গল্প একেবারে নীরস হয়ে যায়। মিথ্যের রং না মাখালে গল্প কক্ষণও জমে না। রসসৃষ্টিতে মিথ্যেটাই সর্বপ্রধান উপকরণ। আর গল্প যে জমে না তাতেই প্রমাণ হয়—যাঁরা শ্রোতা তাঁরাও নির্জলা সত্য জিনিসটা হজম করতে পারেন না। সত্যের সঙ্গে মিথ্যের একটু ভেজাল মেশাতে হয়। মিথ্যার প্রতি মানুষের একটা অস্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। তার কারণ সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে পার্থক্য। বাস্তবের চাইতে কল্পনা বড়, সু রাং সত্যের চাইতে মিথ্যা বড়। শুধু বড় নয়, সত্যের চাইতে মিথ্যা বেশী মনোহর।

সত্য বলার মধ্যে বাহাদুরি নেই, মিথ্যে বলার মধ্যে অনেকখানি বাহাদুরি আছে। কারণ, বুদ্ধিমানের মতো মিথ্যা বলতে হ'লে যথেষ্ট পরিমানে কল্পনা শক্তির প্রয়োজন। যে মিথ্যাবাদীকে আমরা সত্যি নিন্দা করে থাকি সে লোকটা মিথ্যা বলছে বলে নিন্দনীয় নয়, লোকটা নির্বোধ বলেই নিন্দনীয়। ঠাকুর ঘরে কে জিজ্ঞেস করলে যে লোকটা বলে, কলা খাচ্ছিনে—সে যথার্থই মিথ্যাবাদী, কারণ সে নির্বোধ। আর ঘুমিয়েছ নাকি জিজ্ঞেস করলে যে ব্যক্তি বলে, হ্যাঁ—সেও ঐ দলে। নির্বোধ ব্যক্তির মিথ্যে বলবার

কোন অধিকার নেই, একমাত্র বুদ্ধিমান লোকেরই সেই দুর্লভ অধিকার। একটা মিথ্যা কথা বলতে হলে অনেকখানি উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন। সত্য কথাগুলি প্রায়ই রেডিমেড জিনিস, বলতে চাইলে উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। অতএব যে বুদ্ধি কাজের সময় উপস্থিত থাকে না, সে বুদ্ধি থেকেই বা কি লাভ ?

মিথ্যার প্রতি আমার পক্ষপাতের আর একটি কারণ আছে। আমি পারতপক্ষে কাউকে অপ্রিয় কথা বলতে চাইনে। ওদিকে শাস্ত্রে বলেছে—সত্যম্ অপ্রিয়ম্। কাজেই সত্য কথা বলার পথ ওখানেই রুদ্ধ। কাজেও দেখেছি আমার সত্য-কথা এত বেশি অপ্রিয় হয় যে, বিশ্বশুদ্ধ লোকের সঙ্গে ঝগড়া বেঁধে যাবার কথা। কারণ অধিকাংশ লোকের সম্বন্ধে আমার যা ধারণা—যাক্ মিছিমিছি একটা সত্যি কথা বলে কি লাভ ? অনর্থক মানুষকে চটিযে দেওযা বইতো নয়। আমি মনে করি আমার মতো আপনারাও যাঁরা মিথ্যে কথা বলে থাকেন তাঁরা এই কারণেই বলেন, অপরের মনে আঘাত দিতে চান না বলেই।

আমি পূর্বে বলেছি যে রস-সৃষ্টিতে মিথ্যেটাই সর্বপ্রধান উপাদান। শাস্ত্রে রসাত্মক বাক্যকে বলেছে কাব্য। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ একস্থানে বলেছেন, রসাত্মক বাক্য যদি সত্যাত্মক হয় তবেই তাকে বলব কাব্য। এ কথায় পাঠকদের মনে সংশযের উদ্রেক হতে পারে, সেটা নিরসন করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ যে সত্যর কথা বলেছেন সেটা কিন্তু সদা সত্য কথা কহিবে-র অন্তর্গত নয়। কবির সত্য লৌকিক সত্য থেকে পৃথক। "সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা' তা সব সত্য নহে।" তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের মতো কবিগুরুর সত্য মিথ্যা জ্ঞানটা অত টন্‌টনে নয়। কোনো কবিরই থাকে না। লৌকিক অর্থে আপনারা যাকে বলেন মিথ্যা, রবীন্দ্রনাথ তাকে সত্যের চাইতেও বড় স্থান দিয়েছেন, তাকে বলেছেন 'আরো সত্য।' ঐ আরো সত্যটা হচ্ছে—

কল্পনা-রাজ্যের সত্য। গড়ের মাঠটা সত্য, তেপান্তরের মাঠটা মিথ্যা বলেই আরো সত্য। ঘোড়াটা সত্য, পক্ষীরাজ ঘোড়াটা আরো সত্য কারণ বাস্তবের রাজ্যে তার অস্তিত্ব নেই। অমিট্ রায়ের যুগে আমাদের বাস। কই, এমন একটি পুরুষ আজ পর্যন্ত দেখিনি যাকে অমিট্ রায় বলে ভুল হতে পারে, এমন একটি মেয়ে দেখিনি যার মুখে কিম্বা মনে লাবণ্যর আদল আছে, কিন্তু তাই বলে কি অমিট্ রায়ে মিথ্যা ? লাবণ্য কি নেই ? একশো বার আছে। "কবি তব মনোভূমি লাবণ্যর জনমস্থান, শিলং-এর চেয়ে সত্য জেনো।"

সত্য আর মিথ্যাকে আলাদা করে দেখবার পক্ষপাতী আমি নই। আমার মতে সত্য আর মিথ্যা এক বৃন্তে দুটি ফুল, দিন আর রাত্রির মতো একই জিনিসের এপিঠ আর ওপিঠ। আপনার কাছে যা সত্য আমার কাছে তাই মিথ্যে। আমার সত্য আপনার কাছে তদ্রূপ। মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ ইংরেজের চোখে মিথ্যা (অবশ্য সত্যকে মিথ্যা করতে ইংরেজের মতো ওস্তাদ আর নেই)। তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন যার যার সত্য যার যার স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং প্রত্যেক সত্য কতক পরিমাণে মিথ্যা এবং প্রত্যেক মিথ্যা কতক পরিমাণে সত্য। There is a soul of truth in every lie. শুধু তাই নয়, এমন মিথ্যাও আছে আপন মহিমায় যা তেমন সত্যকেও ম্লান করে দিতে পারে। এই আমাদের দেশেই রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত কত বীর যুবক দেখা গেছে যাঁদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার হয়েছে সত্য কথা কবুল করাবার জন্য। হাসি মুখে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, কিন্তু সত্য কথা কবুল করেন নি। এ বীরত্বের তুলনা কোথায় ? প্রয়োজন হলে মিথ্যাও বলেছেন। কত কত ধর্মধ্বজী সত্যবাদীর সত্য সে মিথ্যার কাছে মলিন হয়ে গেছে। জয় হোক্ সেই মিথ্যার। আমি সেই মিথ্যার বালাই নিয়ে মরি।

বাঙালীর ব্যবসা

আমরা যখন ইস্কুল কলেজের ছাত্র তখন বাঙ্গালী যে অত্যন্ত সেন্টি-মেণ্টাল জাত সে কথাটা ঘরে পরে সর্বত্র শুনতে হ'ত। সেন্টিমেণ্টাল কথাটা গালাগালের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি নিজে ভাবপ্রবণতাকে কখনো দুর্বলতার চিহ্ন বলে মনে করিনি। ভাবপ্রবণতা ছাড়া পৃথিবীতে কোনো বড় কাজ হযেছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ইদানীং এ অপবাদটা আর তেমন শোনা যায় না। সেটা সুলক্ষণ কি দুর্লক্ষণ জানিনে। আজকালের ইস্কুল কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কথা কযে দেখেছি, তারা বাস্তবিক আমরা যা ছিলুম তার চাইতে একটু বেশি সেয়ানা। এটা অবশ্য হতে বাধ্য। সংসার যত বেশি কুটিল এবং নির্মম হবে মানুষের মন তত বেশি কঠিন হবে। ওটা আত্মরক্ষার ধর্ম। সৃষ্টির প্রথম জীব ছিল জেলি মাছের মতো তুলতুলে নরম-দেহ, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে সেই জীবই ক্রমে অস্থিসবল হয়ে উঠেছে। এটা স্বভাবের নিয়ম। জাপানি বোমার অপঘাত আর দুর্ভিক্ষের অপমৃত্যুর ধাক্কায় বাঙালী ছেলেরা এই ক'বছরেই অনেকখানি সবল হয়ে উঠেছে। আর এখন দেশময় যে অগ্নিলীলা চলছে তার ফলে আরো কঠিন হবে বাঙালীর মন, বাঙালীর পণ।

আমরা কলেজে পড়বার সময় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আমাদের একেবারে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছিলেন। আমরা তখন শুদ্ধ অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ ইংরেজি

উচ্চারণ আয়ত্ত করবার চেষ্টায় নিযুক্ত আর আচার্যদেব নিরন্তর আমাদের কানে জপ করতে শুরু করেছেন—

It is not simply the British conquest but the Marwari conquest of Bengal that has impoverished the Bengali people.

বাঙালীকে তিনি রাতারাতি মাড়োয়ারী করে তুলবার চেষ্টা করছিলেন। সেদিনকার সমগ্র ছাত্রসমাজকে তিনি রীতিমতো চঞ্চল করে তুলেছিলেন। কেবল মাত্র লোটা কম্বল সম্বল করে মারোয়াড়ী ব্যবসাদার বাঙলা দেশ থেকে কোটি কোটি মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়ে একজন মাড়োয়ারী পান বিড়ি এবং সরবৎ বিক্রি করে যে কি পরিমাণ অর্থ সঞ্চয় করছে তারই ফিরিস্তি দিয়ে তিনি আমাদের চমৎকৃত করেছিলেন। সে লোকটা আমাদের চোখে রীতিমতো একটি hero হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ওর trade secretটা আয়ত্ত করবার জন্য বহুদিন ফুটপাতে দাঁড়িয়ে তার সরবৎ খেয়েছি।

আচার্যদেবের উপদেশ একেবারে মাঠে মারা যায়নি। তার কারণও ছিল। তখন চাকরির বাজার মন্দা, বেকার সমস্যা ভয়ংকর আকার ধারণ করেছে। কলেজ স্কোয়ার থেকে ড্যালহাউসি স্কোয়ারের রাস্তাটা ক্রমে দুর্গম হয়ে উঠছিল। গোলদীঘির জীবেরা লালদীঘিতে গিয়ে আর থৈ পায় না। ধীরে ধীরে বাঙালী ছেলেরা ব্যবসায় নামতে লাগল। কিন্তু স্বভাব যায় না মলে, শিক্ষার গুমোর যায় না ব্যবসায় নাবলে। দেখা দিল গ্রাজুয়েট দর্জির দোকান, গ্রাজুয়েট মিষ্টান্ন ভাণ্ডার ইত্যাদি। বাঙালী যে মনে প্রাণে ব্যবসাকে গ্রহণ করেনি, এখানেই তার প্রমাণ। অর্থাৎ ব্যবসাটার মধ্যে dignity নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিলমোহর দিয়ে কোন রকমে ব্যবসাটার মানরক্ষা। কিন্তু ঐখানেই

প্রহসনটার শেষ নয়। বাঙালীর কাবিয়ানা যাবে কোথায়? মরবার সময়ও বাঙালীর ছেলে কাবি্য করে তবে মরে, গলায় দড়ি দেবার আগে নীল কাগজে লিখে রেখে যায়—যে বুঝবার সে বুঝবে। কাজেই দোকানদারি করতে গিয়ে শিক্ষিত ছেলেরা কাবিয়ানা করবে তাতে আর বিচিত্র কি! অতএব দর্জির দোকানের নাম হ'ল সীবনালয়। সীবন কথাটার মানে ঠিক জানা ছিল না। আমি ভেবেছিলাম বোধ করি কবরেজি ওষুদের দোকান টোকান হবে—ওষুদ পথ্যি সেবনের নির্দেশ পাওয়া যায়। জুতার দোকানের নাম—শ্রীচরণেষু, উপানৎ শিল্প কিম্বা পাদুকা প্রতিষ্ঠান। আর চা-এর দোকানের নাম —পান্থ পেয়বাস।

অপরের কথা বলে লাভ কি? এবার আমার কীর্তির কথাটা শুনুন। আমি যে কোনোকালে ব্যবসার কথা কল্পনাও করতে পারি এমন কথা আমার বন্ধুরা কিছুতে বিশ্বাস করতেই চান না। সবে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছি। যেদিন ওখানে প্রবেশ করেছিলাম সেদিন পৃথিবীটা ছিল বিরাট। ছ'বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাট পার হয়ে দেখি পৃথিবীটা সংকুচিত হয়ে বাড়ির উঠোনটির মতো ছোট হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-নিষ্ক্রান্ত ব্যক্তি সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় অসহায়। তখন ছেলেদের একমাত্র উপায় ছিল মোটা পণে বিয়ে করে বিবাহলব্ধ অর্থের দ্বারা ব্যবসার ফিকির দেখা। অর্থাৎ বড়বাজার মাৎ করবার জন্য বউবাজারে উঁচু দর হাঁকা। আমাদের ভাগ্য দোষে সেদিকেও আমাদের সুবিধে হয়নি। কাজেই আমরা তিন বন্ধুতে স্থির করলুম, আমাদের সংস্থান নিয়ে আমরা ছোটখাট একটি চা-এর দোকান দিয়ে বসব। খুব সামান্য আরম্ভ, কিন্তু ব্যবসা যখন ফেঁপে উঠবে তখন বিরাট আকারে করা যাবে—সে জিনিসের খুব অভিনব প্ল্যান আমাদের মাথায় ছিল। নানা রকমের খবরের কাগজ, দিশি বিলিতি ম্যাগাজিন, এমন কি, বাছা

বাছা বই-এর একটি ছোটখাট লাইব্রেরী থাকবে। বাঁধা খদ্দেরদের নিয়ে প্রতি মাসে একটি লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হবে এবং লাঞ্চ-সভায় সাহিত্য এবং রাজনীতির আলোচনা হবে। আমাদের দোকানকে কেন্দ্র করে একটি নতুন ইন্‌টেলেকচুয়াল সম্প্রদায় গ'ড়ে উঠবে ভেবে আমরা বিষম পুলকিত হ'য়ে উঠেছিলাম। বাঙালী সন্তানের ইন্‌টেলেকচুয়েল নবারি যাবে কোথায়? ভাবটা যেন ব্যবসাটা উপলক্ষ্য মাত্র নব্য বাঙলা সৃষ্টির জন্যই আমাদের এই কৃচ্ছ্রসাধন!

যাক্‌গে, মির্জাপুর অঞ্চলে একটি ছোট্ট ঘর নিয়ে আমাদের দোকান খোলা হ'ল। দোকানের নাম—Tea and Gossip. মস্ত একটা টেবিলের চার পাশে খান দশেক চেয়ার বসিয়ে আমরা তো জাঁকিয়ে বসলুম। আমাদের জনকয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, তাঁরা দু'বেলাই এসে বসেন। এক কাপ চা নিয়ে এমন প্রভূত পরিমাণ Gossip শুরু করেন যে আর উঠবার নাম নেই। নতুন কোনো খদ্দেরের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ। দিনের পর দিন যায় একটি লোকের দেখা নেই। অথচ আমাদের দোকানের ঠিক সুমুখেই একটা প্রকাণ্ড মেস। ঐ মেসটা ছিল আমাদের মস্ত বড় ভরসা। কিন্তু ওখান থেকে একটি প্রাণীও আমাদের চা চেখে দেখবার জন্য এল না। এদিকে আমাদের যৎসামান্য মূলধন দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসচে। কিন্তু আমাদের আড্ডা সমানভাবেই চলছে—জন দশেকে জটলা করি চেয়ার চেপে বসে। একদিন একটি ব্যক্তি সসংকোচে প্রবেশ করলেন। ইনি ঐ মেসের অধিবাসী। খুব বিনীতভাবে জিগ্‌গেস করলেন, এটা কি চায়ের দোকান? আমরা তো অবাক! সে কি মশাই, আপনাদের নাকের তলায় বসে আছি এ্যাদ্দিন ধ'রে আর আপনারা কিনা—। ভদ্রলোক বল্লেন, আর বলবেন না, এই নিয়ে আমাদের অনেক জল্পনা-কল্পনা হয়েছে, সবাই বলছিলেন, ওটা দোকান নয়, নিশ্চয় ক্লাব ট্লাব হবে। দোকানটার নামও এমন

দিয়েছেন, ঠিক দোকান বলে বোঝা কঠিন আর খদ্দের তো দেখছি বাঁধা ক'জন। আমরা ভাবলুম, নিশ্চয় ওটা ক্লাব।

মাস ছয়েক মাত্র দোকান টিকেছিল। Gossipএর কল্যাণে পরম আনন্দেই দিন কাটছিল। এমন কি, ব্যবসা expand ক'রে খদ্দেরের সংখ্যাও চৌদ্দ পনেরতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পকেট-এর পয়সা খরচ ক'রে আরো কিছুদিন আমরা ব্যবসা চালাতাম যদি না হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম যে, নতুন খদ্দেরদের মধ্যে অধিকাংশই পুলিশের স্পাই। এছাড়া আরো দু' একজন বন্ধু সপ্তাহে এক আধদিন আসতেন। এর মধ্যে নী—বাবু (তিনি এখন অতিশয় পদস্থ ব্যক্তি) রোজই যাবার বেলায় আমাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে কানে কানে বলতেন, টেবিলটা বিক্রি করবার আগে আমাকে অবশ্যি জানাবেন, খাসা ডাইনিং টেবিল হবে।

চায়ের দোকান

আমি যে আড্ডাচারী মানুষ সে কথা আগেই বলে নিয়েছি। আমার এই লেখার মধ্যে গোড়া থেকেই একটি আড্ডার সুর লেগে আছে। যাঁরা এর নিয়মিত পাঠক বোধ করি তাঁরাও আমার মতোই আড্ডাধারী মানুষ, তা নইলে এর মূল সুরটি ঠিক ভালো লাগবে না। সেদিন এক ভদ্রলোক বলছিলেন এই লেখাগুলোর মধ্যে কেবল আড্ডার আমেজ নয় একটু যেন চায়ের গন্ধও পাওয়া যায়। কথাটা শুনে আমার ভারী ভালো লাগল। যিনি এ কথা বলেছেন তিনি আমার সব চাইতে বড় সমঝদার। চায়ের পেয়ালাকে আশ্রয় করেই আমার রসের কারবার।

চা হচ্ছে আড্ডার অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এ যুগের ডিমোক্রাটিক দেবতাদের সোমরস। অতি আধুনিক ভাষায় বলতে গেলে চা'কে বলব আড্ডাচক্রের পেট্রল; চা নইলে আড্ডার চাকা ঘোরে না। উষ্ণ পানীয়ের ধোঁয়াটি মগজের মধ্যে প্রবেশ করে আর জামধরা মস্তিষ্কের কোষগুলি আপনিই মেলে যেতে থাকে। রসের সঙ্গে রসনার অতি নিকট সম্পর্ক। চায়ের রস জিভে লাগলেই রসনা মুখর হয়ে ওঠে। অবশ্যি এমন অনেক রস আছে যা পেটে পড়লে রসনা আর রাশ মানে না। আর সব নেশাতে মাতামাতি হয়, হাতাহাতি হয়, কিন্তু আড্ডাটি হয় না। এদিক থেকে চা নিষ্কলঙ্ক পানীয়, এমন কি মাত্রা ছাড়িয়ে পান করলেও মাত্রাজ্ঞান ঠিক থাকে, ইংরেজ কবি যে জন্য বলেছেন—the cup that cheers but not inebriates.

আমার জীবনের সব চাইতে রসস্নিগ্ধ প্রহরগুলি কেটেছে চায়ের দোকানে। ছাত্রাবস্থায় এবং কলেজোত্তর দিনেও কি প্রভূত পরিমাণে আড্ডা দিয়েছি এই সব দোকানে। চায়ের আড্ডাগুলি ছিল শহরের হৃৎপিণ্ড, শহরের প্রাণ-স্পন্দন এখানেই অনুভব করা যেত। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালাটিকে কেন্দ্র করে টেবিলের চারধারে এক একটি মণ্ডলী। কোথাও সাহিত্যালোচনা, কোথাও রাজনীতিচর্চা, কোথাও সামাদ, গোষ্ঠপালের গুণকীর্তন, কিছুবা সিনেমা তারকাদের নামগান। সেদিন যাঁরা সাহিত্যের আড্ডা জমাতেন তাঁদের কেউ কেউ আজ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। পাশের টেবিলে বসে নিজেকে এঁদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী মনে করে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি এবং চায়ের দোকানটিকে mermaid tavernএর সঙ্গে তুলনা করে কতদিন রোমাঞ্চিত বোধ করেছি। রাজনীতির চর্চা যাঁরা করতেন, তাঁরা কেউ নামজাদা খ্যাতি লাভ না করলেও অনেকে দেশের জন্য নানারকম দুঃখ ক্লেশ সহ্য করেছেন। ক্রীড়ামোদীদের কথা ঠিক জানিনে। তবু

এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে বর্তমান বাঙলার খুব বড় একটা অংশ এইসব চা চক্র থেকেই ছিটকে বেরিয়েছে। সেদিনের চা-এর আড্ডাগুলি যা ভেবেছে আজকের বাঙলা অনেকখানি তাই থেকেই গড়ে উঠেছে। ভালো হয়েছে কি মন্দ হয়েছে সে কথা আলাদা। আসল সত্যটা হ'ল—what the tea-shops think today Bengal thinks to-morrow.

বহুদিন পরে সেদিন আমার অতি পরিচিত চায়ের দোকানটিতে গিয়েছিলাম। বলা বাহুল্য এখন আর চায়ের দোকানে আড্ডা জমাই না। এখন আমাদের আড্ডা বসে নিভৃত গৃহকোণে, সেটা বদ্ধ জলাশয়ের মতো। দোকানের আড্ডা অনেক বেশী প্রাণবান। রাজপথের জনপ্রবাহের সঙ্গে সংযুক্ত বলেই এর মধ্যে একটা স্রোতের বেগ আছে। ঘরের আড্ডা তোলা জলে স্নান, দোকানের আড্ডা অবগাহন স্নান। ওর মধ্যে তৃপ্তি বেশী। গৃহগত আড্ডা নিষ্প্রাণ হতে বাধ্য কারণ একদিকে গৃহ অপরদিকে গৃহিণী তার টুঁটি চেপে ধরেন। চায়ে সোয়াদ থাকে সোয়াস্তি থাকে না, পেট ভরে তো মন ভরে না। এর মধ্যে একটা অস্বস্তিকর, এমন কি বলা যেতে পারে অস্বাস্থ্যকর respectibility আছে যেটা একেবারে আমার ধাতে সয় না।

হ্যাঁ, বলছিলুম কি অনেক দিন পরে সেই চায়ের দোকানটিতে ঢুকলুম। দোকানের মালিক ভোলেন নি—এই যে আসুন, আসুন··· কতকাল পরে, কি আশ্চর্য! কুশলবার্তা জিগ্‌গেস করলেন। পুরোনো দিনের বন্ধুদের খবর জেনে নিলেন, নিজেও দু'একজনের খবর দিলেন। দোকানের আসল মালিক গৌরবাবু মারা গেছেন এখন ইনিই কর্তা। ইনি আমাদের বয়েসী লোক, আমাদের সঙ্গেই এঁর আত্মীয়তা। চারদিকে যাঁরা কুণ্ডলীকৃত ধূমোদ্গীরণের সঙ্গে মণ্ডলী করে বসেছেন

তাঁরা নতুন generation এর লোক। এঁদের চোখে অনাত্মীয় দৃষ্টি, এঁরা স্বতন্ত্র।

কিন্তু স্বতন্ত্র হলে কি হয়, বাঙালীর স্বভাব যায় না মলে। সেই সাহিত্যালোচনা, সেই রাজনীতি, সেই খেলা আর সিনেমা। চায়ের কাপটি সুমুখে নিয়ে খুব নির্লিপ্ত ভঙ্গীতে বসে আছি। টুকরা টাকরা কথাগুলি কানে আসছে—নোয়াখালি, বিহার, জওহরলাল—Bengal is being neglected ইত্যাদি ইত্যাদি। বেশ উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। হঠাৎ যদি ফস্ করে বলে বসতুম—It's because Bengal has made herself negligible. তবে বোধ করি একটা মারাত্মক কাণ্ড হয়ে যেত। ভাগ্যিস্ বলে ফেলিনি, কেনই বা বলব? বলবার কি অধিকার আছে? সতেরো আঠারো বছর আগে আমরা যারা এখানে আড্ডা দিয়েছি, সেদিন আমরাই ছিলাম rising generation জাতি গঠনের ভার নাকি ছিল আমাদের হাতে। আজকের ছেলেরা যদি ব্যর্থতার কথা বলে তবে সেটা আমাদেরই ব্যর্থতা। আমরাই এঁদের গড়ে তুলতে পারিনি। এ generationএর ব্যর্থতা আগের generationএর ওপরে indictment. ১৯১৪ সনের লড়াইতে চার্চিল ছিলেন ইংলণ্ডের অন্যতম সমরমন্ত্রী, ১৯৩৯ সনের যুদ্ধেও চার্চিল ইংলণ্ডের বিপত্তারণ মধুসূদন। স্টেট্সম্যান পত্রিকা দুঃখ করে বলেছিলেন—গত পঁচিশ বৎসরের শিক্ষা ইংলণ্ডে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে, কারণ দেশকে জয়যাত্রার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন এমন মানুষের সৃষ্টি হয়নি। বাঙলা দেশেও তাই। আমরা যখন কলেজের ছাত্র তখন রাজনীতির ক্ষেত্রে সুভাষবাবুর আবির্ভাব। আজকের দুর্দিনেও নেতাজীর বেঁচে থাকার সম্ভাবনাটাকেই আমরা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছি। গত পঁচিশ বছরে দ্বিতীয় কোন নেতার জন্ম হয়নি। সে ধিক্কার পূর্বগামী generationএর অর্থাৎ আমাদের। যে শ্লেষবাক্য আমার

মুখে এসে গিয়েছিল এক ঢোঁক চায়ের সঙ্গে সেটি হজম করে নিলাম। নিন্দা করব কাকে? ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি, মাথা কর নত, এ আমার, এ তোমার পাপ—।…এক যুগ পরে দোকানটিতে গিয়ে ভালই করেছিলাম—বাঙলার হৃৎস্পন্দনটি আর একবার অনুভব করলাম। মনে মনে আমি উৎফুল্ল হয়েছি। ছেলেদের মনে এই যে বেদনাবোধ এইটি সুলক্ষণ। বেদনাকেই আমি বলি চেতনা। বেশ বুঝতে পারছি বাঙলার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

পাকা চুল

মাথায় পাকা চুল দেখা দিয়েছিল বলে ফাল্গুনী নাটকে মহারাজের মন খারাপ হয়েছিল। আমার মাথায় ইদানীং পাকা চুল দেখা দিয়েছে, কিন্তু সত্যি বলছি আমার মন খারাপ হয়নি। আমি নির্বিকারচিত্তে পাকা চুল শিরোধার্য করে নিয়েছি। অনেকের কাছে পাকা চুলটা নাকি একটা বিভীষিকা। আমাদের গ্রাম্য কবি বলেছেন, কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদে ক্যানে? জানি না সত্যি লোকে কাঁদে কিনা। শুনেছি অনেকে কলপ মেখে সাদা চুল কালো করে। যারা মাথায় চুন-কালি মাখে তারা নিজেদেরই মুখে চুণ-কালি দেয়। ছদ্মবেশের চলন আছে, কিন্তু ছদ্মকেশ অচল। আমি ছদ্মনাম গ্রহণ করতে পারি কিন্তু তাই বলে ছদ্মকেশ গ্রহণ করতে রাজি নই।

আমার কাছে পাকা চুলটা ভয়ের বস্তু নয়, পাকা মনকেই ভয়। চুল পাকা বয়সের ধর্ম, কিন্তু মন পাকা অধর্ম আর তারই নাম বার্ধক্য। চালশেতে যখন পায় চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে, শরীর নিস্তেজ হয়।

কিন্তু আমার মতে ওটা আসল বার্ধক্য নয়। মন যদি নিস্তেজ হয়, মনের দৃষ্টি যদি আচ্ছন্ন হয় তবে তাকেই বলি বার্ধক্য। সে বার্ধক্য চল্লিশের অপেক্ষা রাখে না, অনেক আগেই আসতে পারে। আবার অশীতিপর বৃদ্ধও যৌবন অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন। এই তো সেদিন মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর পণ্ডিত জওহরলাল বলছিলেন, এই সাতাত্তর বছরের যুবকটির সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে মনে হচ্ছে আমার বয়স কিছু কমে গিয়েছে। We always feel younger and stronger after meeting him.

তাহলেই দেখছেন কোষ্ঠী মিলিয়ে যৌবন বা বার্ধক্যের বিচার হয় না। গান্ধীজী একবার রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, A young poet of seventy can dance while an old man of sixty can hardly walk. গান্ধী বা রবীন্দ্রনাথকে আমরা বৃদ্ধ বলব কোন পর্যায়? এঁদের মন চিরনবীন, এঁদের জীবন যৌবনের রসে অভিসিক্ত। রবীন্দ্রনাথ ছোট্ট একটি মেয়েকে জিগগেস করছেন, 'আমার পক্ককেশ আর লম্বা দাড়ির সম্ভ্রমে, আমারে যে ভয় করনি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে'—ভয় করবে কেন? বার্ধক্যের বিভীষিকা যে এঁদের ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। বার্ধক্যই এঁদের ভয় করে চলে।

গতিকেই বলি যৌবন আর গতানুগতিককেই বলি বার্ধক্য। জীবনের গতিবেগ যেখানে অব্যাহত সেখানেই চিরস্থায়ী যৌবন। জরা দেহকে আক্রমণ করুক, কিন্তু মনকে যেন স্পর্শ করতে না পারে। পণ্ডিতেরা বলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় অর্জুনের বয়স ছিল ষাটের ঊর্ধ্বে। কিন্তু তখন তাঁর পূর্ণ যৌবন। যৌবন জিনিসটা বয়স নিরপেক্ষ। কোনো এক অতিমাত্রায় হিসেবী সমালোচক অনেক গবেষণা করে বলেছেন, ট্রয়ের যুদ্ধের সময় হেলেনের বয়স ছিল প্রায় সত্তর। কিন্তু বয়স যতই হোক তিনি ছিলেন জগতের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। উক্ত হিসেবী সমালোচকের

গোড়াতেই গলদ। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে হেলেন উর্ব্বশীর ন্যায় অনন্ত যৌবনা।

দুঃখের বিষয় যৌবনকে আমরা শ্রদ্ধার চোখে দেখি না, ভয়ের চোখে দেখি আমাদের দেশের বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেছেন যৌবন অতি বিষম কাল। কেউ কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পা দেওয়া মাত্র তার অভিভাবক এবং আত্মীয় স্বজনের দল চোখ বুজে দুর্গা নাম স্মরণ করতে থাকেন। সেই নিরীহ ব্যক্তিটাকে কোনো রকমে ত্রিশের কোঠা পার করে দিতে পারলে সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেন—যাক ফাঁড়া কাটল। আমাদের দেশে যৌবন কেবল বিষম কাল নয়, এটা একটা বিষম দায়। যৌবন যে এক বিষম দায় তার একটি দৃষ্টান্ত দি'চ্ছি। একবার আমাকে চাকরির উমেদারীতে জনৈক ভারতীয় আই সি এস-এর সম্মুখে হাজির হতে হয়েছিল। আই সি এস আমাকে দেখে বল্লেন, Don't you think you are too young for the post ? মজাটা দেখুন। Too old for the post বল্লেও না হয় একটা মানে হ'ত। Youth কি একটা disqualification ? মানুষের জীবনে যেটা সবশ্রেষ্ঠ গুণ সেটাই আমাদের দেশে মানুষের সব চাইতে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মোহ মুদ্গরের দেশ অকাল বার্ধক্যের দেশ। শঙ্করাচার্য এক মুদ্গরাঘাতেই আমাদের ঠাণ্ডা করেছেন। যেখানে ধন মান প্রাণ সবই মোহ, সবই মিথ্যা বলে বিবেচিত হয় সে দেশের লোক অকালে বৃদ্ধ না হয়ে যায় না। অনেক রকমের মোহ দিয়ে যৌবন গড়া। মোহমুক্তি মানে বার্ধক্য প্রাপ্তি। সেজন্য আমি মোহ থেকে মুক্তি চাইনে। চুলে আমার পাক ধরুক না, আমি মনের চারধারে মোহের বর্ম পরে নিয়েছি। বার্ধক্যের দূত পাকা চুলের সাধ্যি নেই সে বর্ম ভেদ করে।

আমাদের দেশে যেমন অকাল বার্ধক্য ইয়োরোপে তেমনি অকাল-পক্কতা। ওটা আরো খারাপ। যৌবনকে নিয়ে ওরা বড্ড বেশি

মাতামাতি করে। সেটা এক ধরণের হ্যাংলামি, ওর মধ্যে dignity নেই। দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছি। বেভারলি নিকলস্ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে Verdict প্রচার ক'রে অল্প দিনে যথেষ্ট কুখ্যাতি অর্জন করেছেন। লেখকের পাকামো ঐ বই-এর ছত্রে ছত্রে। সেটা কিছুই আশ্চর্য নয়। কারণ লোকটা যে অতিশয় অকালপক্ক তার প্রমাণ তিনি আত্মচরিত লিখেছেন পঁচিশ বৎসর বয়সে। সে গ্রন্থের নাম—Twenty five. তার মতে পঁচিশের পরে জীবন সূর্য অর্থাৎ যৌবন সূর্য অস্তোন্মুখ। এইজন্যেই বলেছিলাম এটা এক ধরণের হ্যাংলামি। ওদের দেশে ঐ এক কথা—গেল, গেল যৌবন গেল—অতএব থাক ও সব বলে কি লাভ। ইথেল ম্যানিন আত্মকাহিনী (Confessions and Impressions) লিখেছেন ত্রিশের পূর্বে। ডর্জ ল্যান্সবারি ম্যানিনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, অত তাড়া কিসের, সবে তো জীবন শুরু। শ্রীমতি বল্লেন, যৌবন গেলে জীবনের স্বাদ একটুও থাকবে না। সে তো ঠিক কথা। যৌবনই জীবন, যৌবনান্তকেই বলি জীবনান্ত। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এত যার ঠুনকো যৌবন তিনি আবার যৌবনের বড়াই করেন কোন্ মুখে ? ওটা ত চুলে কলপ লাগানো যৌবন। তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন কেবল বাঙলাদেশের মেয়েরাই কুড়িতে বুড়ি হয় না, ওদেশেও হয়।

যাক্‌গে, আমার এই প্রবন্ধটা পড়ে অনেকে হয়তো মনে মনে হাসছেন। বলছেন এটাও, এক রকম পাকা চুলে কলপ দেওয়ার মতো অর্থাৎ আমি যে বৃদ্ধ হতে চলেছি সে কথাটাই নানা কথার প্যাঁচে আমি ঢাকা দিতে চাচ্ছি। সত্যি বলছি, তা নয়, ঢাকা দিতেই যদি চাইতুম তবে কি আর ঢাক পিটিয়ে বলতুম আমার মাথায় পাকা চুল দেখা দিয়েছে।

নীলকুঠি

সেদিন বেড়াতে বেড়াতে যে যায়গাটায় গিয়েছিলাম সেটা এক কালে নীলকুঠি ছিল। প্রকাণ্ড কুঠি বাড়িটা ভেঙে পড়েছে, দেওয়ালের ফাটল থেকে অশথ গাছ গজিয়েছে। ধ্বংসলীলার ধ্বজা উড়িয়েছে অশথ গাছ; ইতিহাসের ছেঁড়া পাতার মতো বাতাসে ফর্ ফর্ করে উড়ছে অশথ গাছের পাতা। অনেকটা যায়গা জুড়ে এই কুঠি, এখন জঙ্গলে আচ্ছন্ন। ভেতরে প্রবেশ করে সমস্তটা দেখবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঝোপঝাড় কাঁটাবন ভেদ করে বেশি দূর অগ্রসর হতে পারলুম না। সঙ্গী বন্ধুটি আবার সাপখোপের ভয় দেখাতে লাগলেন। দু একটা বড় বড় চৌবাচ্চা মতন দেখলুম, ওগুলোতে নাকি নীল গাজানো হোতো। কুঠি-বাড়ির চারদিকটা ঘুরে ঘুরে দেখে এক যায়গায় এসে চুপ ক'রে বসে রইলুম। অস্তগামী সূর্যের রক্তাভা মাঠে প্রান্তরে মুঠো মুঠো ছড়িয়ে পড়েছে। এর মাঝখানে এই ভাঙা কুঠিবাড়িটাকে অত্যন্ত কুৎসিৎ লাগছিল। প্রাচীন ভগ্নাবশেষের প্রতি মানুষের একটা স্বাভাবিক মমতা থাকে। কিন্তু এই বাড়ির ইতিহাস এতই কলঙ্কিত মনে হচ্ছিল—ওখানটায় থেকে ও যেন এই অপূর্ব ল্যাণ্ডস্কেপটিকে পর্যন্ত কলুষিত করে দিয়েছে। আজকে আমার চোখে এই ভগ্নস্তূপ ব্রিটিশ বর্বরতার একটা গলিত শবদেহ বই আর কি?

প্রায় এক শতাব্দি পূর্বের একটি বিস্মৃত-প্রায় ইতিহাস চোখের সামনে ভেসে উঠল। এই কুঠিবাড়ি একদিন লোকজনে সরগরম ছিল, কুঠিয়াল সাহেবের বিক্রম যে কোনো লাট সাহেবের বিক্রমকে লজ্জা দিতে পারত। শাসন এবং শোষণের এমন নগ্ন, এমন

নির্লজ্জ প্রকাশ এসব কুঠিতে যেমন হয়েছে এমন আর কোথাও নয়। আজ কোথায় গেল সে বৈভব, সে বিক্রম। ঝড়ের মুখে সব গেছে উড়ে —gone with the wind. আজ কোথায় সে লাঠিয়ালের দল প্রজাকে মারধর করে, প্রাণের ভয় দেখিয়ে নীল চাষে যারা বাধ্য করত? সঙ্গী বন্ধুটি আমার আনমনা ভাব লক্ষ্য করেছিলেন, জিগগেস করলেন, কি ভাবছেন? বল্লুম, ভাবছি শ্যামচাঁদের কথা। বন্ধু অবাক হয়ে বল্লেন. শ্যামচাঁদ? সে আবার কে? তাইতো শ্যামচাঁদ আবার কে? আপনারাও ভুলে গিয়েছেন কিনা কে জানে। বাংলা দেশের লোক —কানু ছাড়া কেত্তন নেই—শ্যাম বললেই শ্যামের বাঁশির কথা মনে পড়ে। বললুম, শ্যামর্চাদকে জানেন না? এই গাঁয়ের চাষীরা নিশ্চয় জানে। এদের পূর্বপুরুষদের সঙ্গে শ্যামর্চাদের সবিশেষ পরিচয় ছিল, সে পরিচয় বড় মর্মান্তিক। শ্যামর্চাদ ছিল এক রকমের বেত চামড়া দিয়ে মোড়া, তাই নিয়ে নীলকুঠির সাহেবরা প্রজাদের সায়েস্তা করত। ঐ যে কুঠিটা দেখছেন ওরই ভেতরে ছিল ওদের নিজেদের কয়েদখানা। যাকে ইচ্ছে ধরে এনে আটক করে রাখত, নির্মমভাবে প্রহার করত। মেয়েদের ইজ্জত নষ্ট করত। নীলের অত্যাচারে সমস্ত সমাজ দেহ বিষে নীল হয়ে গিয়েছিল। যে নীল তৈরির জন্য ইংরেজরা এমন পশুর মত ব্যবহার করেছে সেই নীল জার্মেনরা তৈরি করেছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। একজন করেছে মস্তিষ্কের ক্ষমতায় আর একজন করেছে পাশবিক বল প্রয়োগে। অথচ ইংরেজের বিচারে জার্মেনরা হল বর্বর আর ইংরেজ হলেন সুসভ্য। নীলকুঠিগুলি বোধ করি পৃথিবীর সবপ্রথম কন্‌সেনট্রেশন ক্যাম্প।

খানিকক্ষণ দুজনেই চুপ করে বসে রইলুম। আমাদের দুজনের চিন্তা যে একই খাতে বইছে তা কোনো কথা না বলেও বেশ বুঝতে পারছিলুম। খানিক পরে শুনলুম আমার বন্ধুটি গুন গুন করে গান

ধরেছেন—ময়রাণী লো সই, নীল গেজেছে কই; একদিন এই গান বাংলা দেশের ঘরে ঘরে উত্তেজনার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। সমাজ-চেতনা জাগাবার দিক থেকে নীলদর্পণ নিঃসন্দেহে বাংলা দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছিলেন, "কোন গ্রন্থবিশেষ যে সমাজকে এতখানি কম্পিত করিতে পারে তাহা অগ্রে আমরা জানিতাম না।" এদিক থেকে নীলদর্পণ Uncle Tom's Cabinএর সমজাতীয়। দীনবন্ধু মিত্র আমাদের গণজাগরণের প্রথম পুরোহিত। প্রকৃতপক্ষে নীল আন্দোলনই ভারতবর্ষের প্রথম গণ-আন্দোলন।

সেই আমাদের প্রথম রাষ্ট্রীয় (একে রাষ্ট্রীয় বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই) অভিযানের যাঁরা ছিলেন পুরোভাগে তাঁদের কথা আজকের মানুষ ভুলে যাচ্ছে। নদীয়া জেলার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাসের কথা আজ ক'জনের মনে আছে? কুঠিয়ালদের অত্যাচার থেকে দরিদ্র প্রজাদের বাঁচাবার জন্য এই দুই ভ্রাতা সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। নীল বিদ্রোহের লাল ঝাণ্ডা এঁরাই প্রথম উত্তোলন করেছিলেন। উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের এই প্রথম বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে মস্কো থেকে ধার করা বুলি কপচাতে হয় নি। হ্যাঁ, আর ছিলেন মালদহের রফিক মণ্ডল, কিষাণ বন্ধু হিসেবে এঁর সমতুল্য ব্যক্তি সেকালে দেশে খুব কমই ছিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকরাও এঁর শৌর্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। পাদ্রী লং-এর কথাও ভুলব না। ইনি নিজে উদ্যোগী হয়ে নীল-দর্পণের ইংরেজি অনুবাদ (অনুবাদক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন) প্রকাশ করেছিলেন। সে অপরাধে তাঁর এক মাস জেল এবং হাজার টাকা জরিমানা হয়েছিল।

সে যুগের যোদ্ধাদের মধ্যে আর ছিলেন হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ মুখার্জি। নীলকর সাহেবরা তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিল। মামলা দায়ের হতে না হতেই হরিশ মুখার্জির মৃত্যু হয়; কিন্তু সুসভ্য

ইংরেজের কাছে অত সহজে কেউ কখনো নিষ্কৃতি পায় না। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীর নামে মামলা রুজু করা হল। তুমি না করেছ তো তোমার স্বামী করেছে—এটা হল বিশপের নীতিকথা (ঈশপের নয়)। হরিশ মুখার্জির স্ত্রীকে হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে মামলা আপোষ করতে হয়েছিল।

হায়রে, ছেলেবেলায় Englands Work in India পড়ে আমরা পরীক্ষা পাশ করেছি। ইংরেজ সুশাসনের গুণগান না করে কিনা আজ ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধার করতে বসেছি। কি করব, যে কবি আমার ন্যায় ভদ্রোচিত শিক্ষা পেয়ে আমার মতো অন্ধ কিম্বা খঞ্জ হন নি তিনি কিনা বলছেন—

নীল বাঁদরে সোনার বাংলা কর্লে এবার ছারখার
অসময়ে হরিশ মোল, লংএর হল কারাগার
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার।

ইংরেজ সুশাসনের সুবিস্তৃত বর্ণনা পড়েও আমি যদি কবির কথাই বিশ্বাস করি তবে সে অপরাধ কার, আমার না কবির, না ইংরেজের? ইংরেজই সে কথার জবাব দিক।

যে মহাত্মা গান্ধী আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনার গুরু ভারতবর্ষে তাঁর সত্যাগ্রহের প্রথম পরীক্ষা হয়েছিল এই নীল আন্দোলন নিয়েই। বিহারের চম্পারণ সত্যাগ্রহ নীলকরদের বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সনে তাঁর আন্দোলনের ফলেই বিহার থেকে নীল চাষের উচ্ছেদ হয়। সেই আন্দোলনেই রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রথম আবির্ভাব।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কুঠিবাড়িটা ধীরে ধীরে আত্মগোপন করেছে সত্যি কথা বলতে কি, পুরোণো ইতিহাসের বিষ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমার মমজ্বালা কিঞ্চিৎ উপশম হয়েছে। একালের সব পাঠকদের কাছে ইতিহাস ছিল অস্পষ্ট তাঁদের জন্যে ইচ্ছে করেই এই বিষটুকু পরিবেশন করলুম।

কিন্তু তাই বলে নির্জলা বিষ নয়। ইতিহাসকে মন্থন করলে একদিকে যেমন বিষ ওঠে অপর দিকে তেমনি অমৃতও ওঠে। যে পুণ্যস্মৃতি বিদ্রোহীদের নাম করেছি (এ ছাড়াও আরও অনেকে আছেন) তাঁরা স্বয়ং অমৃতস্য পুত্রাঃ। নীলের বিষ পান করে তাঁরা হয়েছেন নীলকণ্ঠ।

বিদ্যাসাগরী চটি

কথাটা উঠল ঐ নীল দর্পনের আলোচনা সম্পর্কেই। তারপরে যেমনটা হয়, আড্ডার কথা পাক খেয়ে খেয়ে মুখে মুখে ঘুরে বেড়াতে থাকে। সেই যে নীল দর্পনের অভিনয় দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে বিদ্যেসাগর মহাশয় কুঠিয়াল সাহেবের দিকে তাঁর চটি ছুড়ে মেরেছিলেন সে কথাও আলোচনা প্রসঙ্গে এসে গেল। একজন জিগগেস করলেন, আচ্ছা কুঠিয়াল সাহেবের ভূমিকায় কে নেবেছিলেন, বলুন তো। জনৈক সভ্য বললেন, যদ্দূর মনে পড়ছে, বোধহয় অর্ধেন্দু মুস্তফি হবেন। আমি বললুম, ও প্রশ্নটি অবান্তর। বিদ্যেসাগর মহাশয় চটি ছুড়ে মেরেছিলেন সমগ্র ইংরেজ বণিক সমাজের মুখে। তাঁর চটি হচ্ছে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিপীড়িতের আয়ুধ। যে যুগে কমিউনিষ্ট জন্মগ্রহণ করে নি বিদ্যেসাগর সে যুগের কমিউনিষ্ট। সকল রকম অত্যাচার এবং উৎপীড়নের বিরুদ্ধে এই অমিত তেজ ব্রাহ্মণ যেভাবে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন সেরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। আমাদের Social order এর মূলদেশে তিনি যেমন নিদারুণ আঘাত হেনেছেন এমন আর কেউ করেনি। সেই নিরতিশয় কঠিন সংগ্রামে বলতে গেলে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একাকী। একদিকে আধা-বিলিতি সমাজ অপর দিকে সনাতনী

হিন্দু সমাজ—এ দুই এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে—এই বিদ্রোহী ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষকে কঠিন হস্তে শাসন করেছেন। একবার এই বিদ্রোহী বীরের চেহারাটা কল্পনা করে দেখুন—গায়ে বিদ্যেসাগরী মোটা চাদর—সেই তাঁর বর্ম—তূণে একটি মাত্র অস্ত্র, বলতে পারেন ব্রহ্মাস্ত্র—সেটি হচ্ছে বিদ্যেসাগরী চটি। সেই সুপ্রসিদ্ধ চটির আস্ফালনে সমগ্র বঙ্গ সমাজ কম্পিত হয়ে উঠেছিল।

বিদ্যাসাগর যেমন প্রাতঃস্মরণীয় এবং চিরস্মরণীয় বিদ্যাসাগরের চটিও তেমনি চিরস্মরণীয়। এমনকি প্রাতঃকালে স্মরণ করলেও লাভ বই ক্ষতি নেই। পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং না করে যদি ঐ চটি-যুগলকে নিত্য স্মরণ করি তবে বলব বাঙ্গালী জাতির মহাপাতক নাশনং এর সম্ভাবনা আছে। শুনেছি বিদ্যেসাগর মশায় রঙ্গমঞ্চের ওপর যে চটি ছুড়ে মেরেছিলেন অর্ধেন্দুবাবু তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে তা মাথায় রেখেছিলেন। বলেছিলেন, অভিনেতা জীবনে এই তাঁর চরম পুরস্কার। বিদ্যেসাগরী চটির চলন আজও আছে। ঘাড় বাঁকানো চটি পরে লোককে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে দেখি। অবশ্যি তার চেহারার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। রং এর চাকচিক্য বেড়েছে, চামড়া আগের চাইতে মসৃণ নরম এবং তুলতুলে হযেছে। সবলকে দুর্বল করতে বাঙ্গালী সব সময়েই ওস্তাদ। আদি এবং অকৃত্রিম বিদ্যেসাগরী চটিতে আর তার আধুনিক সংস্করণে যে তফাৎ বিদ্যাসাগর চরিত্রে আর আজকের বাঙ্গালী চরিত্রে ঠিক সেই তফাৎ। বাঙ্গালী জাতি যদি সত্যিকারের hero-worshipper হত তবে বিদ্যেসাগরী চটী পায়ে না রেখে অর্ধেন্দুবাবুর মতো মাথায় রাখত। যে জিনিস তার পদশোভা বর্ধন করে সে জিনিস তার শিরোভূষণ হতে পারত। কারণ আমার মতে বিদ্যেসাগরী চটি একটা symbol—বিদ্যাসাগরের দুর্জয় তেজস্বিতার প্রতীক। এই হিসাবে বিদ্যেসাগরী চটি বাঙলাদেশের একটা ইনষ্টিটিউশন।

বাঙলাদেশের এক যুগের ইতিহাস ঐ চটিকে কেন্দ্র করে এবং সে ইতিহাস অতিশয় গৌরবের ইতিহাস।

সেই বিদ্যেসাগরী উত্তরীয় এবং তালতলার চটির মর্মবাণী বাঙালী যদি যথার্থই অন্তরে গ্রহণ করত তবে আজকের শিক্ষাভিমানী বাঙালী সমাজ কখনই বিলিতি ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারত না। সেকালের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীরা যখন সাহেব সেজে ইংরেজ প্রভুদের উদ্দেশে চাটুবাক্য বর্ষণ করতেন তখন বিদ্যাসাগর পরিপাটিরূপে তাঁদের প্রতি চটি বর্ষণ (figuratively) করতেন। ইতিপূর্বে 'স্তব' নামক প্রবন্ধে আমি সে কথার আভাস দিয়েছি। তাঁর জীবিতকালে সমগ্র বাঙালী সমাজ যে চরণ বন্দনা করেছে চটি সমেত সেই শ্রীচরণ তিনি উদ্ধত স্বভাব ইংরেজ রাজ-কর্মচারীর নাকের ডগায় তুলে ধরতেও কিছু-মাত্র ইতস্তত করেন নি। সে কাহিনী বোধ করি আপনাদের অবিদিত নেই। কার্যোপলক্ষে হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপাল কার সাহেবের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। অভব্য সাহেব তাঁর সবুট পদযুগল টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। পরে যখন ঐ কার সাহেব সংস্কৃত কলেজে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে আসেন তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাড় বাকানো চটি সমেত দুই পা টেবিলে তুলে দিয়ে সাহেবের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন। বলা বাহুল্য সাহেব তাতে বিলক্ষণ বিরক্তি বোধ করেছিলেন। করবারই কথা, ইংরেজি এটিকেট শাস্ত্রমতে চটির চাইতে বুটের কৌলিন্য বেশী। সাহেবের উষ্মার কথা জেনে বিদ্যাসাগর মশায় হেসে বলেছিলেন, কি জানি, সাহেবী কায়দা কানুন তো ভালো জানিনে, আমি ভেবেছিলাম ওটাই বুঝি বিলিতি ভব্যতা।

চটি জুতার প্রতি ইংরেজের বিদ্বেষ সর্বজনবিদিত। শিবনাথ শাস্ত্রী বর্ণিত উড্রো সাহেব ও চটি জুতার উপাখ্যান আমাদের জানা আছে।

বোধ করি বিদ্যাসাগরের চটির আঘাতেই ইংরেজের মনে এই চটি জুতো ভীতি জন্মেছে। সেটা আজ পর্যন্তও আছে কি না জানি না; কিন্তু কুড়ি পঁচিশ বৎসর আগে পর্যন্তও ছিল। স্যার আশুতোষ মুখার্জির এক সহযাত্রী ইংরেজ তাঁর চটি জুতো দেখে নাসিকা কুঞ্চিত করেছিলেন। পরে আশুতোষ যখন নিদ্রিত তখন ঐ ইংরেজ পুঙ্গব তাঁর চটি কামরা থেকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আশুতোষ জেগে উঠে চটি খুঁজে পান না, ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। সহযাত্রীটি স্বয়ং তখন নিদ্রিত। আশুবাবু তৎক্ষণাৎ পেগ-এ ঝোলান সাহেবের কোটটি তুলে চলন্ত গাড়ির জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন। সকাল বেলায় জেগে উঠে সাহেব কোট খুঁজছেন, আশুবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন। আশুতোষ অতিশয় গম্ভীর মুখে বললেন, your coat has gone to fetch my slippers. ইংরেজ বীরপুঙ্গব আর কথা বাড়াতে সাহস করেন নি। ততক্ষণে বেশ-বুঝতে পেরেছেন চটির চাইতে চটির মালিক আরো সাংঘাতিক বস্তু। এই প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ যুগের বাঙালীদের মধ্যে স্যার আশুতোষ বহুল পরিমাণে বিদ্যেসাগরী চটির মান রক্ষা করেছেন অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বহুবিধ গুণ তাঁর মধ্যে বর্তিয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের কথাতেই আবার ফিরে আসা যাক। পূর্বেই বলেছি এই পুরুষ সিংহের সেই বিক্রমে একদা সমগ্র বাঙালী সমাজ প্রকম্পিত হয়েছিল। শুনেছি এমন কথাও তিনি বলেছিলেন, বাঙলাদেশে এমন লোকটা কে আছে যার মাথার ওপরে এই চটিটা রাখতে পারিনে। সেদিন বাঙলাদেশ সত্যিই তাঁর চটিকে শিরোধার্য করে নিয়েছিল। এই স্পর্ধাপূর্ণ উক্তি শুনে অনেকে হয়ত বলবেন বিদ্যাসাগর অতিশয় অহঙ্কারী ব্যক্তি ছিলেন। তা তো ছিলেনই, যিনি অনন্যসাধারণ ব্যক্তি, অহঙ্কার তাকেই সাজে। বিনয় আমার এবং আপনার ভূষণ; কারণ

আমরা অকিঞ্চন ব্যক্তি। বিদ্যাসাগরের বেলায় অহঙ্কারই অলঙ্কার। পুকুরে ঢেউ থাকে না, সাগরেই পর্বত প্রমাণ ঢেউ থাকে। প্রদীপে উত্তাপ থাকে না, সূর্যের উত্তাপে দহন জ্বালা আছে। হিমালয় উন্নত শির আকাশে তুলেছে, সে কি তার অহঙ্কার নয়? বিদ্যাসাগর সাগরের ন্যায় বিশাল, নগাধিরাজের ন্যায় উন্নত-শির; এই জন্যই অহঙ্কারে তাঁর বিধিদত্ত অধিকার।

গান্ধী টুপি

সেদিন আমাদের বৈঠকে বিদ্যাসাগর মশায়ের কথা আর শেষ হ'তে চায় না। একেক জন এক একটা করে কাহিনী বলছেন, কথা আর ফুরোয় না। আমরা আড্ডাচারী মানুষ, পরনিন্দা পরচর্চ্চা ঢের করে থাকি। মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের গুণকীর্তন করে সে পাপক্ষয় করতে হয়। বহুদিন পরে সমবেত ভাবে কিছু পুণ্যসঞ্চয় করা গেল, কারণ বিদ্যাসাগরের কথা অমৃত সমান এবং যাঁরা শ্রবণ করলেন তাঁরা সকলেই পুণ্যবান। রবীন্দ্রনাথ দুঃখ করে বলেছেন জনসনের মতো বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল ছিল না। বস্‌ওয়েলের অভাবে বিদ্যাসাগর জীবনের কত কত ক্ষুদ্র অথচ অমূল্য কাহিনী চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছে। সাগরের অতলে কত মণিমুক্তা ছড়িয়ে ছিল, ডুবুরীর অভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালেই তা পড়ে রইল। বাঙলা দেশের পক্ষে সেটা কত বড় ক্ষতি বাঙালী মাত্রেই তা বুঝতে পারবেন। এমন অরিজিনাল বা স্বতন্ত্র চরিত্র ব্যক্তি বাঙলা দেশে বোধ করি আর জন্মগ্রহণ করেন নি। বাঙলা দেশ যা দিয়ে বড় হয়েছে তার বহু জিনিসের

উৎস সন্ধান করলে শেষ পর্যন্ত গিয়ে বিদ্যাসাগরে ঠেকে। বহু জিনিস তাঁর কাছ থেকে নেওযা তিনি কারো কাছ থেকে কিছু নেন নি। তিনি একেবারে অরিজিনাল—হিমালয় কিম্বা গঙ্গা নদী যেমন অরিজিনাল। এই দুই এর সঙ্গে তাঁর চরিত্রের আশ্চর্য রকম মিল রয়েছে।

বন্ধুরা বলছিলেন, বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আরো কিছু লিখতে। আমি বল্লুম, সাগরকে কি ঝিনুক দিযে সেঁচা যায়? ইন্দ্রজিতের খাতার গোটা খাতাটাই যদি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে লিখে যাই তাহলেও আমার সব কথা ফুরোবে না। সেজন্য সব কিছু বাদ দিযে আমি শুধু বিদ্যাসাগরের চটির কথাই বলেছি। শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকার মতো বিদ্যাসাগরের পাদুকাই ইন্দ্রজিতেব খাতার পাতা অলঙ্কৃত করুক।

পূর্ব প্রবন্ধে বলেছিলাম বিদ্যাসাগরী চটি বাঙলা দেশের এক যুগের প্রতীক। সারা ভারতবর্ষের এই যুগের প্রতীক যদি সন্ধান করি তবে পাই গান্ধী-টুপি। বিদ্যাসাগরের যুগে ভারতবর্ষেব জাতীয় একতার বন্ধন ততটা দৃঢ় হয নি। এইজন্য তাঁর চটি বাঙলা দেশেরই ঐতিহাসিক সামগ্রী। গান্ধীজীং বলতে গেলে সর্বপ্রথম সমগ্র ভারতকে একতাব বন্ধনে বেঁধেছেন। ভাবতবর্ষ এক বিষম বৈষম্যের দেশ—জাতিগত, ধর্মগত, বর্ণগত, ভাষাগত তদুপরি পোষাকগত বৈষম্যের ফলে অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে। ইয়ুরোপীয়দের মধ্যে জাতিগত এবং ভাষাগত বৈষম্য আছে, কিন্তু ধর্ম এবং পোষাকের বৈষম্য নেই। আমবা কথায় বলে থাকি ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি দেবতা অর্থাৎ যত মানুষ তত দেবতা। সেই সূত্র ধরে যদি বলি ভারতবর্ষে তেত্রিশ কোটি রকমের পোষাক তাহলে বোধ করি কিছু অন্যায় বলা হয় না। এই যে আমাদের ঘরে আমরা 'জন দশেকে জটলা করছি তক্তপোষে বসে'—তার মধ্যেও কারো পোষাকের সঙ্গে কারো পোষাকের মিল নেই।

ভারতবাসী হিসাবে আমাদের সাজে সজ্জায়ও কোথাও একটা মিল থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ সজ্জাগত বৈষম্য ক্রমে মজ্জাগত হয়ে যায়। গান্ধী টুপি সেই মিলের একটা চেষ্টা এবং আমি মনে করি কাছা কোচায় মিল হওযার চাইতে মাথায় মিল হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এইজন্যই বলছিলাম যে গান্ধী টুপি সেই সর্বভারতীয় মিলনের প্রতীক। অবশ্য ইদানীং ভারতীয় জাতিটিকে দ্বিধাবিভক্ত করবার চেষ্টা চলেছে অর্থাৎ মাথাটিকে দ্বিখণ্ডিত করে তার এক অংশে পরানো হবে গান্ধী টুপি অপর অংশে জিন্না-টুপি। অর্থাৎ দুটোর একটাও থাকবে না কারণ মাথা ফাটাফাটি যখন হবে তখন মাথায় ফেটি বাঁধা ছাড়া অন্য কিছু পরা সম্ভব হবে না।

বিদ্যেসাগরী চটি বিদ্যাসাগর মশায় নিজে ব্যবহার করতেন। গান্ধী-টুপি আর সবাই ব্যবহার করে কেবল গান্ধীজী করেন না। এ যুগে যে সব শক্তিমান ব্যক্তি দেশে বেশে ইতিহাস রচনা করেছেন তাঁদের নামের সঙ্গে এক একটা জিনিস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। চার্চিলের চুরুট, চ্যাম্বারলেনের ছাতা, হিটলারের কপাল-ঢাকা চুল, ষ্ট্যালিনের গোঁফ ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ হয়ে থাকবে। এট্যাম বম্ব আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত চার্চিলের চুরুটটাই ছিল মিত্রপক্ষের সব চেয়ে বড় আগ্নেয়াস্ত্র। চ্যাম্বারলেনের ছাতা ইংলণ্ডের লজ্জাকর appeasement policy-র প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন, আমার কলমটা চ্যাম্বারলেনের ছাতার বাঁট দিয়ে তৈরি নয়। সে কথা তিনি যে অর্থেই বলে থাকুন আমার মতে একথার মানে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখনী নির্ভীক এবং অপরাজেয। হিটলার চুল দিযে কপাল ঢেকেছিলেন, কিন্তু কপালের লিখন খণ্ডাতে পারেন নি। ষ্ট্যালিনের গোঁফের মধ্যে এমন একটা অনমনীয় দৃঢ়তা আছে যা রাশিয়ার যুদ্ধ জয়ের রীতিমতো সহায়তা করেছে। ষ্ট্যালিন কথাটার মানে—man of steel. আমার বোধ হয় ষ্ট্যালিনের গোঁফ made of steel.

যে সব জিনিসের কথা এখানে উল্লেখ করলুম সেগুলো উক্ত ক্ষণজন্মা পুরুষদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু গান্ধী-টুপির সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক ঠিক সে ভাবের নয়। ঐখানেই গান্ধী অরিজিনাল। কংগ্রেসের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তিনি যেমন বলেন—I am not even a four-anna member of the congress—এও তেমনি। যে গান্ধী টুপি গত পঁচিশ বৎসর ধরে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক সেই গান্ধী টুপি তিনি আপন মস্তকে ধারণ করেন নি। পাঁকাল মাছের মতো পাঁকে ডুবে থাকেন কিন্তু পাঁক গায়ে লাগে না। অবশ্যি আমি গান্ধী টুপিকে পঙ্কিল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করছিনে। আমার বক্তব্য হচ্ছে তিনি রাজনীতির চর্চা করেন কিন্তু রাজনৈতিক পোষাক পরিধান করেন না। অপর দিকে তিনি সংসার বিরাগী পথের ভিক্ষুক কিন্তু সন্ন্যাসীর গেরুয়া তিনি ধারণ করেন না। তিনি যে কটিবাস ধারণ করেছেন সেটা দরিদ্র ভারত সন্তানের প্রতীক। কিন্তু তাই নিয়ে তিনি জাঁক করেন না। রাউণ্ড-টেবল বৈঠক উপলক্ষে যখন বিলেতে গিয়েছিলেন তখন কৌতুহলী ইংরেজ সন্তানেরা তাঁর কটিবাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলেন: আমি হ'লে তক্ষুণী ভারতের দুর্নিবার দারিদ্র্য সম্বন্ধে অন্তত ঘণ্টাখানেক বক্তৃতা করে ফেলতুম, কিন্তু গান্ধীজী শুধু মৃদু হেসে বলেছিলেন, you people in your country use plus fours, we in our country use minus fours. সেই সংক্ষিপ্ত জবাব যেমন কৌতুকোজ্জ্বল তেমনি অরিজিনাল। গান্ধী ছাড়া আর কারো মুখ থেকে এমন জবাব বেরোত না।

গান্ধী এ যুগের সব চেয়ে অরিজিনাল ব্যক্তি। শুধু আমাদের দেশের কথা বলছিনে, সমগ্র পৃথিবীর কথাই বলছি। গত কয়েক বৎসরে আমরা পৃথিবীর নানা দেশে বহু একচ্ছত্র নেতা দেখেছি। এঁদের নেতৃত্বের পশ্চাতে অস্ত্রশস্ত্র, সৈন্যসামন্ত, আইন কানুন, বিধিনিষেধ,

কনস্‌ক্রিপসন, কনসেন্‌ট্রেশন ইত্যাদি কত কি যে ছিল। ওদিকে গান্ধীজী কেবলমাত্র আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায় কোটি কোটি লোকের উপর আধিপত্য স্থাপন করেছেন। বাধ্যবাধকতার দ্বারা কিম্বা কোন প্রকার লাভের লোভ দেখিয়ে তিনি মানুষের আনুগত্য লাভ করেন নি। তিনি যে পথে তাঁর দেশবাসীকে আহ্বান করেছেন সেটা দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ এবং লাঞ্ছনার পথ। সেই দুর্গম পথে ভারতবাসী যেভাবে তার নেতার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। গান্ধী টুপি সেই দুঃখ, ত্যাগ এবং লাঞ্ছনার প্রতীক। এর মধ্যে এমন একটি নির্মল আভিজাত্য আছে, যে আভিজাত্য ধনে নয়, মানে নয়, প্রাণের সমৃদ্ধিতে।

গান্ধী প্যারাডক্স

কিছুদিন পূর্বে আমাদের দেশে যে পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন এসেছিল তার অন্যতম সভ্য মিঃ নিকলসন্ গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে বলেছিলেন যে, একদিকে গান্ধীজীর চেহারা ও পোষাক—অপর দিকে গান্ধীজীর মুখের ইংরেজী—এ দুটো জিনিষের মধ্যে আমি কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাইনি। অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক, পেটে মাটির প্রলেপ লাগানো একটি অর্ধনগ্ন ব্যক্তির মুখ থেকে এমন অত্যাশ্চর্য ইংরেজী বেরোতে পারে, তাই দেখে তিনি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজী ভাষার উপরে তাঁর অদ্ভুত দখলের কথা লুই ফিশারও বলেছেন। অথচ সেই গান্ধীজী পারতপক্ষে ইংরেজী বলেন না, বরং বলেন ইংরেজী বলা মহাপাপ। তিনি হিন্দি ভাষায় বক্তৃতা করেন, সে বক্তৃতার বারো আনা আমি বুঝতে

পারিনে। আপনারাও যে খুব বেশী বোঝেন এমন আমি মনে করি না। গান্ধীজী বৃথা বাক্য ব্যয় করে কখনো শক্তি ক্ষয় করেন না, এমন কি সপ্তাহে একদিন মৌনাবলম্বন করেন। কিন্তু রাষ্ট্র ভাষার দৌলতে তাঁকে কতখানি বাক্য এবং শক্তি বৃথা ব্যয় করতে হয় তা ভেবে আমি বিস্মিত হই।

গান্ধীজীর চরিত্রে এরকম আপাতবিরোধী ব্যাপার অনেক আছে, অসাধারণ ব্যক্তি মাত্রেরই এরূপ হ'তে বাধ্য। আমরা সাদাসিধে সাধারণ মানুষ। মুখে যা বলি কাজে তাই করি, বোধ সেই জন্যই আমরা সাধারণ। যাঁরা অসাধারণ তাঁরা মুখে এক কাজে আর। অর্থাৎ তাঁদের কথায় আর কাজে মিল থাকলেও সেটা সাধারণ মানুষের বুদ্ধির গোচর নয়। এজন্য, যে মহাত্মাজী বলতে গেলে সরলতার প্রতিমূর্ত্তি তাঁর জীবন বাস্তবিক পক্ষে জটিলতায় পূর্ণ।

গান্ধীজী ব্যারিষ্টার মানুষ। অবশ্যি সেটা এখন ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হয়ে পড়েছে। গান্ধীজী বিলেতে গিয়ে যেটুকু বিলিতি বং মেখে এসেছিলেন, সেটা দেশে এসে তেরাত্রিও টেকেনি। এখন তাঁর পোষাক এবং চেহারা দেখলে কে বলবে তিনি ব্যারিষ্টার মানুষ! ব্যারিষ্টার সাহেবেরা বোধকরি তাঁকে ব্যারিষ্টারকুলকলঙ্ক বলে গাল দিয়ে থাকেন। অমিট্ রায়ের পোষাক বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ব্যারিষ্টার অমিট্ রায়ের সঙ্গে গান্ধীজীর এক জায়গায় মিল আছে। দুজনেরই ট্যাকঘড়ি কোমর থেকে ঝুলছে, যদিও গান্ধীজীর ঘড়িটা বৃন্দাবনী ছিটের থলিতে গোঁজা নয়। কিন্তু সবটা মিলিয়ে গান্ধীজীর পোষাকটাও তাঁর এক ধরণের অট্টহাসি। বর্ত্তমান সভ্যতার বিরাট বাহুল্যকে তিনি হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন।

স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গান্ধীজী আমাদের যে অস্ত্রটি দিয়েছেন

সেটির নাম অহিংসা। এটি হচ্ছে গান্ধীজীর আর একটি প্যারাডক্স। অহিংস ব্যক্তি হয়েও তিনি অস্ত্র ধারণ করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেন অহিংস সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামের তিনি হলেন প্রধান সেনাপতি। একবার তিনি নিজেকে জেনারেলিসিমো আখ্যা দিয়েছিলেন। তাতে ষ্টেটম্যান পত্রিকা উষ্মা প্রকাশ করে বলেছিলেন গান্ধী অহিংসার উপাসক বটে, কিন্তু তাঁর ভাষা অত্যন্ত মিলিটারী ধরণের। গান্ধী চরিত্রের অন্তর্নিহিত প্যারাডক্সটি এঁরা বুঝতে পারেননি বলেই অমন বোকার মত কথা বলেছিলেন। ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করতে এসে ইংরেজ চরিত্রের যথেষ্ট অধোগতি হয়েছে। কিন্তু তারা যে Sense of humourও হারিয়ে ফেলেছে সেটাই সবচেয়ে হাস্যকর ব্যাপার।

গান্ধীজী যথার্থই অহিংস ব্যক্তি। মানব হিতার্থে তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন, প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর ব্যাকুলতার অন্ত নেই, অথচ সেই গান্ধী যখন তাঁর অহিংস সংগ্রাম শুরু করেন, তখন সহস্র সহস্র ব্যক্তির দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনার সীমা থাকে না। কত লোক কারাগারে রুদ্ধ হয়, কত লোক পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। যিনি কোন মানুষের অনিষ্ট চিন্তা কোন কালে করেন না, তাঁর কার্যের ফলে এমন মহামারী ব্যাপার কেমন করে হয়? এটিও গান্ধী চরিত্রের এক প্যারাডক্স; কিন্তু আর সব প্যারাডক্সের মত এটিও অস্বাভাবিক নয়। যে বিধাতা একদিকে সৃষ্টি এবং স্থিতির দেবতা, সেই বিধাতাই আবার প্রলয় সংঘটন করে থাকেন। অহিংসার যিনি পূজারী তাঁরও রুদ্রমূর্তি তাঁরও সংহার মূর্তি আছে।

এ পর্যন্ত গান্ধী-চরিত্রের এই আপাতবিরোধীতা আমি এক রকম বুঝেছি, কিন্তু একটি ব্যাপারে তাঁর কথায় এবং কাজে সত্যিকারের বিরোধ দেখতে পাচ্ছি। আমাদের এটা যান্ত্রিক যুগ। গান্ধীজী যন্ত্র বিরোধী। তাঁর মতে যন্ত্রই এ যুগের সকল যন্ত্রণার মূলে। যন্ত্রকে তিনি

শয়তান আখ্যা দিয়েছেন। অথচ এ-যুগের যন্ত্রপাতি তিনি যে পরিমাণে ব্যবহার করেন এমন আর কেউ করে না। তিনি ভারতবর্ষের সবচেয়ে widely travelled man এবং সে ভ্রমন তাঁকে রেলে ষ্টীমারে মোটরেই করতে হয়। একমাত্র এরোপ্লেনে তিনি আজ পর্যন্ত ভ্রমন করেন নি। তবে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্য আমাদের নেতৃবর্গ এরোপ্লেনে চড়ে সকালে এসে বিকেলে ফিরে যান। এই এরোপ্লেন ব্যবহার প্রকারান্তরে তিনিই করছেন। আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তিরা জীবনে যতবার টেলিগ্রাম কিম্বা টেলিফোন যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি, ততবার বোধকরি তিনি প্রতিদিন করে থাকেন; আর তাঁর মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণের জন্য তাঁর সহকর্ম্মীরা ততোধিক ব্যবহার করেন। সভাসমিতিতে বক্তৃতা করতে হলেই তাঁকে মাইক্ ব্যবহার করতে হয়। তাঁর হরিজন পত্রিকা বিভিন্ন ভাষায় প্রতি সপ্তাহে অন্তত এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়। বলা বাহুল্য সে পত্রিকাটি হস্তলিখিত নয়। প্রতিদিনের খবরের কাগজে তিনি যতখানি জায়গা জুড়ে থাকেন পৃথিবীতে আর কোন ব্যক্তি ততখানি নয়। মুদ্রাযন্ত্রের কাছে তাঁর ঋণ অসীম। তাঁর লক্ষ লক্ষ ফটোগ্রাফ দেশ দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, সেগু'ও কিছু মন্ত্র বলে সিদ্ধ হয় না। এমন কি তিনি যে চরকা মন্ত্র জপ করেন, সেটিও একটি যন্ত্র—হস্তচালিত হলেও যন্ত্র। আমি উপরে যে সব যন্ত্রের উল্লেখ করেছি, সে সব যন্ত্র না থাকলে গান্ধীজীর কি যন্ত্রণাই হত একবার ভেবে দেখুন। নোয়াখালিতে পদব্রজে চলতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়েছে, মাইকহীন মিটিংএ বক্তৃতা করতে গিয়ে গলা ভাঙচে। মুদ্রাযন্ত্রহীন সংসারে গান্ধীজীর কি দুর্দশা হ'ত তাই ভেবে আমার বিষম আতঙ্ক হয়। গান্ধীজী তো মহাপুরুষ। ছাপাখানা না থাকলে এই আমার মতো কাপুরুষটি তার মনের আতঙ্ক আপনাদের কাছে কেমন করে প্রকাশ করত বলুন দেখি।

সিঙ্গার মেশিন

গান্ধীজী দুনিয়ার সব যন্ত্র নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর পরিকল্পিত সমাজে যন্ত্রের কোনো স্থান নেই—একমাত্র তাঁর চরকা আর তাঁত ছাড়া। যন্ত্র মানুষের হাতে আসুরিক বল দিয়েছে; মানবকে দানব করেছে যন্ত্র। যান্ত্রিক শক্তি পৃথিবীর অর্থ-নৈতিক ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়েছে। অল্পসংখ্যক মানুষের হাতে ধন সঞ্চিত হয়ে ক্যাপিটালিজম-এর উৎপত্তি হয়েছে। যন্ত্র মানুষের লোভ দিয়েছে বাড়িয়ে। এখন লোভে যুদ্ধ, যুদ্ধে মৃত্যু।

গান্ধীজী যদিচ সকল প্রকার যন্ত্রের বিরোধী তথাপি তিনি স্বীকার করেছেন যে, এ যুগের একটি যন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই যন্ত্রটি হচ্ছে সিঙ্গার মেশিন। তাঁর এই অনুরাগের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি উক্ত যন্ত্রটির জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে ঐ জন্ম ইতিহাসটি অতিশয় রোম্যান্টিক। সিঙ্গার সাহেব ছিলেন গরীব কেরানী, তাঁর সামান্য আয়ে সংসার ভালোভাবে চলত না। তাঁর স্ত্রী সংসারের আয় বাড়াবার জন্য ছেলেপেলের জামা সেলাই করে বিক্রি করতেন। সংসারের কাজকর্ম সব সেরে অবসর সময়টুকু ভদ্র মহিলা স্ুঁচসুতো হাতে করে কাটাতেন। স্ত্রীর অবিশ্রান্ত খাটুনি দেখে স্বামীর মনে দুঃখ হ'ত। কিন্তু উপায় কি? স্ত্রীর উপার্জিত টাকা ক'টি না হ'লেও সংসার চলে না। সুতরাং কিভাবে স্ত্রীর মেহানৎ বাঁচানো যায় সিঙ্গার সারাক্ষণ তাই ভাবতেন। সুঁচ সুতোতে সেলাই করে কি পোষায়? বহুদিন ধরে ভেবে ভেবে এই সেলাই কলটির পরিকল্পনা তাঁর মাথায় আসে। এই মেশিন তিনি একান্তভাবে

তাঁর স্ত্রীর জন্যই করেছিলেন, আমার কিম্বা আপনার স্ত্রীর জন্য করেন নি। এইটিই হচ্ছে সিঙ্গার মেশিনের রোম্যান্টিক ইতিহাস। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গভীর অনুরাগ এই মেশিনকে বিশেষ একটি মর্যাদা দান করেছে। গান্ধীজীর মতো যন্ত্র-বিরোধী মানুষও এর কাছে মাথা নত করেছেন। কিন্তু গান্ধীজীর কাছ থেকে আমার এইটুকু শুধু জানতে ইচ্ছে করে যে, ঐ মেশিনটি প্যাটেণ্ট করে সিঙ্গার সাহেব জীবদ্দশায় ক্যাপিটালিষ্ট হয়েছিলেন কিনা।

যাক্‌গে, সিঙ্গার সাহেব তাঁর মেশিনের দৌলতে বড়লোক হলেও আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই, কারণ আমি পরশ্রীকাতর ব্যক্তি নই। এমন কি আমি পরস্ত্রীকাতরও নই। সিঙ্গার পত্নীর শ্রম লাঘবে আমার আপত্তি হবে কেন? বরঞ্চ গান্ধীজীর মতো আমিও সিঙ্গার মেশিনের কাছে মাথা নত করেছি। তাঁর স্ত্রীর দুঃখ মোচনের মধ্য দিয়ে তিনি বহু দরিদ্র পরিবারের দুঃখ দূর করেছেন। মধ্যবিত্ত পরিবারে এমন অবশ্য প্রয়োজনীয় জিনিস বোধকরি আর দ্বিতীয়টি নেই। কিন্তু আপনারা শুনে অবাক হবেন আমার ঘরে সিঙ্গার মেসিন নেই, কিন্তু স্ত্রী আছেন এবং সেই স্ত্রীকে সিঙ্গার পত্নীর মতো সারাক্ষণ সেলাই করতে হয়। ছুঁচ সুতো দিয়ে সেলাই করার দুঃখ সিঙ্গার সাহেবের মতো আমিও প্রতিনিয়ত দেখছি। অথচ সিঙ্গারের মতো আমার মাথা থেকে কোনো উপায় তো বের হয়-ই নি, পকেট থেকেও এমন পয়সা বের করতে পাচ্ছি না, যা দিয়ে অন্তত মেশিনটি কিনে নেওয়া যায়। আমার স্ত্রী সেলাই করেন আর ছুঁচের প্রত্যেকটি ফোঁড় অক্ষম স্বামীর গায়ে এসে লাগে। সুতরাং দেখতেই পাচ্ছেন স্ত্রীর জন্য আমার ব্যাকুলতা সিঙ্গার সাহেবের চাইতে কিছু কম নয়। এই ব্যাকুলতাটাই হ'ল রোমান্স। আমি যদি কবি হ'তাম তবে হুড-এর মতো Song of the shirt লিখতুম, অবশ্যি সেটা song না হয়ে dirge

হ'ত। দুঃখের বিষয় গান্ধীজী সিঙ্গার সাহেবের যন্ত্রজাত রোমান্সটির খোঁজ রেখেছেন কিন্তু আমার হৃদজাত রোমান্সের খোঁজ রাখেন নি। এজন্য আমি নিজেকে গান্ধী মহাকাব্যের উপেক্ষিত বলে মনে করি।

আমার মতে প্রত্যেকটি যন্ত্রের ইতিহাসই রোমান্টিক। অনাবশ্যক দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে একটিমাত্র যন্ত্রের দৃষ্টান্ত দেব। হারগ্রিভস্-এর আবিষ্কৃত স্পিনিং জেনির নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। ইনি ল্যাঙ্কাশায়ারের একজন দরিদ্র অধিবাসী। ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প আজ জগৎ প্রসিদ্ধ, কিন্তু এর মূলে ছিলেন হারগ্রিভস্। স্বামীস্ত্রীতে চরকা কেটে অতিকষ্টে সংসার চালাতেন। বহুদিনের চেষ্টায় ইনি একটি উন্নত প্রণালীর চরকা উদ্ভাবন করেছিলেন, তাতে ত্রিশটি টাকু লাগানো ছিল। চাকা ঘোরালে এক সঙ্গে ত্রিশটি সুতো বের হ'ত। এ কাজে একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। দুঃখের বিষয় যন্ত্রটি সমাপ্ত হবার আগেই ওঁর স্ত্রী মারা যান। মৃত পত্নীর নামে যন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন 'স্পিনিং জেনি'। কিন্তু রোমান্স এখানেই সমাপ্ত হয় নি। এই যন্ত্রের খবর পেয়ে গাঁয়ের লোকেরা একদিন ওঁর ঘরে ঢুকে তাঁর এত সাধের যন্ত্রটিকে আছড়ে ভেঙে চুরমার করে দেয়। সর্বনাশ, ত্রিশটি সুতো একসঙ্গে বেরোলে যে ও একাই সকলকার ভাত মারবে। হারগ্রিভস্ প্রাণভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র পালিয়েছিলেন। তবেই দেখুন এই যন্ত্রটির ইতিহাসে একাধারে রোমান্স, ট্র্যাজিডি, কমেডি সব কিছুই মিশ্রিত রয়েছে।

যাক্ সিঙ্গার মেশিনের প্রসঙ্গেই আবার ফিরে আসা যাক। আমি সত্যই সিঙ্গার মেশিনের বিশেষ ভক্ত। বিশেষ করে ঐ মেশিনের শব্দটি আমার বড় প্রিয়। সিঙ্গার সাহেব স্বনামধন্য। কাজের সঙ্গে তিনি গান জুড়ে দিয়েছেন—একেই বলে music of work. আমার মতে কর্ম সঙ্গীত ধর্ম-সঙ্গীতের চাইতেও বড় কথা। মনে আছে ছেলেবেলায় দর্জির দোকানের সামনে

দাঁড়িয়ে আমি এ শব্দটা শুনতাম। ছেলেবেলার ভালো লাগা সহজে মন থেকে যায় না, কাজেই সে শব্দের মোহটা আজও আমার মনে তেমনি রয়ে গেছে। পথে চলতে হঠাৎ কোন বাড়ী থেকে এ শব্দটা এলেই একটি কর্মনিরত গৃহবধূর স্নিগ্ধ মূর্তি চোখে ভেসে ওঠে।

ছেলেবেলায় দর্জির দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অনেকদিন ভেবেছি বড় হয়ে দর্জির কাজ করব। এটা ছিল আমার জীবনের একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আরেকটু বড় হয়ে সে আকাঙ্ক্ষা আরো দৃঢ় হয়েছিল যখন জানলুম—a gentleman is what his tailor makes of him। এঁ্যাঃ তাহলে দর্জিরা ভদ্রলোক তৈরী করতে পারে! এ তো কম কথা নয়, এ যে সকল কাজের সেরা কাজ। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু ভদ্রলোক খুব কমই সৃষ্টি করেছেন—ইংরাজিতে আমরা যাকে বলি nature's gentleman। বাদ বাকী দুনিয়ার সব ভদ্রলোক দর্জির সৃষ্টি, কিম্বা বলতে পারেন সিঙ্গার মেশিনের সৃষ্টি। জীবনের অনেক আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয়নি। দর্জি হয়ে ভদ্রলোক তৈরী করব, এ উচ্চাশাও অপূর্ণ থেকে গেছে। এখন আমি নিজেই দর্জির তৈরী ভদ্রলোক হয়ে বসে আছি।

চুরিবিদ্যে

দশমহাবিদ্যা ব্যাপারটা কি, আমি কোন কালে জানিনে। সেদিন যখন এক ভদ্রলোক আমাকে ওবিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তখন আমি একেবারে বোকা বনে গিয়েছিলুম। আমি মোটামুটি জানতুম চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা। কাজেই বল্লুম, দশমহাবিদ্যা বোধকরি দশ রকমের চুরিবিদ্যা হবে। শুনে ভদ্রলোক কি পরিমাণ হেসেছিলেন তা আপনারা অনুমান করতে পারেন। কেন জানিনে ভদ্রলোকের ধারণা আমি বিদ্বান ব্যক্তি। উনি নিশ্চয় ইন্দ্রজিতের খাতা পড়েন না। নিয়মিত পড়লে ঐ মিথ্যে ধারণা এতদিনে নিশ্চয় ঘুচে যেত। বিদ্বান ব্যক্তিরা কক্ষণো অমন অবান্তর বিষয় নিয়ে বাজে বকেন না, তাঁরা ষ্ট্যাটিস্‌টিকস্‌ ছাড়া কথাই কন না। ওঁরা সদা সত্যকথা বলেন, আমি মিথ্যে বলতে পারলে সত্য বড় একটা বলিনে। তত্রাচ উক্ত ভদ্রলোক আমার দশমহাবিদ্যার ব্যাখ্যাটাকে নিতান্তই পরিহাস বলে গ্রহণ করেছিলেন। তা হলে দেখছি বিদ্যার ছলনা দিয়ে আমি আমার মূর্খতাকে কোনো রকমে ঢেকে রেখেছি। এটা যথার্থই মহাবিদ্যা, কারণ এটা শুধু চুরি নয়, জুয়াচুরি। ইন্দ্রজিতের মধ্যে খানিকটা চৌর্যবৃত্তি থাকা খুবই স্বাভাবিক। লুকিয়ে চুরিয়ে আড়াল থেকে কাজ করা তাঁর অভ্যেস ছিল। ইন্দ্রজিৎ নামটা আমি নিতান্ত বৃথা নিইনি। আমিও অনেক রকম লুকোচুরি করে থাকি।

না বলিয়া গ্রহণ করা'কে যদি চুরি বলেন তবে আমি কখনো চুরি করিনি এমন কথা হলপ করে বলতে পারিনে এবং আমি মনে করি আমার পাঠকদের মধ্যেও অনেকেই পারবেন না। ছোট ছেলেপেলে

যখন এটা ওটা খাদ্যদ্রব্য চুরি করে খায় তখন কৈফিয়ৎ তলব করলে বলে ঐটুকু নিলে বুঝি চুরি হয়। তাদের মতে চুরিটা দ্রব্যের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। বড়রাও অনেক সময় ওরকম যুক্তির আশ্রয় নিয়ে থাকেন অর্থাৎ মনে করেন ছোটখাট জিনিস 'না বলিয়া লইলে' চুরি হয় না। সত্যি বলতে কি আমিও ওটাকে চরি বলে মনে করি না। পূর্বে যেমন বলেছি সত্যিমিথ্যা সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু ঢিলে, তেমনি চুরি সম্বন্ধেও আমার নীতিজ্ঞান টন্‌টনে নয়! নেহাৎ সিঁদেল চোর না হলে কাউকে চোর বলতে আমার বাধে। কেননা কোন না কোন রকম চৌর্যবৃত্তি সব মানুষেই করে থাকে। সিঁদেল চুরিটা একমাত্র জাত চোরেরাই করতে পারে। ওটা আমার আপনার কম্ম নয়। কাজেই অন্য সব চোর আমাদেরই মতো ভদ্রলোক।

মানুষ জিনিসটা এতই বড় এবং এসব জিনিস এত ছোট যে তাতে মানুষ হিসাবে কারো মূল্য কমে যায় বলে আমি মনে করি না। সংসারে অনেক মহাপুরুষরাও চুরি করেছেন। গান্ধীজী আর তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিলে ছেলেবেলায় লুকিয়ে স্যাকরার দোকানে গয়না বিক্রি করেছিলেন। এটা অবশ্যই চুরি কিন্তু তাই বলে কি মহাত্মার মাহাত্ম্য কিছুমাত্র কমেছে? আমি বলব বেড়েছে। তিনি আমাদের সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, আমিও তোমাদের মতোই সাধারণ মানুষ, আমারও দুর্বলতা আছে। আমি সে দুর্বলতাকে জয় করেছি, তোমরাও করতে পার। এক আধটু ছলাকলা মিথ্যা চুরি ইত্যাদির মিশ্রণ যদি না থাকত তবে মহাত্মা হতেন পাথরের দেবতা। তাঁকে পূজো করা যেত ভালবাসা যেত না। পণ্ডিত জওহরলাল বাল্যকালে পিতার টেবিল থেকে ফাউনটেন পেন চুরি করেছিলেন। তাতে কি জওহরের ঔজ্জ্বল্য কিছুমাত্র কমেছে? বরং জওহরলাল আজকে যা হয়েছেন ঐ ক্ষুদ্র ঘটনাটিও তাঁর একটি কনট্রিবিউটরী ফ্যাক্টর। তা যদি না হ'ত

তবে ঐ ঘটনাটি তার মহামূল্য আত্মচরিতে তিনি লিপিবদ্ধ করতেন না। সবলে-দুর্বলে, আসলে-নকলে-খাঁটিতে-খাদেতে মিশিয়ে তবে গোটা মানুষটা।

যাকগে, ফাউনটেন্‌পেনের কথাই যখন উঠল তখন আমার দুঃখের কাহিনীটাই বলি। সম্প্রতি আমার ফাউনটেনপেন্‌টি চুরি গিয়েছে। আমার পক্ষে এটা একটা মেজর ডিসসেসটার। উৎস লেখনী চুরি যাওয়াতে আমার লেখার উৎস শুকিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ইন্দ্রজিতের খাতা অচিরে বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে হচ্ছে। মানুষ অভ্যাসের দাস। ফাউনটেনপেন-এ লিখে এমন বদ অভ্যাস হযেছে যে দোয়াত কলমে লেখা আমার পক্ষে একটা দুঃসাধ্য কসরৎ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্যি ফাউনটেন পেন অভাবে লিখতে পাচ্ছিনে একথা স্বীকার করা আর লেখার অক্ষমতা স্বীকার করা একই কথা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ফাউনটেনপেনে-এ কালি নেই বলে লিখতে পাচ্ছিনে একথা যে ব্যক্তি বলে সে কক্ষণো লেখক হবে না। কাজেই আমার যে লেখক হবার কোনই সম্ভাবনা নেই তা আপনারা বুঝতেই পাচ্ছেন।

সম্প্রতি আমি ধারকরা কলম দিযে কোনো রকমে কাজ চালাচ্ছি। কিন্তু ধারকরা কলমের লেখায় ধার থাকে না। আর যে লেখায ধার নেই, শুধু ভার আছে, সে লেখা আপন ভারেই ডুববে। আমি ভারবাহী লেখক হতে চাইনে। ওসব লেখা লিখবেন বিদ্বানেরা পণ্ডিতেরা অধ্যাপকেরা যাঁদের বিদ্যার উপরে দেবযানীর অভিশাপ আছে। আমি লিখি আপন খুশিতে, ভারমুক্ত মনে। দোয়াতে কলম খুঁচিয়ে লেখা আর মাথা ঘামিয়ে, মাথা কুটে লেখা এক কথা। ও আমার ধাতে সয় না।

এখন আমার সমস্যা হয়েছে ঋণংকৃত্বা কতদিন এই সাহিত্যকার্য

চলতে পারে? আমার বন্ধুটি আর কতকাল আমাকে তাঁর কলমটি ধার দেবেন! ঋণ করে ঘৃত পান করা সম্ভব হলেও কাব্যামৃত পান করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে। আপনারা অবশ্য বলতে পারেন একটি কলম কিনে নিলেই গোলমাল চুকে যায়। তা যায় বটে, কিন্তু সেটাও আপাতত ঋণংকৃত্বা করতে হবে। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি লিমারিক্ মনে পড়ে যাচ্ছে. তাতে আমার সমস্যার কথঞ্চিৎ জবাব পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন—

"সকল পক্ষী মৎস-ভক্ষী
মৎসরাঙ্গা কলঙ্কিনী
সবাই কলম ধার করে
আমি শুধু কলম কিনি।"

অবশ্যি আমি হ'লে বোধকরি 'ধার করে' না লিখে 'সবাই কলম চুরি করে' লিখতুম। তাহলেই দেখতে পাচ্ছেন কলম কেনাটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। 'ধার করে' কিম্বা 'চুরি করে' যদি কাজ চলে যায় তবে কিনে কি লাভ?

কিন্তু আমি নতুন কলম কেনার কথা তত ভাবছিনে যত ভাবছি হারানো কলমটির কথা। আহা, কতকাল ওকে বুকে করে নিয়ে বেড়িয়েছি। বক্ষের ধন আর কাকে বলে? মনের কথা ওকেই বলেছি সকলের আগে। ওর অভাবটা পরমাত্মীয় বিয়োগের মতো লাগছে।

যিনি চুরি করেছেন তিনি নিশ্চয় আমারই মতো ভদ্রলোক, কারণ তিনি সিঁদেল চোর নন। কাজেই তাঁকে অভিশাপ দেব না। বরং প্রার্থনা করছি তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ হয়ে আত্মচরিত লিখুন এবং তাতে এই ফাউণ্টেনপেন চুরির কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করুন। প্রসিদ্ধ চোর-ডাকাতেরা যদি কেউ সাহস করে আত্মকাহিনী লেখেন তবে তা দেদার

বিক্রি হবে। আমেরিকার গ্যাংষ্টার কেউ যদি আত্মচরিত প্রকাশ করেন তবে সেটাই হবে এ যুগের বেষ্ট সেলর।

ইন্‌সম্‌নিয়া

কিছুদিন যাবত আমি ইন্‌সম্‌নিয়ায় ভুগছি। অবশ্যি সেটা আমার ফাউন্টেন পেনের শোকে নয়। এমন আমার মাঝে মাঝে হয়; আর একবার শুরু হলে দিন পনের'এর জের চলতে থাকে। তারপরে আপনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। গত সাত আট বছর ধরে এমনি চলছে, কাজেই অবস্থাটা আমার অভ্যাসগত হয়ে গেছে। শরীরের স্নায়ুগুলি অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে নিদ্রার ব্যাঘাত করে, সেই উত্তেজনা আপনি যখন স্তিমিত হয়ে আসে তখন নিদ্রার জন্য আর ভাবতে হয় না। এই অনিদ্রারোগের শারীরিক কিম্বা মনস্তাত্বিক কারণ নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনি। আমি আসলে ঘুম-কাতর মানুষ নই। একটু নিদ্রা লাভের জন্য কত মানুষকে কত কাতরোক্তি করতে দেখেছি। একজন ফরাসী মন্ত্রী বলেছিলেন, আহা, ঘুম যদি বাজারে কিনতে পাওয়া যেত। ঘুম কিনতে পাওয়া যাক বা না যাক, ঘুমের ওষুধ অবশ্যই কিনতে পাওয়া যায়। অনিদ্রার জন্য যখন লোকে ওষুধ খায় তখন স্বীকার করতেই হবে যে অনিদ্রা একটা রোগ বিশেষ।

আমি লোকটা রুগ্ন, অজীর্ণ রোগীর মতো জীর্ণ আমার মূর্তি, ডিস্‌পেপ্‌টিকের মতো খিটখিটে আমার প্রকৃতি। কিন্তু অনিদ্রারোগীর মতো বিনিদ্র নয়ন কিম্বা বয়ান আমার নয়। ঘুম হয়নি বলে আমার চোখের জ্বালাও নেই, মনের জ্বলুনিও নেই। সাধারণত যাঁরা অনিদ্রা-

রোগে ভোগেন তাঁরা দেখেছি সারাক্ষণ চোখ রাঙিয়েই আছেন। অনিদ্রা যেমন আমার গা-সহা তেমনি আমার মন-সহা। ইন্দ্রজিৎ নাম না নিয়ে আমি যদি নিদ্রাজিৎ নাম নিতুম তবেই আমাকে মানাত ভাল।

আমি যে ইন্দ্রজিৎ নাম গ্রহণ করেছি সেটা মিথ্যা, কারণ আমি ইন্দ্রকে জয় করিনি, ইন্দ্রিয়কে তো নয়ই। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বর্গসিংহাসনের প্রতি আমার লোভ নেই আর পঞ্চেন্দ্রিয় জয়ের প্রতি আমার স্পৃহা নেই। বলতে সংকোচ নেই ইন্দ্রিয় জয়ের চাইতে ইন্দ্রিয়-সম্ভোগেই আমি বেশি বিশ্বাস করি। ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে আমার নয়। অতএব যাহা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে স্বাদে স্পর্শে গানে—আমার আনন্দ রবে তারই মাঝখানে। এ আনন্দ আপনারাও সবাই চান। কিন্তু জিগগেস করি জীবন সম্ভোগ করবে কে? যে জেগে থাকবে সে না যে ঘুমিয়ে থাকবে সে?

আমার যে চোখে ঘুম নেই সেটাকে আমি অভিশাপ বলে মনে করি না বরং ওটাকে দেবতার বর বলে গ্রহণ করেছি। 'আঁখি হতে ঘুম কে নিল হরি' বলে আমি কখনো বিলাপ করতে বসিনি। ঘুম-কাতরদের মতো প্রাণপণে চোখ বুজে ভেড়ার পালের গতিভঙ্গি কল্পনা করতে আমি রাজি নই। সেদিন হেমিংওয়ের গল্প পড়তে গিয়ে দেখলুম এক ব্যক্তি নিজেকে ঘুম পাড়াবার জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়ে বঁড়শিতে ট্রাউট মাছ ধরবার ছবিটি কল্পনা করছেন। ভাবুন একবার, মাছ ধরবার মতো বঁড়শি দিয়ে যদি ঘুম ধরতে হয় তবেই হয়েছে। নিদ্রাদেবীকে তুষ্ট করবার জন্য আমি তো কোনরকম নৈবেদ্য সাজাতে প্রস্তুত নই।

নিদ্রাকে জ্ঞানী ব্যক্তিরা মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। কোনো কোনো ইংরেজ কবি নিদ্রাকে মৃত্যুর দোসর কিম্বা কনিষ্ঠ ভ্রাতা আখ্যা দিয়েছেন। চিরনিদ্রা হল আসল মৃত্যু কিন্তু প্রতিদিনের নিদ্রাও ছোটখাট মৃত্যু—temporary death. ইংরেজ কবি যে বলেছেন

কাপুরুষরা মৃত্যুর পূর্বে বহুবার মরে সে কথাটা তাহলে কিছুমাত্র মিথ্যা নয় এবং দুনিয়া শুদ্ধ লোককে কাপুরুষ বলে গাল দেবার জন্যই সেক্সপিয়র ও কথাটি বলেছেন।

প্রতিদিনের নিদ্রাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেখি বলেই ওটা আমাদের গায়ে লাগে না। নইলে আমাদের অতি স্বল্পস্থায়ী জীবনের কত বড় একটা অংশ নিদ্রাদেবী গ্রাস করে বসে আছেন ভাবলে আর চোখে ঘুম থাকত না। একজন সুস্থ ব্যক্তি গড়পড়তা দিনে আট ঘণ্টা করে ঘুমোয় অর্থাৎ দিনের এক-তৃতীয়াংশ আমরা ঘুমিয়ে কাটাই, তাহলেই বলতে হবে জীবনেরও এক তৃতীয়াংশ ঘুমিয়ে কাটে। অর্থাৎ একজন লোক যদি ষাট বছর বেঁচে থাকেন তবে বলতে হবে অন্ততঃ কুড়ি বছর তিনি ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। রিপ্‌ভান্‌ উইংকল্‌ কি জগতে একজনই ছিল ? আমরা সকলেই রিপ্‌ভান্‌ উইংকল-এর জ্ঞাতিগোষ্ঠী। ও গল্পটা একটা রূপক মাত্র।

এমন সুন্দর পৃথিবীতে এসে এমন মহামূল্য মানবজীবন পেয়েও কিনা আমরা হেলায় ঘুমিয়েই নষ্ট করছি। Early to bed এর মতো এমন আত্মঘাতী সদুপদেশ আর হতে পারে না। সদা সত্য কথা কহিবে র চাইতেও এটা সর্বনেশে উপদেশ। সাধে ডক্টর জনসন বলেছিলেন—

One who goes to bed before midnight is a perfect scoundrel.

নিজেকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা আত্মহত্যার মতো পাপ। আমাদের দেশের প্রাচীনেরা উপদেশ দিয়েছেন মা দিবা স্বাপ্সি। মা দিবারাত্রি স্বাপ্সি বললে আরো ভাল কথা হ'ত। ইংরেজেরা আসলে বুদ্ধিমান। ওদের দেশ নাইট ক্লাবের দেশ। ওরা দুনিয়াশুদ্ধ লোককে উপদেশ দিয়েছে Early to bed, নিজেরা কিন্তু সারারাত জেগে কাটিয়েছে। ওটাই ইংরেজের প্রথম exploitation এর বাণী। অপর সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে

রেখে নিজেরা রাত জেগে কাজ করেছে, বাণিজ্য বিস্তার অর্থাৎ সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। এইজন্যই পোহালে শর্বরী বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে। সেই দীর্ঘ শর্বরীটি কি আমরা ঘুমিয়ে কাটাইনি? বাঙলাদেশ ঘুম পাড়ানি মাসি পিসির দেশ। বর্গী আসে আসুক বুলবুলিতে ধান খায় তো খেয়ে যাক। তবু দস্যি ছেলে ঘুমাক, পাড়া জুড়োক। এখন একেবারেই জুড়িয়েছে। ইংরেজ নিশাচর জাত। তার চৌর্য্যবৃত্তির সাক্ষ্য রয়েছে ইতিহাসে। সিঁদকাঠি তার হাতে, নইলে রবীন্দ্রনাথ কেন বলবেন—

সেদিন এই বঙ্গপ্রান্তে পণ্য বিপনির একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজ-সিংহাসন।

এই সুরঙ্গ পথটি কি সিঁদ নয়? কিন্তু চৌর্যবৃত্তির জন্য চোর যতখানি দায়ী গৃহস্থের অচৈতন্য ঘুমও ততখানি দায়ী।

নবীন লেখক

কয়েকজন পাঠক কিছু কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমাকে চিঠি লিখেছেন। আমি সে সব চিঠির জবাব দিইনি তার একমাত্র কারণ আমি ওসব প্রশ্নের জবাব জানিনে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন, প্রশ্ন জিজ্ঞেস কোরো না, জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে জবাব শুনতে হবে অর্থাৎ কিনা জ্ঞানী ব্যক্তিরা মিথ্যে জবাব দেবার জন্য তৈরি হয়েই আছেন। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এই প্রবাদবাক্যটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কারণ আমি যখনই কোন প্রশ্ন করেছি তখনই মিথ্যা জবাব পেয়েছি। হ'তে পারে উত্তরদাতা সত্যি কথাই বলেছেন কিন্তু সেই সত্য কথা আমার মনঃপুত হয়নি। কাজেই আমার কাছে সে জবাব মিথ্যা হয়েছে। আমি জানি আমি জবাব দিতে গেলেও সে জবাব আপনাদের মনঃপুত হবে না অর্থাৎ কিনা আমার কাছে আপনারা মিথ্যে জবাব শুনবেন। তাছাড়া মিথ্যে জবাব দিবার জন্য যেটুকু জ্ঞান থাকা দরকার সেটুকুও আমার নেই। আমি জ্ঞানের ভাণ্ডারী নই, আমি রসের কারবারী। আমি রস সমুদ্রে ডুবতে রাজি আছি কিন্তু জ্ঞান সমুদ্রের উপকূলে নুড়ি কুড়োতে রাজি নই। আমাদের পণ্ডিত ব্যক্তিরা নিউটনের দেখাদেখি নুড়ি কুড়াতে ব্যস্ত। সে সব নুড়ি কুড়িয়ে কুড়িয়ে তাঁরা ঝুড়ি ভর্তি করেছেন, আর যখন তখন সে সব লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে আমাদের মাথার অবস্থা যা করেছেন সে আর বলবার নয়। পরদ্রব্যেষুর মতো পরা অপরা সব রকম বিদ্যাকে আমি লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করেছি এবং মাথা বাঁচিয়ে চলবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে একবার প্রবেশ করলে ওসব

ঢিল অল্প-বিস্তর মাথায় লাগবেই। সুস্থ অক্ষত মাথা নিয়ে খুব কম লোকেই ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু ঢিলটি ছুঁড়লে পাটকেলটি খেতেই হয়। এজন্য সুযোগ পেলেই ইন্দ্রজিতের খাতার মারফতে আমি পণ্ডিতদের লক্ষ্য করে পাটকেল ছুঁড়ে মারি।

যাক্‌গে, যা বলতে যাচ্ছিলাম, পাবনা থেকে জনৈক পাঠক আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন। তিনি নিজে একজন নবীন লেখক! লেখক মাত্রই আমার আত্মীয়, সে আত্মীয়তায় আমি গৌরব অনুভব করি। ঐ সাধারণ সম্পর্ক ছাড়াও এঁর সঙ্গে আমার বিশেষ একটি আত্মীয়তা আছে। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে ইন্দ্রজিৎ ছদ্মনামে কিছু কিছু লেখা তিনি লিখেছেন। অবশ্যি সে সব লেখা স্থানীয় কোনো কাগজে ছাপা হয়েছিল কাজেই তেমন সুপ্রচারিত হয়নি। একই ছদ্মনাম গ্রহণের মধ্যে তাঁর এবং আমার কোথাও একটি মনের মিল রয়েছে একথা আবিষ্কার করে তিনি আনন্দ বোধ করেছেন। স্বনামেও ইনি লিখে থাকেন। এতৎসম্পর্কে নবীন লেখকদের হয়ে কিছু কিছু দুঃখের কথা তিনি আমাকে জানিয়েছেন। লেখক হয়ে লেখকের দুঃখ যদি না বুঝি তবে আমি লেখক নামের অযোগ্য। তাছাড়া আমি বয়সে নিতান্ত প্রবীণ না হলেও নবীন নই, কিন্তু লেখক হিসেবে আমি অপেক্ষাকৃত নবীন। কারণ আমি লেখা শুরু করেছি খুব বেশি দিন নয়। এখনও অখ্যাতনামা লেখক। নবীন বয়সে এক আধখানা বই লিখেছিলাম প্রথম সংস্করণেই তাদের কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়েছে। সে সব বই নিশ্চয় যথেষ্ট পুণ্যসঞ্চয় করেছে কারণ তাদের পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে। ইদানীং টেকনিক বদল করেছি। খ্যাতিলাভের জন্য স্বনাম গোপন করে ছদ্মনামে আসরে নেমেছি। অচেনার বন্ধন সবচেয়ে বড় বন্ধন। রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কি করে যতক্ষণ চিনি নাই তোরে? জানি অচেনা মানুষকে লোকে একটু খুঁচিয়ে দেখবেই। অচেনাকে

চিনে তবে শান্তি। আমার পত্র-প্রেরকটি বলেছেন, বেশি দিন আপনার নাম অজানা থাকবে না। অতি উত্তম কথা, তাই তো চাই। যে মুহূর্তে লোক চিনে ফেলবে সে মুহূর্তে মুখোস খুলে ফেলে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করব।

লেখক বন্ধুটি দুঃখ করে লিখেছেন, নবীন লেখকদের কেউ পাত্তা দিতে চায় না, লেখা ছাপায় না। এইতো 'উপযুক্ত' নামে একটি গল্প অমুক পত্রিকায় পাঠিয়েছিলেন সেটি কেন যে তাঁরা অনুপযুক্ত বিবেচনা করেছেন তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। এ বড় কঠিন প্রশ্ন। সম্পাদকের মনের কথা দেবাঃ ন জানন্তি, আমি কেমন করে জানব? ওঁর মতো বয়সে আমি কোনো দিন পত্রিকায় লেখা পাঠাইনি, পাঠালে নিশ্চয় অনুপযুক্ত বিবেচিত হত। আর তা হলেও আমি কিছুমাত্র বিচলিত হতাম না। কারণ, অপরে অযোগ্য বললেই লেখক অযোগ্য হয় না। নবীনদের অনেকের মুখেই শুনেছি বাঙলা দেশের সব পত্রিকা মামুলি লেখকদের দিয়েই চলেছে, নবীনদের প্রবেশ নিষেধ। এ কথার জবাবে আমি এইটুকুই শুধু বলব যে, মামুলি লেখক বলে কোনো কথা নেই। লেখা যদি মামুলি হয় তবে সেটা নিশ্চয় অগ্রাহ্য এবং মামুলি লেখা প্রবীণরাও লিখে থাকেন, নবীনরাও।

এ সূত্রে সম্পাদক মশায়দের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। তাঁদের প্রধান কাজ হচ্ছে সাহিত্য পরিবেশনের কাজ। সেই পরিবেশনের কাজে আমরা অবশ্যই আশা করব যে তাঁরা নতুন নতুন সাহিত্য-প্রতিভা আবিষ্কার করবেন। কালি-কলম কল্লোল—এই দুটি পত্রিকা বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে কারণ এঁরা বহু নবীন প্রতিভাকে পাঠক সমাজের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিলেন এবং উত্তরকালে এদের মধ্যে অনেকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। কিছুদিন পূর্বে আমাদের একজন অতি বিশিষ্ট

সাহিত্যিক কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তাঁর লেখা প্রথম গল্পটি কোন সুপরিচিত পত্রিকার আপিসে বছরখানেক ফাইল-বন্দী হয়ে পড়েছিল। যতবার তাগিদ দিয়েছেন ততবারই বলেছেন, গল্পটি বিচারাধীন আছে। পরে ঐ গল্পটি উদ্ধার করে তিনি 'কল্লোল' পত্রিকায় পাঠান। One man's poison is another man's food. গল্পটী তৎক্ষণাৎ প্রকাশিত হয় এবং ঐ এক গল্পের জোরেই সাহিত্যের আসরে লেখকের আসন পাকা হয়। সম্পাদক মহাশয় গল্প লেখককে লিখেছেন আপনার এমন পাকা হাত, আপনি এতকাল কোথায় ছিলেন? একেই বলে সম্পাদকীয় প্রতিভা। অমিট্ রায়ের মতো বলা নেই কওয়া নেই গোটা একটা নিবারণ চক্রবর্তী এঁরা সর্বসমক্ষে হাজির করে দিতে পারেন। 'আনিলাম অপরিচিতের মত ধরণীতে, পরিচিত জনতার সরণীতে'। সম্পাদক হবেন অনাগত বিধাতা। যিনি আজও অনাগত তাঁকে তিনি আমাদের সুমুখে এনে দেবেন। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কি? ডেভি তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন, Faraday is my greastest discovery. ডেভির লেবরেটরিতে ফ্যারাডে ছিলেন ছোকরা চাকর। ঐ বালকের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ডেভি আবিষ্কার করেন এবং তাঁর উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সম্পাদক মশায়দের কাছে আমরা নবীন লেখকের promise সম্বন্ধে অনুরূপ অন্তর্দৃষ্টি প্রত্যাশা করি।

গুজব

গত কয়েক মাস যাবৎ দেশময় যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লঙ্কাকাণ্ড চলেছে তার ফলে দেশে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যে পরিমাণে অস্বাভাবিক হয় মানুষের মানসিক অবস্থাও সেই পরিমাণে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বহুকাল আমরা এমন সদাসন্ত্রস্ত সদা সশঙ্কিত অবস্থায় দিন কাটাইনি। বাঙালীর প্লীহা কোনকালেই সুস্থ নয়, একটুতেই পিলে চমকে ওঠে। যদি শোনে গড়পারে হাঙ্গামা হয়েছে অমনি সহরের দূরতম প্রান্ত অবধি চকিত এবং বিচলিত হয়ে পড়ে। টালায় গোলযোগ হ'লে টালিগঞ্জে দোকান বন্ধ হয়ে যায়। মুখে মুখে পল্লবিত হয়ে এতটুকু ব্যাপার এ-ই বিশাল হয়ে ওঠে। কমিয়ে বলা কার্পণ্য কাজেই সবাই বাড়িয়ে বলে। ফলে আহত ব্যক্তিরা হয় নিহত, আর একের মুখের এক, দশের মুখে দশ হয়ে ওঠে। স্নো-বলের মতো কথা মুখে মুখে গড়াতে গড়াতে ক্রমেই আয়তনে বড় হ'তে থাকে। বিহার দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা শেষ পর্য্যন্ত ত্রিশ হাজারে গিয়ে উঠেছে। স্বয়ং জিন্না সাহেব বিলেতে গিয়ে ঐ সংখ্যাটি প্রচার করেছেন। ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের ইস্কুল পাঠ্য ইতিহাসে উক্ত সংখ্যা অধিকতর স্ফীতিলাভ করবে, আশা করা যায়।

পাঞ্জাবের হাঙ্গামা সম্বন্ধে ওখানকার একজন নেতা বলেছেন মিথ্যে গুজবের ফলেই ব্যাপারটা এতো দ্রুত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। একজন বল্লে, অমুক জায়গায় মস্‌জিদ ধ্বংস হয়েছে আর একজন এসে বল্লে, অমুক যায়গায় মন্দির। ব্যস্ আর যায় কোথায়! যে দেবতার গৃহের কোনই প্রয়োজন নেই সে দেবতার গৃহরক্ষার জন্য নিরপরাধ

ব্যক্তির গৃহদাহ করতে হ'বে। দেবতাকে রক্ষা করবার জন্যে মানুষকে হত্যা করতে হ'বে। মন্দির কিম্বা মস্‌জিদ্ ভেঙে দিলেই যে দেবতা নিরাশ্রয় হয় সে অক্ষম দেবতার পূজো করে কি লাভ? আর সত্যি যদি তিনি জাগ্রত দেবতা হন তবে কত আস্পর্ধা মানুষের? দীন-শক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ—নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে, সে আমারে গৃহ করে দান! দেবতার এতবড় অপমান কোন দেশে কবে হয়েছে? এই অপমানের লজ্জাতেই দেবতার abdicate করা প্রয়োজন।

বাঙলাদেশে অতি সরলপ্রাণ গ্রাম্য মুসলমান সাধক কবি বলেছেন—তোমার পথ ঢাইকাছে মন্দিরে মস্‌জিদে। এতবড় সত্য কথা ক'জন শিক্ষাভিমানী আধুনিক মানবের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে! মন্দির মসজিদ দিয়েই দেবতার পথ রোধ করে রেখেছি। আর মানুষের উন্মত্ত আচরণ দেখে দেবতা লজ্জায় মুখ ঢেকেছেন।

আজ অত যে ধর্মকথা বলে ফেললাম তার কারণ বোধকরি আমিও প্যানিক-গ্রস্ত। বিপদে না পড়লে আমি কক্‌খনো মধুসূদনের নাম করিনা। বাস্তবিক পক্ষে শঙ্কিত মন স্বভাবতই দুর্বল মন। ত্রাসের তাড়নায় মানুষ সব কিছু বিশ্বাস করে বসে। আর গুজব রটনাকারী-দের একটা নিজস্ব আর্ট আছে। কথা বলে একেবারে প্রত্যক্ষদর্শীর মতো। হন্তদন্ত হয়ে আপনার ঘরে ঢুকে বলবে, মশাই, শুনেছেন? আপনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বলবেন, এঁ্যা, কি হল আবার? আরে, তাও জানেন না! তারপরে যে রোমহর্ষক কাহিনীটি সবিস্তারে বর্ণনা করে যাবেন সেটি বিশ্বাস না করে আপনার উপায় কি? নোয়াখালীতে আমার আত্মীয় বন্ধু অনেক আছেন। ওখানকার দাঙ্গার সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে খবর দিলেন—আপনাদের অমুকবাবুর খবর শুনেছেন? আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লুম, ওঁর খবর কিছু পেলেন নাকি?

আর খবর মশায়, সপরিবারে নিহত। নি-হত। আমি তো হতভম্ব। সংবাদদাতা (খবরের কাগজের রিপোর্টার নয়) মুখ অতিশয় গম্ভীর করে বল্লেন, শুধু কি তাই ? ওঁর বিবাহযোগ্যা কন্যাটিকে জোর করে নিয়ে বিয়ে দিয়েছে। আমি এতক্ষণে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে একটি সিগারেট ধরালাম। ভদ্রলোক আমার রকম সকম দেখে বল্লেন, আপনার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না ? আমি বল্লুম আজ্ঞে না। কেন, এমন হওয়া কি অসম্ভব ? না অসম্ভব নয়, তবে এ ক্ষেত্রে হয় নি। কারণ উক্ত বিবাহযোগ্যা কন্যাটি এই কিছুক্ষণ আগে এখানে এসেছিলেন, বাপ মায়ের জন্য খুবই উদ্বেগে আছেন সন্দেহ নাই।

এই কাহিনী থেকে আপনারা অবশ্যই মনে করবেন না যে, গুজবের সবই মিথ্যে। নোয়াখালীস্থিত আমার আত্মীয় বন্ধুটি সপরিবারে নিহত হন নি বটে কিন্তু অক্ষত দেহে ফিরতে পারেন নি। সর্বস্বান্ত তো হয়েছেনই আর লাঞ্ছনা যা হয়েছে তাও মৃত্যুতুল্য। আমাদের দেশে প্রবাদ আছে যা রটে তার কতক বটে। কিন্তু সেই কতকটা কতটুকু তাই হল বিবেচ্য। পৃথিবীতে যেমন দুই ভাগ জল, একভাগ স্থল, গুজবের মধ্যে তেমনি দুই ভাগ মিথ্যা একভাগ সত্য। কিন্তু ক্ষীরমিবাম্বুমধ্যাৎ মিথ্যা থেকে সত্যটুকু উদ্ধার করা বড় কঠিন ব্যাপার। স্যার ওয়ালটার র‍্যালের কাহিনী আপনারা বোধকরি জানেন। কারাগারে বসে তিনি পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেছিলেন। তিনি যখন ঐ কাজে লিপ্ত, তখন একদিন সকালবেলায় রাস্তায় একটা হৈ চৈ মারামারির শব্দ শুনে কারাকক্ষের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলেন। ব্যাপারটা কি জানবার জন্য কয়েকজন লোককে ডেকে জিগগেস করলেন। তিনজন লোকের কাছে একই ব্যাপার সম্বন্ধে তিনটি বিভিন্ন Version পাওয়া গেল তার কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। র‍্যালে তখন হতাশ হয়ে ভেবেছিলেন যে,

চোখের সামনে যে ঘটনাটি ঘটল তারই সত্য নিরূপণ করা যখন এত কষ্টসাধ্য তখন কারাকক্ষে বসে তিনি সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করবেন কোন ভরসায় ? বাস্তবিক পক্ষে আমরা যে ইতিহাস পাঠ করে —পরীক্ষা পাশ করে থাকি তার বারো আনা গুজব-সম্ভূত অর্থাৎ তার বেশির ভাগ legend, সামান্যই যথার্থ ইতিহাস।

গুজবের যে কি অসম্ভব শক্তি সে সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি। গল্পটি বলেছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইনষ্টিন্। কাজেই ধরে নিতে হবে এর মধ্যে খানিকটা বৈজ্ঞানিক সত্য আছে। দুই বন্ধুতে মিলে একটি পার্কে বেড়াতে গেছে। ধরুন এদের নাম রাম আর শ্যাম। পার্কে বহু লোক জড় হয়েছে। রাম হঠাৎ বল্লে, এক মিনিটের মধ্যে আমি পার্ক খালি করে দিতে পারি, এক্ষুনি সব ছুটে বেরিয়ে যাবে। শ্যাম বল্লে, অসম্ভব। রাম তৎক্ষণাৎ একটা বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, অমুক রাস্তায় একজন কোটিপতি লোক তার যথাসর্বস্ব বিলিয়ে দিচ্ছেন। রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে তাকেই কিছু দিচ্ছেন। যেই না বলা—মুহূর্তমধ্যে পার্ক শুদ্ধ লোক পাগলের মতো ছুটতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল হঠাৎ রামও তাদের পেছন পেছন ছুটতে শুরু করেছে। বন্ধু ব্যস্ত হয়ে বল্লে, ওকি তুমি ছুটছ কেন ? রাম বল্লে, সবাই যখন বিশ্বেস করেছে তাহলে বোধকরি এর মধ্যে কিছু আছে। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্ ! ইংরেজিতে কথা আছে In the crowd there is wisdom. এই গল্পটা বোধ হয় তারই দৃষ্টান্ত।

প্রপাগাণ্ডা

পূর্ব প্রবন্ধে আমি গুজব সম্বন্ধে লিখেছি। গুজব যে মানুষকে কিভাবে জব্দ করে, তা আপনারা আগেও দেখেছেন, এখনও দেখছেন। কলকাতায় যে নতুন করে দাঙ্গা শুরু হয়েছে সুরাবর্দী সাহেব বলছেন সেটাও মিথ্যে জনরবের ফলেই হয়েছে। একটা কমেডি অফ এরার থেকে নাকি এই ট্র্যাজেডির উৎপত্তি হয়েছে। সুরাবর্দী সাহেব যে নিজেই গুজবাক্রান্ত হয়েছেন, এই বিবৃতিটি তার প্রমাণ; কারণ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর এই বিশ্লেষণ বিশ্বাস করা কঠিন। আইন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ভার যাঁর ওপরে ন্যস্ত, তিনি নিজেই যদি বে-আইনী গুজবের শৃঙ্খলে আটকা পড়েন, তবে কে আমাদের রক্ষা করবে?

বে-আইনী খবর রটনাকেই বলে গুজব আর আইন বাঁচিয়ে রটনা করলে সেটা হয় প্রপাগাণ্ডা। সত্য-মিথ্যার বিচারে দুটোই সমান, দুটোই অতিশয়োক্তি। বরং গুজবের মধ্যে যদিবা সত্যের অংশ কিছুটা থাকে, প্রপাগাণ্ডা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্জলা মিথ্যা। গুজব এবং প্রপাগাণ্ডা দুইয়েরই মূলধন মানুষের credulity, বারম্বার একটা কথা শুনে শুনে শেষ পর্য্যন্ত লোকে বিশ্বাস করবেই। দুটোর মধ্যে অবশ্যই খানিকটা তফাৎ আছে। গুজল রটিয়ে যে তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেটা কেবলমাত্র মানসিক। আর প্রপাগাণ্ডা থেকে যে লভ বা তৃপ্তি, সেটা আর্থিক, অন্তত স্বার্থগত তো বটেই। প্রপাগাণ্ডার মধ্যে প্রাপ্য গণ্ডাটাই বড় কথা।

গুজব এবং বিজ্ঞাপনী ইস্তাহার—দুটোর মধ্যেই ক্ষীরের চাইতে অম্বুর প্রাধান্য। বিনা বিচারে যদি বিশ্বাস করেন তো শেষ পর্যন্ত

ঠকতে হবেই। বিজ্ঞাপনদৃষ্টে ওষুধ খেয়ে কোন স্থূলাঙ্গিনী কৃশতনু হয়েছেন বলে আমার জানা নেই। আর বিজ্ঞাপনের বহর দেখে যাঁরা কেশ তৈল ব্যবহার করেন, তাঁদের মাথায় শেষ পর্যন্ত কেশ থাকে কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবু তেমন বিজ্ঞাপন দেখলে লোভ সামলানো কঠিন। অলকানন্দ তেল মাখবার পর থেকে চুল সামলানো এক দায় হয়েছে, বোধ করি স্বয়ং দশভূজার পক্ষেও দুঃসাধ্য হত। এমন কথা শুনবার পরে আজানুলম্বিত মেঘবরণ-কেশ রাজকন্যাও বোধ হয় স্থির থাকতে পারেন না। বর্ণবিন্যাসের জন্য যাঁরা স্নো-পাউডার ব্যবহার করেন, তাঁদের সত্যি সত্যি বর্ণসৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় কিনা আমি জানি না। বিধাতা নিজ হাতে জন্ম মুহূর্তে যাদের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছেন, তারা বোধ করি, প্রহসনটাকে ষোল আনা পূর্ণ করবার জন্যেই স্বহস্তে নিজ মুখে চুণ মাখে।

লোকে বলে এটা বিজ্ঞানের যুগ, আমি বলি বিজ্ঞাপনের যুগ। কলকাতা শহরের আষ্টেপৃষ্ঠে ললাটে বিজ্ঞাপনের ছাপ। ট্রামে, বাসে, সিনেমায়, দেওয়ালের গায়ে অসংখ্য দ্রব্যের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে কলকাতা শহর দাঁড়িয়ে আছে। শহরটাকে যদি মানুষের আকৃতিতে কল্পনা করা যেত, তবে তার চেহারা বোধ করি হ'ত চিন্তামণি দাঁতের মাজন-ওয়ালার মতো। পাইড পাইপারের ন্যায় নানা বর্ণের জামা গায়ে তারস্বরে ছড়া কেটে নেচে-কুঁদে গান করছে। শহরময় বিজ্ঞাপনের নিঃশব্দ কথাগুলি হঠাৎ যদি সশব্দ হয়ে ওঠে, তবে তার অট্টরোলে শহরের আর সব শব্দ ছাপিয়ে যাবে। কাকে ছেড়ে তখন কার কথা শুনব? টাওয়ার অফ ব্যাবেল আর কাকে বলে! এ সম্পর্কে আর একটা কথাও মনে হচ্ছে। যে দেশের আদ্ধেক লোক খেতে-পরতে পায় না, নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসও সংগ্রহ করতে পারে না, সে

দেশে অনাবশ্যক বিলাস দ্রব্যের এই বিপুল আয়োজন এবং বিজ্ঞাপন কেমন যেন দৃষ্টিকটু ঠেকে।

তথাপি একথা স্বীকার করতেই হবে যে, বিজ্ঞাপন এ-যুগের সবচেয়ে বড় আর্ট। একযাত্রায় মানুষের মন এবং ধন হরণ করবার এইটিই শ্রেষ্ঠ উপায়। কেউ যদি বলেন, ধনে-প্রাণে মারবার চেষ্টা, তবে সেটা অবশ্যই বিজ্ঞাপন-বিরোধী প্রপাগাণ্ডা হয়ে দাঁড়াবে। আমি বিজ্ঞাপনবিরোধী নই, বরং আমি বিজ্ঞাপনশিল্পের একজন সমঝদার। মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের পাতা ওল্টানো আমার অভ্যেস, অবসর বিনোদনের পক্ষে চমৎকার উপায়। অনেক লোককে অতিশয় মনোযোগের সঙ্গে গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার· বিজ্ঞাপন পড়তে দেখেছি। ইদানীং বাঙলা দেশে বিজ্ঞাপন শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্‌টালে চমৎকার সব বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। আভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তুর চাইতে বাইরের বিজ্ঞাপন কিছুমাত্র কম চিত্তাকর্ষক নয়। তার কারণ এসব বিজ্ঞাপন কৃতী সাহিত্যিকদের লেখা, বিজ্ঞাপনের ছবি কুশলী শিল্পীর হাতে আঁকা। ব্যবসায়ীরা সাহিত্য এবং শিল্পকে নিজেদের বাহন করেছেন। এটি সুলক্ষণ। সাধারণ বিজ্ঞাপনের ভেতর দিয়ে জনসাধারণের রুচি মার্জিত হবে। কেউ যেন মনে না করেন যে, সাহিত্যিক এবং শিল্পীরা ব্যবসায়ীদের কাছে আত্মবিক্রয় করেছেন। বরং ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনই হবে জনশিক্ষার বাহন।

আজকাল বহু বিজ্ঞাপনের মধ্যেই সাহিত্যিক প্রসাদগুণ দেখতে পাওয়া যায়। বাঙলা দেশে ঘৃতের বিকারের সঙ্গে যকৃতের বিকার দেখা দিয়েছে—এ ধরণের কথা আমাদের স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রবন্ধে কক্ষনো পাবেন না। বাঙলা দেশে বহুপ্রচারিত কোন একটি ঘি-ব্যবসায়ের বিজ্ঞাপনেই পাবেন, কারণ সে বিজ্ঞাপনের ভাষাটা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের লেখা। সে ঘি আপনারা সবাই খেয়েছেন, আমিও খেয়েছি। সে

ঘির লুচি বাসি হলেও আমি খেযে থাকি। ভেজাল-প্লাবিত বাজারে এই ঘি অমৃত সমান—এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু তাই বলে উক্ত ঘৃত যকৃতের বিকৃতি রোধ করবে, এমন কথা রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট সত্ত্বেও বিশ্বাস করব না। কারণ এ দুর্দিনে যকৃতের বিকৃতি শোধন করা কেবলমাত্র আপন সুকৃতির উপরে নির্ভর করে। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বিজ্ঞাপনে খানিকটা অতিশযোক্তি থাকবেই। কবিদের যেমন poetic license, ব্যবসায়ীদেব অত্যুক্তিটা তেমনি traders' license. কাজল কালিব কালিমা বিদেশী কোনো কালির চাইতে কম নয়। খুব সত্যি কথা। কিন্তু সেই কালিমার সঙ্গে যদি কিছুমাত্র জড়িমা থাকে, তবে কিন্তু কালির কৌলিন্য অবশ্যই নষ্ট হ'বে।

বিলিতি বিজ্ঞাপনের কলাকৌশল দেখে আগে খুব হিংসে হ'ত। সে তুলনায় আমাদের বিজ্ঞাপন ছিল অত্যন্ত স্থূল এবং শ্রীহীন। অর্জুনের গাণ্ডীবের পাশে ভীমের গদার মতো। এখন আর আমার মনে কোনো খেদ নাই। শুক শারীর দ্বন্দ্ব ছিল আমাদের কাব্যের কথা। সুখ এবং শাড়ির দ্বন্দ্ব আমাদের ঘরের কথা, বাস্তব জীবনের কথা। কিন্তু বিজ্ঞাপনী প্রতিভা সুখ-শাড়িকে কাব্যের গৌরব দিয়েছে।

প্রপাগাণ্ডা সম্বন্ধে যত কথা বলব ভেবেছিলাম, এখনও তার কিছুই বলা হযনি; এটা মোটে তার মুখবন্ধ। বারান্তরে বলবার আশা রইলো।

অনুবাদ-সাহিত্য

অনেক দিন পরে সেদিন আমাদের সান্ধ্যমজলিশে সাহিত্যালোচনা বেশ জমেছিল। আগে সাহিত্যটাই ছিল আমাদের মজলিশের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু ইদানীং অর্থাৎ ফার্স্ট ব্যাটল অফ মৌলালির পর থেকে সভ্যদের অনেকেই অত্যন্ত রাজনীতি-প্রবণ হয়ে পড়েছেন। এখন প্রায় প্রতি আসরেই শুধু বঙ্গ-বিচ্ছেদ নয় বঙ্গ দেশের শব ব্যবচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে থাকে। গুপ্ত ঘাতকের ছোরা আর রাজনৈতিক ডাক্তারদের ছুরির আঘাতে বঙ্গ মাতার দেহ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হবার যোগাড় হয়েছে। সুতরাং পূর্ব্বাহ্নেই স্থির করে নিয়েছিলাম এবার আর রাজনীতির প্রসঙ্গ নয়, কারণ আমাদের এই আসরটি হিন্দুস্থানও নয় পাকিস্তানও নয়। স্বধর্ম এবং পরধর্ম দুটোই আমাদের কাছে ভয়াবহ। সাহিত্য জিনিসটার মস্ত সুবিধে—ওর জাত নেই আর সাহিত্যের যেটা ধর্ম সেটা হিন্দুরও নয়, মুসলমানেরও নয়, সেটা সকল মানুষের। আমি তো আগেই বলেছি আমাদের আড্ডাটা একদিক থেকে শ্মশানের মতো—এখানে এলে সকলকে সমান হ'তে হয়।

সাহিত্যে যা কিছু সুন্দর তাতে সকল মানুষের সমান অধিকার এবং সে অধিকার অর্জনের একমাত্র পথ হ'ল অনুবাদের পথ। আমাদের আড্ডাটি ছোট, কিন্তু তাতে একাধিক ভাষাবিদ আছেন। তাঁরা কেউ কেউ ফরাসী জার্মান ইতালিয়ান ভাষার চর্চা করে থাকেন। এঁরা সেদিন কয়েকটি অনুবাদ পাঠ করে শোনালেন, কিছু আমাদের দিশী ভাষা থেকে, কিছু বিদেশী ভাষা থেকে। আমি মাতৃভাষা এবং রাজভাষা ছাড়া আর কোনো ভাষা জানিনে। কাজেই আমি কিছুই

লিখিনি, আমি ছিলাম শ্রোতা। কিন্তু রস উপভোগের বেলায় আমিই ভাগ বসিয়েছিলাম বেশী এবং পাঠান্তে যে আলোচনাটি হয়েছিল তাতে আমিই ছিলাম প্রধান বক্তা।

ইদানীং বাঙলা দেশে অনুবাদ সাহিত্যের দিকে বেশ একটা ঝোঁক এসেছে। দশ বছর আগেও এটা ছিল না।. এর মূলে বাঙালী মনের একটি স্নবারির পরিচয় ছিল। প্রতিষ্ঠাপন্ন লেখকরা অপরের লেখা অনুবাদ করতে নারাজ ছিলেন, পাঠকরাও কন্তিনান্তাল সাহিত্য ইংরেজীর মারফতেই পড়তে ভালবাসতেন। বাঙলা ভাষায় অনুবাদ হলেও সে বই বাজারে চলত না। পাঠকরা ভুলে যেতেন যে তাঁরা যে টলষ্টয়, ডষ্টয়ভস্কি, টুর্গেনিভ, ইবসেন দোঁদে ম্রোঁলা ইত্যাদি পাঠ করেন সেটাও আসল বস্তু নয়, নকল বস্তু, কেননা সেগুলোও ইংরেজী অনুবাদের মারফতেই পড়ছেন। কেউ যদি বলেন বাঙলার চাইতে ইংরেজিতেই রস উপভোগটা সহজসাধ্য তবে বলব তাঁরা মিথ্যে কথা বলছেন। মায়ের চাইতে মাসির আদরে যারা বেশী বিশ্বাস করে তাদের কেউ বুদ্ধিমান বলে না।

গত পাঁচ ছয় বছর ধরে বিদেশী সাহিত্য থেকে বাঙলা ভাষায় দেদার অনুবাদ হচ্ছে। এটি সত্যিই খুব সুলক্ষণ। বহু দেশের বহু চিন্তার ধারা এসে না মিশলে সাহিত্য কখনো পরিপুষ্ট হ'তে পারে না। জীবন্ত সাহিত্য মাত্রকেই 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীর' হ'তে হ'বে। যে সাহিত্যে অনুবাদের স্থান নেই সে সাহিত্য বদ্ধ জলাশয়।

সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে শুধু যে অনুবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান হয়েছে এমন নয়, আর একটি প্রধান সুলক্ষণ এই যে, বিশিষ্ট সাহিত্যিকেরা আত্মাভিমান ছেড়ে অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন। এর খানিকটা কৃতিত্ব সিগনেট প্রেসের প্রাপ্য। প্রকাশনা শিল্পে তাঁরা নতুন নতুন দিকে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছেন। ধীরে ধীরে অন্যান্য

প্রকাশকরাও এ দিকে সচেতন হচ্ছেন। সাহিত্য পত্রিকাগুলিও এ বিষয়ে সহায়তা করছেন। অনুবাদের মারফৎ যাঁরা সুসাহিত্য পরিবেশন করতে শুরু করছেন তাঁরা পাঠক সমাজের কৃতজ্ঞতা ভাজন।

অন্যান্য দেশে কেবলমাত্র অনুবাদ করেই বহু লেখক সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। ফিটজারেল্ড ইংরেজ কবি সমাজে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু ওমর খৈয়াম-এর অনুবাদ ছাড়া তিনি এমন কিছু কাব্য রচনা করেননি যার দৌলতে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আসন হ'তে পারত। রুষ সাহিত্য থেকে অনুবাদ করে কনস্টান্স গার্নেট যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আরো দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে আমাদের ঘরের কাছেও দৃষ্টান্তের অভাব নেই। শ্রীযুত কান্তি ঘোষ ওমর খৈয়ামের যে অনুবাদ আমাদের দিয়েছেন তাতে তাঁর কবি খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে বাধ্য।

আমার মতে যিনি সত্যিকারের সাহিত্যিক, অনুবাদে একমাত্র তাঁরই অধিকার। যিনি সাহিত্য ধর্মী তিনিই সাহিত্যের মর্ম বুঝবেন। আনাড়ি লোক অনুবাদ করতে গেলে অনেক সময়ে মূল লেখার চরিত্রহানি ঘটে। মূলকে তাঁরা বিকৃত করে বিকলাঙ্গ করে নির্মূল করেন। একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন—Translation is Treason. ভাষান্তর করতে গিয়ে যাঁরা মূল লেখার রূপান্তর করে ফেলেন তাঁরা রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। এজন্য যিনি অনুবাদের কাজ গ্রহণ করবেন তাঁকে এই গুরুদায়িত্বটি স্মরণ রাখতে হবে যে, কোনো মহামনীষী তাঁর নিভৃত চিন্তাকে যে রূপ দান করেছেন অনুবাদকের হাতে যেন সে রূপের বিকৃতি না ঘটে। আমি নিজেও কিছু অনুবাদ করেছি। রসিক মহলে তার নানা রকম সমালোচনা হয়েচে। কেউ বলেছেন, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি। আবার কেউ বলেছেন যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি নয়। মত-বিরোধ থাকবেই। তবে নিজের

তরফ থেকে একথা আমি বলতে পারি—আমি সেই অনুবাদের কাজকে একটি sacred trust হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম। যে গ্রন্থ আমি অনুবাদ করেছি বারম্বার পাঠান্তে যতক্ষণ না তার মর্মমূলে আমি পৌঁচেছি ততক্ষণ অনুবাদের কাজে আমি হাত দিইনি। আমার দিক থেকে শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠার এতটুকু অভাব হয়নি।

কোন কোন অনুবাদক একেবারে কথায় কথায় অনুবাদ করে মূলের প্রতি নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার নিষ্ঠা বাক্যের প্রতি নয় বক্তব্যের প্রতি। The horse is a noble animal কথাটার বর্ণে বর্ণে অনুবাদ করতে গেলে উক্ত জন্তটার গুণ-গরিমা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় বটে কিন্তু বক্তব্যটার মান থাকে না। এখানে অপর একজন ইংরেজ লেখকের কথা উদ্ধার করছি—

Translation is like the wrong side of an embroidered cloth giving the design without the beauty.

দুঃখের বিষয় কোন কোন লেখকের অনুবাদ পড়ে দেখেছি—ঠিক এমব্রয়ডারির উল্টো পিঠের মতো এবড়ো খেবড়ো। এটাও এক ধরণের বিকৃতি। কারণ অনুবাদের ভাষা বলে আলাদা ভাষা নেই, অনুবাদের ভাষাকেও সাহিত্যের ভাষাই হ'তে হ'বে।

তমাল গাছ

গাছপালা ফুল লতা পাতা সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা বড়ই লজ্জাকর। খুব সাধারণ গাছপালা আমি চিনিনে, যে ফুলের গন্ধ অতি প্রিয় তারও নাম জানিনে। বন্ধুরা এই নিয়ে আমাকে পরিহাস করতে ছাড়েন না। আমিও ছাড়ি না। বলি, আমার প্রকৃতিটা মনুষ্য প্রকৃতি, বন্য প্রকৃতি নয়। স্বভাবটা যদি বুনো হ'ত তবেই গাছপালার খবর রাখা স্বাভাবিক হ'ত। কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়, মানুষকে বাদ দিয়ে আমি গাছপালার রূপ ঠিক বুঝতে পারিনে। যেখানে জনমানব নেই আমার মতে সেখানে প্রকৃতির কোনো রূপ নেই। মানুষ সুন্দর বলেই প্রকৃতি সুন্দর। মানুষ না থাকলে শ্যামা ধরণীও মরুভূমি সদৃশ হ'ত। এই মনোভাবের ফলে প্রকৃতির সঙ্গে আমার যোগ কোনোকালেই তেমন নিবিড় হ'তে পারেনি। প্রকৃতি দেবীর সঙ্গে আমার যা কিছু পরিচয় সবই রবীন্দ্রনাথের গান কবিতার মধ্য দিয়ে —বিশেষ করে গান। পথের পাঁচালী অতি সুখপাঠ্য গ্রন্থ। কিন্তু পথের পাঁচালীর মতো বই আমার মতো লোকের পক্ষে লেখা অসম্ভব হ'ত। কারণ সে বই-এর একমাত্র অপুকেই আমি চিনি। তার চার পাশে যে বনভূমির ভূমিকা তা আমার কাছে একেবারে অজ্ঞাত।

ইদানীং আমি যে স্থানটিতে বাস করছি সেখানকার বৃক্ষবৈচিত্র্য অপূর্ব। ছোট্ট একটু যায়গায় এত বিচিত্র রকমের গাছ কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, এটি বোটানিকেল গার্ডেন নয়। আর এখানকার ফুলের বৈচিত্র্য অধিকতর বিস্ময়কর। প্রতি ঋতুর বিচিত্র ফুল সম্ভার অকস্মাৎ আপন সৌগন্ধে ঋতু পরিবর্তনের বার্তা জানিয়ে দিয়ে যায়। বলতে গেলে এখানে এসেই প্রকৃতি দেবীর

সঙ্গে আমার যা কিছু পরিচয় ঘটল এমন কি সে পরিচয়টি ক্রমে ক্রমে সখ্যেও পরিণত হ'তে পারে।

বৃক্ষলতা সম্বন্ধে আমার সাধারণ ঔদাসীন্য আমি পূর্বাহ্ণেই কবুল করেছি। কিন্তু একটি গাছ সম্বন্ধে বরাবর আমার মনে একটি অসাধারণ কৌতুহল ছিল, আজ পর্যন্তও সে কৌতুহল নিবৃত্তি হয়নি। আমি তমাল গাছ কখনো দেখিনি। বাঙলা দেশ বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ। তমাল নামটা শুধু আমার মনে কেন বাঙালী মাত্রেরই মনে এক ধরণের মোহের সঞ্চার করে। বিশেষ করে এমন সুন্দর নাম কোত্থেকে এল ? যিনি দিয়েছেন তিনি নিশ্চয় মহাকবি। রবীন্দ্রনাথ রেবা, শিপ্রা, বেত্রবতী ইত্যাদি নামের প্রশংসা করেছেন। শাল, পিয়াল, শিমুল, তমাল, নামকরণ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

যদিচ ধর্মে আমার মতি নেই, তীর্থভ্রমণে স্পৃহা নেই তথাপি ভেবে রেখেছিলাম, আর কিছু না হোক কেবল তমাল গাছ দেখবার জন্যই একবার বৃন্দাবনধামে আমাকে যেতে হবে। ইতিমধ্যে ভাবছিলুম, 'দেশ' পত্রিকার মারফৎ আমার সহৃদয় পাঠকদের কাছে একটি আবেদন জানাব তাঁরা কেউ নিকটতর কোনো স্থানে তমাল বৃক্ষের অস্তিত্ব সংবাদ দিতে পারেন কিনা। সত্যি সত্যি লিখ' ভাবছি এমন সময়— থাক্ সে কথা পরে বলব।

মানুষের জীবনে অনেক মোহ থাকে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে একটি একটি করে মোহ ঘুচে যায়—আর জীবন নীরস হয়ে আসে। মোহ-ই জীবন, মোহ-মুক্তির নাম মৃত্যু। যেতে যেতে আমার এখন ঐ একটি মোহে এসে ঠেকেছে। অল্প বয়সে মন যখন অতিমাত্রায় সেণ্টিমেণ্টাল ছিল তখন আমার উপন্যাসে নায়কের নাম দিয়েছিলাম তমাল। সেদিন তমাল সম্বন্ধে আমার দুর্বলতা যতখানি ছিল আজও প্রায় ততখানিই আছে।

ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে যত কিছু রম্য বস্তু উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু পাছে জীবনের সব মোহ ঘুচে যায় এজন্য রিজার্ভ তহবিলে রেখেছিলেন ইয়ারো নদীর সুরম্য তীরভূমি। রইল সেটি লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে তোলা দুর্গম সংসারের একমাত্র পাথেয়। পণ করেছিলেন, ইয়ারো নদীর মানস মূর্তিটিকে চাক্ষুষ মূর্তিতে দেখে অমূল্যকে মূল্যহীন করবেন না। মনে সান্ত্বনা থাকবে—এখনও সংসারে রয়েছে দেখবার মত বস্তু। হায়রে মানুষের মন, কিছুতেই কৌতুহল নিবৃত্তি হয় না। অদৃষ্টপূর্ব ইয়ারোকে গিয়েছেন দেখতে। ফল যা হবার তাই হয়েছে, কবি নিরাশ হয়েছেন। Is this Yarrow! প্রথম লাইনেই আর্তকণ্ঠের আভাস।

সেদিন পড়ছিলাম রবার্ট লিণ্ড-এর প্রবন্ধ পুস্তক। তিনিও একটি অনুরূপ মোহের কথা বলেছেন—তাঁর মোহটি মৎসরাঙ্গা নামক পক্ষী সম্বন্ধে। মাছরাঙ্গার রূপ বর্ণনা শুনে উক্ত পাখী দেখবার জন্য তাঁর কৌতুহলের অন্ত ছিল না। হঠাৎ একদিন এক বন্ধু ব্যক্তি এসে বললেন, পথে আসতে আসতে একটি মাছরাঙ্গা পাখী এক্ষণি দেখে এলেন। লিণ্ড অবাক। যে পাখীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় তিনি বহু বৎসর কাটিয়ে দিয়েছেন সেই পাখী তাঁরই গৃহের কয়েক শত গজের মধ্যে নদীতীরে মৎস সন্ধানে ব্যাপৃত। লিণ্ড তৎক্ষণাৎ বন্ধুকে নিয়ে উক্ত পাখীর দর্শন মানসে বেরোলেন। দর্শন পেলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো তিনি নিরাশ হননি। পক্ষীর বর্ণসমারোহে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কবি জনোচিত ভাষায় পাখীটিকে আখ্যা দিয়েছেন—winged rainbow.

আচ্ছা, এবার তবে আমার কথাটা বলি। এই সেদিন বৃক্ষতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের এক বন্ধু আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে জানালেন যে, আমারই গৃহের অনধিক পঞ্চাশ গজের মধ্যে একটি তমাল গাছ অবস্থিত। এত বড় একটা বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত ছিলাম

না। তৎক্ষণাৎ আমার এতকালের মানসমূর্তিটিকে দেখতে গেলুম। কি বলব আপনাদের, ওয়ার্ডসওয়ার্থও এত বড় আঘাত পাননি। তমাল গাছ এই! এত সাধারণ দেখতে! পাশের গাব গাছটি যে এর চাইতে শতগুণে দেখতে ভালো। লালচে কচি পাতাগুলো সোনার ঝালরের মতো ঝুলছে। আর কি কুৎসিত মূর্তি ঐ তমাল গাছের। শ্রীরাধা তমাল দেখে কৃষ্ণ বলে ভ্রম করতেন। মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালেরই ডালে। বাবাঃ আমি শ্রীরাধা নই, কিন্তু আমার রসবোধ শ্রীরাধার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। সুতরাং বন্ধু-বান্ধবকে বলে রাখছি, আমি মরলে অন্ততঃ তমাল কাঠ দিয়ে আমাকে যেন পোড়ানো না হয়। তমাল দর্শন করে লাভের মধ্যে মনে হচ্ছে একটি মহামূল্য সম্পদ হারিয়ে ফেলেছি। মিছিমিছি সেন্টিমেণ্টাল হ'তে গিয়ে বোকা বনেছি। আসল কথা, বৃন্দাবনে তমাল বৃক্ষের আধিক্য সেজন্যেই ওটা বৈষ্ণব কাব্যে অতখানি স্থান পেয়েছে। সেখানে যদি প্রচুর পরিমাণে গাব কিংবা তেঁতুল গাছ থাকত তবে গাব তেঁতুলই বৈষ্ণব কাব্যে আসন পেত। কিন্তু যতই বলি, মনটা একবার ধাক্কা খেলে সহজে সামলে উঠতে পারে না। তমালের তামাসাটা কিছুতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছিলাম না। আমাদের এখানে একজন বৃক্ষতত্ত্ববিদ্ আছেন। একদিন তাঁর কাছে কথাটা পাড়লুম। তিনি অবাক হয়ে বললেন, বলেন কি, এখানে তমাল গাছ আছে ব'লে তো জানিনে! আমি ততোধিক বিস্মিত। তবে যে—। উনি বললেন, আচ্ছা। চলুন দেখেই আসি। আমার গৃহসংলগ্ন বৃন্দাবনধামে তাঁকে নিয়ে এলুম। বৃক্ষটি দেখেই তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন—আপনিও যেমন, এটা তো কামরাঙ্গা গাছ। কামরাঙ্গা! এ্যাঁ; ফলের মধ্যে নিকৃষ্টতম ফল। সেই বৃক্ষকে কিনা তমাল্ বলে বর্ণনা। এত বড় ভুল! কি করে সম্ভব? না ইচ্ছাকৃত পরিহাস। ভেবে ভেবে সম্প্রতি এর

একটা কিনারা করেছি। তমাল নামটা রোমান্টিক, কামরাঙ্গা নামটা ততোধিক রোমান্টিক। তমালের রোমান্টিসিজম্ রাধাকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়নে; আর কামরাঙ্গার মহিমা শব্দ এবং অর্থের সংপৃক্তিতে।

জনৈকা পাঠিকার প্রতি

সম্প্রতি জনৈকা পাঠিকা 'দেশ' সম্পাদকের নিকট যে চিঠি লিখেছেন সম্পাদক মশায় সেটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সম্পাদক মশায়ের নামে চিঠি সুতরাং জবাব দেবার দায়িত্ব তাঁরই। তথাপি তিনি যখন চিঠিখানা আমার কাছে পাঠিয়েছেন তখন আমাকে যথাকর্তব্য 'খাতা'র মারফতেই করতে হচ্ছে। প্রথমেই 'জনৈকা পাঠিকা'র প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আবশ্যক। কারণ, উক্ত চিঠিতে তিনি ইন্দ্রজিতের খাতার অজস্র প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, ইন্দ্রজিতের লেখা পড়ে তিনি প্রচুর আনন্দ পাচ্ছেন। আমার খাতা তাঁকে মনের খোরাক যোগাচ্ছে, বিশেষ কি, এর থেকে তিনি সত্যের সন্ধান পাচ্ছেন। এর চাইতে বড় প্রশংসা কেউ আশা করতে পারে না। আমার খাতার মুখবন্ধেই আমি বলে নিয়েছি যে আমি অতিশয় প্রশংসালোভী মানুষ। পরের মুখে নিজের গুণকীর্তন শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে। দুঃখের বিষয় প্রশংসাকাতর বাঙলাদেশে ঐ জিনিসটি বড়ই দুর্লভ। সামান্য মুখের কথা খরচা করেও কেউ কাউরে প্রশংসা করতে চায় না। এহেন বাঙলা দেশে জনৈকা পাঠিকার কাছ থেকে এতাদৃশ প্রশংসা লাভ করে আমি কিরূপ গর্বিত এবং অহংকৃত বোধ করছি তা আপনারা অনুমান করতে পারেন।

কেবলমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেই যদি লেখিকার পত্রের জবাব হয়ে যেত তবে কোনো মুস্কিলই ছিল না। কিন্তু 'জনৈকা পাঠিকা' যথারীতি গুণগান করবার পরে সম্পাদকের কাছে ইন্দ্রজিতের পরিচয়টি জানতে চেয়েছেন—"এই অজ্ঞাত লেখকের নামটি জানিতে বড়ই ইচ্ছা করে। আশা করি নাম প্রকাশে লেখকের নিজের কোন আপত্তি নাই।" এখানে বলা প্রয়োজন যে 'জনৈকা পাঠিকা' কিন্তু নিজের নামটি আমাদের জানান নি। যাহোক, ছদ্মনামা লেখকের নাম প্রকাশ সম্বন্ধে জার্নালিষ্টিক রীতিনীতি আমার জানা নেই। সে সব সম্পাদক মশায়ের জানবার কথা। আমি শুধু গান্ধীজীর ভাষায় বলতে পারি—I am my editor's prisoner কিংবা আপনারা চান তো রেশিও রক্ষা করে জিন্না সাহেবের মতো বলব—I am entirely in the editor's hands.

কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি একদিক থেকে পত্র লেখিকা আমাকে নিরাশ করেছেন। আমি ভাবছিলাম যিনি আমার লেখার অত প্রশংসা করেছেন তিনি তো আমার লেখার মধ্যেই আমার পরিচয় পেয়েছেন। আমি গোড়াতেই বলে নিয়েছিলাম—ছদ্মনামের আড়ালে আমার আসল রূপটা ক্রমশ প্রকাশ্য। খাতার পাতায় আমি বরাবর সেই আত্মপ্রকাশের চেষ্টাই করছি। পরিচয় বলতে আমি বুঝি—ব্যক্তিত্বের পরিচয়। দোষে গুণে মিলিয়ে—যে গোটা মানুষটা ইন্দ্রজিৎ নাম ধারণ করেছে সে নিজেকে গোপন করবার কোনই চেষ্টা করে নি। তার সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বটিকে খুব স্পষ্ট করেই খাতার পাতায় তুলে ধরেছে। এখন জানতে যা বাকী আছে সেটা কেবলমাত্র পিতামাতার দেওয়া অন্নপ্রাশনের নামটি। কিন্তু সেই নামটা কি একটা পরিচয়?

বলেছি তো দোষ গুণ মিলিয়ে মানুষের আসল পরিচয়। অবশ্য আর সবার মতো আমার দোষগুলিও আমি যথাসম্ভব ঢেকে রাখবার

চেষ্টা করেছি। কিন্তু বুদ্ধির দোষে তার সবই প্রায় ফাঁস হয়ে গেছে। অপর পক্ষে আমার যৎসামান্য গুণাবলী যা আছে তা গোপন করবার কোনই চেষ্টা করিনি। বরং বারম্বার সেগুলি উল্লেখ করেছি। এই ধরুন আমার সর্বপ্রধান গুণ হচ্ছে—আমি ধার্মিক ব্যক্তি নই। এখন আমার নাম যদি হ'ত ধর্মদাস তবে সেটা কি আমার যথার্থ পরিচয় হ'ত ? আপনারা এও জানেন যে আমি পণ্ডিত ব্যক্তি নই অথচ আমার নাম যদি হয় বিদ্যাধর ভট্টাচার্য তবে সেটাও কি মিথ্যা পরিচয় হ'ত না ? এ ছাড়া আমার আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ আছে—আমি পারতপক্ষে সত্য কথা বলি না। এহেন ব্যক্তির নাম সত্যভূষণ হ'লে সেটাও সত্যের অপলাপই হয়। তা'হলেই দেখছেন নাম সম্বন্ধে শেষ কথা সেক্সপিয়রই বলে গেছেন—what's in a name ? এইতো দেখুন না 'জনৈকা পাঠিকা' তার নাম দেন নি ; কিন্তু তাতে তো কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি যে আমার একজন রসগ্রাহী পাঠিকা তাতেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। নিশ্চয় কোথাও আমাদের চিন্তার কিংবা দৃষ্টিভঙ্গির মিল রয়েছে নইলে ইন্দ্রজিতের লেখা তাঁর কাছে ভালো লাগবে কেন ? সুতরাং তাঁর নাম জানবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল আমার মনে নেই। তাঁকে না দেখেও নাম না জেনেও আমি তাঁকে আমার বন্ধুমহলের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি।

পত্রে লেখিকা আরো বলেছেন যে তাঁর মতো অনেক পাঠক পাঠিকা নিশ্চয় ইন্দ্রজিতের নাম এবং পরিচয় জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে আছেন। এ বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত নই। তা হলে এখানে আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাটা বলি। আমার একজন প্রতিবেশী আমার কাছ থেকে 'দেশ' পত্রিকা নিয়ে নিয়মিত পড়তে থাকেন। তাঁর সঙ্গে নানা লেখা সম্বন্ধে আলোচনাও হয়েছে, কিন্তু ইন্দ্রজিতের খাতা নিয়ে কোনদিন কিছুমাত্র কৌতূহল তিনি প্রকাশ করেন

নি। ঐ খাতা কে লিখচেন কথনও জিজ্ঞেস করেন নি। হয় তিনি ও জিনিসটা পড়েন না, কিংবা পড়লেও ওঁর ভালো লাগে না। অপর এক ভদ্রলোক কি করে জানতে পেরেছেন যে জিনিসটা আমারই লেখা। এই সেদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল জিজ্ঞেস করলেন, এই যে, আপনার ইন্দ্রজিতের খাতা এখনও চলচে তো? তা হলেই দেখচেন উনি বোধ হয় কোনোদিন 'দেশ' এর পাতা উল্টেও দেখেন না।

যাক্ আজকে যখন নামের কথাই উঠল তখন এ সম্পর্কে আরো দু'একটা কথা বলি। পিতামাতা আমাকে যে নামটা দিয়েছেন সে নামে বাঙলাদেশে একজন অতি বিখ্যাত ব্যক্তি আমার পূর্বেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শুধু নামের প্রথমার্ধ নয় একেবারে পদবী সমেত তাঁর সঙ্গে আমার নামের হুবহু মিল আছে। বিখ্যাত ব্যক্তির নামানুসারে নাম রাখা অত্যন্ত ভুল। কারণ ঐ নামের সঙ্গে যা কিছু খ্যাতি প্রতিষ্ঠা সমস্তই তাঁরই কবলিকৃত। তিনি একাধারে পণ্ডিত, সাহিত্যিক এবং দার্শনিক। আমি এই তিন-এর একটাও নই। আমি যে অকৃতী এবং অধম সেটা ঐ নামের দরুণই আরো বেশী করে প্রকট হয়ে উঠেছে। তিনি অদ্বিতীয়, আমি দ্বিতীয়। অদ্বিতীয়ের কাছে দ্বিতীয়ের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তাঁর খ্যাতি আমার খ্যাতির পথরোধ করেছে। আমার জীবনে চিরকাল এই দুঃখটি থেকে যাবে যে আমি স্বনামধন্য নই, পরনামধন্য। সেটা একরকমের কলঙ্কই বলা যায়। চন্দ্রের নিজের আলো নেই, সূর্যের আলোতে শোভা পায়। চাঁদের কলঙ্ক বলে একটা কথা আছে। বৈজ্ঞানিকেরা তার যে ব্যাখ্যাই করুন না কেন চাঁদের যে নিজস্ব আলো নেই সেটাই তার সবচেয়ে বড় কলঙ্ক। আমারও হয়েছে সেই দশা। আমার একখানা ক্ষুদ্র উপন্যাস যখন প্রথমে বের হ'ল তখন অনেকে অবাক হয়ে বলেছিলেন, একি!

উনি আবার উপন্যাস লিখতে শুরু করলেন কবে? উনি তো বেদবেদান্ত গীতার ভাষ্য লিখতেন, জানি।

যাক, আত্মপরিচয়ের কাহিনীটা এখানেই শেষ. করি। অনেক সুস্পষ্ট ইংগিত আছে। তথাপি জানিনা পাঠক পাঠিকারা এটাকে অন্নদার আত্মপরিচয়ের মতো হেঁয়ালি মনে করবেন কিনা।

আমাদের পলিটিক্স

গোড়াতেই বলে রাখছি এবার আমি ভয়ানক গম্ভীর কথা বলব। আমি সাধারণত যে সব কথা বলে থাকি সে সব কথা গম্ভীর নয় এমন অবশ্যই বলা চলে না। অথচ সেদিন আমার একজন বন্ধু বললেন, Serio-comic লেখা হিসেবে এগুলো চমৎকার হচ্ছে। দেখুন তো, আমি আবার কমিক কথা কখন বললাম! ও জিনিসটা আমার স্বভাবেই নেই। আমি কথা বলে লোক হাসাতে প্রস্তুত নই। একথা অবশ্য স্বীকার করব যে আমি অনেক গম্ভীর কথা হাল্কা সুরে বলেছি, কিন্তু তাতে যদি কথার ওজন কমে গিয়ে থাকে তবে সেটা আমারই দুর্ভাগ্য বলতে হবে। স্থির করেছি এবারে অন্ততঃ গভীর কথা গভীর সুরেই বলব; তার কারণ এবার আমি রাজনীতি আলোচনা করব। আপনারা গোড়াতেই বলবেন রাজনীতিটা আবার গম্ভীর ব্যাপার হ'ল কবে থেকে! রাজনীতি নিয়েই তো দেশে যত ছেলেখেলা চলচে! সেটা খুবই সত্যি কথা। রাজনীতিকে যত লঘু করে তুলবেন তার ফল তত গুরুতর হবে। রাজনীতি নিয়ে যাঁরা ছেলেখেলা করেন তাঁরাই প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহী। দেখা গেছে, কোনো রকম নীতির যে'ার

ধারে না সেই রাজনীতিতে হাত পাকায়। Politics is the last resort of a scoundrel—একথা যিনি বলেছিলেন তিনি নিশ্চয় সর্বদর্শী ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ ছিলেন।

অযথা বাগবিস্তার না করে আমার বক্তব্যটি এখন আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। আর ঠিক এক বৎসর পরে ইংরেজ এদেশের শাসন-ভার দেশবাসীর হাতে অর্পণ করবে। প্রশ্ন উঠেছে কার হাতে শাসন ক্ষমতা দেবে। প্রশ্ন উঠবার কথাই নয়। স্বাধীনতার পুরস্কার তাদেরই প্রাপ্য যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, প্রাণপাত করেছে, স্বার্থত্যাগ করেছে, অশেষ দুঃখ বরণ করেছে,—এক কথায় স্বাধীনতার মূল্য যারা দিয়েছে। কিন্তু ইংরেজ বহু পূর্ব থেকেই তার মোক্ষম চাল চেলে রেখেছে, নিজে থেকেই ঐ প্রশ্ন তুলেছে। জানে, বহু ভাগীদার, বহু দাবীদার জুটে যাবে। সব চেয়ে যে নিশ্চেষ্ট, স্বাধীনতার যুদ্ধে যার contribution—nil তারই সব চেয়ে বড় গলায় দাবা। এ দাবীটা প্রকারান্তরে ইংরেজেরই। এক দোর দিয়ে বেরিয়ে ও আরেক দোর দিয়ে ঢুকতে চায়। স্বভাব যাবে কোথায়? চৌর্যবৃত্তি ওর অস্থি মজ্জায়। একদা ক্লাইভ মির্জাফরের গোপন ষড়যন্ত্রে যে সাম্রাজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল, মুসলিম লীগ আর ক্লাইভ ষ্ট্রীটের ষড়যন্ত্রে সেই সাম্রাজ্যের ভগ্নাবশেষ আগলাবার চেষ্টা হচ্ছে। কত বড় বৃথা চেষ্টা ইংরেজ যদি বুঝত তবে এমন নির্লজ্জভাবে আপন স্বরূপকে সর্বসমক্ষে উদ্ঘাটিত করত না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন স্বয়ং বিধাতাও রোধ করতে পারেন না; চার্চিল তো কোন ছার। বিধাতার বিধানের চাইতেও বড়—ইতিহাসের অমোঘ বিধান। ইতিহাসের অভ্রান্ত লিখন আজ আকাশে বাতাসে। পৃথিবীতে নূতন যুগ আসচে। চারশো বছর আগে পৃথিবীতে আরেকবার এসেছিল নব চেতনা—Fall of Constantinople থেকে তার শুরু। আজকে আবার হয়েছে নতুন

যুগের সূচনা। তার শুরু—Fall of the British Empire থেকে। বলতে গেলে এত বড় যুগ পৃথিবীতে ইতিপূর্বে আসে নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তম বর্বরতার অবসান হবে।

ইংরেজের দিক থেকে তার সাম্রাজ্যের পতনের চাইতে বেশি শোকাবহ ঘটনা ইংরেজ চরিত্রের অধঃপতন। মনুষ্যত্বের বিচারে ইংরেজের এতোখানি পতন ইতিপূর্বে হয়নি। মেকলে সাহেব বাঙালীর প্রতি আক্রোশবশত একদা যে ভাষা ব্যবহার করেছিলেন সেই সব দোষ—bribery, jobbery, chicanery ইত্যাদি ভারতবর্ষস্থিত ইংরেজ চরিত্রকে যেমন কলঙ্কিত করেছে এমন আর কাউকে নয়। শাসক-শ্রেণীর অধঃপতনে শাসিতের অধঃপতন অনিবার্য্য। দেশের চতুর্দিকে তার দুঃসহ প্রমাণ বিস্তৃত। ভারতভূমিকে সে শ্মশানভূমিতে পরিণত করে যাচ্ছে। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই সেই শ্মশান দৃশ্যের বর্ণনা করা চলে—একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্ক শয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। কোন ভারতবর্ষকে সে পেছনে ত্যাগ করে যাচ্ছে, কী লক্ষীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে ?

তা ছাড়া সর্বনাশে সমুৎপন্নে বুদ্ধিনাশ হ'তে বাধ্য। ভারতবর্ষের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা না করলে ইংরেজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। একথা ইংরেজ ভালো করেই জানে, মুখে বলেও। সুতরাং বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হ'লে তাদের সঙ্গেই করতে হ'বে, যাদের সে আপন ব্যবহারে বৈরী করে তুলেছিল। কিন্তু নিতান্ত নির্বোধের মতো ইংরেজ সখ্য স্থাপন কর্চ্ছে এক নগণ্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। দেশের বৃহত্তম অংশের বন্ধুতাকে সে উপেক্ষা কর্চ্ছে। যোগ্যের চাইতে অযোগ্যের প্রীতিই তার স্বাভাবিক প্রবণতা। এর ফল বিষময় হ'তে বাধ্য। পাকিস্তান ইংরেজ বাণিজ্যের গোরস্থান হবে।

মুসলিম সমাজের প্রতিও আমার একটি নিবেদন আছে। শতাধিক বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে পাশ্চাত্যশিক্ষা সংস্কৃতির যে ঢেউ এসেছিল মুসলমান সমাজ সেদিন তাকে স্বীকার করেনি, যুগের সঙ্গে পা ফেলে চলেনি। সে জন্য আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় অন্তত পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়েছিলেন। ফলে কেবলি বলেছেন তাঁরা suppressed, depressed ইত্যাদি। নিজেদের কর্মফলেই এই দুর্ভোগ হয়েছে। আজকে ইতিহাসের আর এক অধ্যায় শুরু হচ্ছে। এবারও মুসলমান সমাজ সেই ভুলটিই করছেন। বাইরের জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে পাকিস্তানের দেয়ালের মধ্যে নিজেই নিজেকে একঘরে করে রাখছেন। ইতিহাসের সমস্ত শিক্ষাকে তাঁরা অস্বীকার করছেন। কিন্তু History takes ruthless revenge on those who ignore the lessons of history. মুসলীম লীগ মুসলমান সমাজকে আবার পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

আমার শেষ নিবেদন কংগ্রেসের নিকট। গত ষাট বছর ধরে কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য অবিরাম সংগ্রাম করেছে। আজ জয়ের পুরস্কার হাতের কাছে এসেছে। শুধু হাত বাড়িয়ে নেবার অপেক্ষা। কিন্তু একাধিক হাত এগিয়ে এসেছে। স্বাধীনতা জিনিসটা একটা সম্পূর্ণ জিনিস। ওকে ভাগ ভাগ করে বিলিয়ে দিতে গেলে সেটা আর স্বাধীনতা থাকে না। খণ্ডিত বিভক্ত স্বাধীনতার নামই পরাধীনতা। নইলে ইংরেজের আমলেও কি কিছু কিছু স্বাধীনতা আমরা ভোগ করিনি? কিন্তু সবটা মিলিয়ে ওটা পরাধীনতা বই আর কি?

যাহোক স্বাধীনতা যখন হাতের নাগালের মধ্যে তখন বলতে হবে কংগ্রেসের ষাট বছরের সাধনা পূর্ণ হয়েছে, কংগ্রেসের কর্তব্য সমাপ্ত হয়েছে। এখন সমস্ত ভারতবাসীকে আহ্বান করে কংগ্রেস নেতারা —কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে dissolve করে দিন। ছোট বড় মাঝারি

সমস্ত দলকে তাঁরা আহ্বান করুন—কেউ বাদ থাকবে না—মুসলিম লীগ, হিন্দু-মহাসভা, আকালী শিখ, জামিয়াৎ, মজলিশি আরহার, মমিন, খাকসার, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোস্যালিষ্ট, কমিউনিষ্ট, সকলে নিজ নিজ দল dissolve করে এক যায়গায় মিলিত হোক, সকলে মিলে একটিমাত্র পার্টি গঠিত হোক—Indian People's Party। জানি মুসলিম লীগ সে আহ্বানে সাড়া দেবে না। লীগ 'না' ছাড়া 'হাঁ' আজ পর্যন্ত কোন ব্যাপারেই বলেনি। লীগ না আসে না আসুক। যে isolated হয়ে থাকবে তাকে স্বভাবতঃই encircled হ'তে হ'বে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অন্যান্য সব দল থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে। এঁদের সকলের মিলিত দাবীকে রোধ করবার শক্তি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নাই। এই মিলিত দলের হাতেই শাসন-ভার অর্পণ করতে হ'বে। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণও অনুরূপ কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি চান ক্ষমতা হস্তান্তরের পরে ১৯৪৮-এর জুনে কংগ্রেস নিজ প্রতিষ্ঠানকে dissolve করুক। আমরা বলি ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ সহজ এবং কণ্টকমুক্ত করবার জন্য ১৯৪৭ এর জুনেই কংগ্রেস নিজেকে dissolve করুক।

পঁচিশে বৈশাখ

চির নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

চারিদিকে যা অট্টকলরোল, ভয় হয় বুঝিবা এবার পঁচিশে বৈশাখের ডাক বাঙলাদেশ শুনতে পাবে না। মারণলীলার তাণ্ডবে জীবনের জয়গান হয়ত কাণে এসে পৌছবে না। সত্যি যদি না পৌছে তবে বুঝতে হবে বাঙলা দেশ যথার্থই মরেছে। ভেদ বিভেদ কলহ সমস্ত ভুলে সমগ্র বঙ্গদেশ অন্তত আজকের দিনটিতে নত মস্তকে পঁচিশে বৈশাখকে স্মরণ করুক। অন্তত একটি দিনের জন্য—সকল বাক্য সকল শব্দ হউক স্তব্ধ।

যে দেশে মৃত্যু অতি সুলভ সে দেশে জীবনও সুলভ। এহেন দেশের লোক মহামানবের জন্ম মুহূর্তকে কখনো যথার্থ মূল্য দিতে শেখে না। প্রতিদিনের অসংখ্য জন্ম মৃত্যুর মতো সেটাকে সাধারণ ঘটনা বলে গ্রহণ করে। জানে ন: যে মহামানবের আবির্ভাব একটা অতি প্রাকৃতিক phenomenon. যে ব্যক্তির আগমনে তাঁর সমকালীন পৃথিবী তোলপাড় হ'তে বাধ্য, তাঁর জন্ম মুহূর্ত পূর্বাহ্নে কোনো প্রাকৃতিক fanfare-এর দ্বারা ঘোষিত হ'লে তবেই বোধহয় সাধারণ মানুষের চৈতন্যোদয় হ'তে পারে—যিশু খৃষ্টের জন্ম মুহূর্তে যেমন আকাশে নতুন নক্ষত্রোদয়ের কিম্বদন্তী আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে যে ভাষায় মহামানবের আগমন ঘোষণা করেছেন তার মধ্যে আমি যে phenomenon-এর কথা বলেছি তার আভাস আছে—দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে, মর্ত-ধূলির ঘাসে ঘাসে। শুধু মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে নয়, ছ'কোটি বাঙালীর দেহে মনে সেই রোমাঞ্চ লাগুক।

অপরের কথা জানিনে। আমি বাঙালী, রবীন্দ্রযুগের বাঙালী, পঁচিশে বৈশাখের রোমাঞ্চ আমার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত। বর্ষে বর্ষে সেই চির নূতনের ডাক আমার মনে যে রোমাঞ্চ জাগায় আমার পাঠক পাঠিকাদের কাছে সে কথাটি প্রাণ খুলে বলতে না পারলে মনে শান্তি পাইনে।

রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের জন্য কি করেছেন, বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীর গৌরব কতখানি বৃদ্ধি করেছেন এবং দেশকালের ভূমিকা পার হয়ে তাঁর বাণী ভবিষ্যৎ মানবকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করবে সে সব তত্ত্বের আলোচনা পণ্ডিতেরা করবেন। আমি তার ধার দিয়েও যাব না। কারণ আমার এ লেখা ইস্কুলপাঠ্য পুস্তকে ছাপা হবার আশা রাখি না। আমি শুধু আমার নিজের কথাই বলতে পারি এবং সে কথা বলতে গেলে চল্লিশ বছরের উজান ঠেলে আমার জীবনের প্রত্যূষ মুহূর্তে গিয়ে পৌছতে হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমার জন্ম। আন্দোলনের বন্যা যখন কূল ছাপিয়ে বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে আমি তখন নিতান্ত শিশু। আমাদের পরিবারে সেই আন্দোলনের ঢেউ প্রবল বেগে প্রবেশ করেছিল। পিতা ছিলেন উৎসাহী কর্মী। রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশী উন্মাদনা সঙ্গীতে বাঙালী অন্তঃপুর তখন মুখরিত। সেই গান গেয়ে আমাকে ঘুম পাড়ানো হ'ত। অবশ্য সেগুলো ঘুমপাড়ানি গান নয় বরং ঘুম-ভাঙানি গান। নিশ্চয় ঐ গান শুনেই আবার আমার ঘুম ভাঙত। বাঙলা দেশের সেই নব-অভিজ্ঞানের ইতিহাস আমার শিশু মনকে রঞ্জিত করেছিল। প্রথম আন্দোলনের ঢেউ ক্রমে স্তিমিত হয়ে এলেও বহুকাল পর্যন্ত তার স্রোত আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। আমার পিতা দেবধর্ম মানেন না। কিন্তু মনে আছে বালক বয়সে আমার ভাই-বোনেরা মিলে সকাল সন্ধ্যায় একটি

প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করতাম। সে মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লেখা নয়, লেখা রবীন্দ্রনাথের বাঙলা ভাষায়—বাঙলার মাটি, বাঙলার জল ইত্যাদি। বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান। (আজকের দিনে এই প্রার্থনা বাক্য আরো বেশি সত্য হয়ে উঠেছে, যাঁরা খাঁটি নির্জলা সত্যিকারের বাঙালী তারা যথার্থই এক হবে। আর যারা মেকি বাঙালী, যারা নিজেদের ভিন্ন জাতীয় বলে মনে করে তারা আলাদা হয়ে যাক্, তাতে বাঙালীর কল্যাণ হবে।) যাক্ যে কথা বলছিলাম। তখনও আমার শিশু মনে রবীন্দ্রনাথের ছবি অস্পষ্ট। কিন্তু সেদিনের কথা ভুলব না যেদিন প্রথম পড়েছিলাম— নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ। বালক মনের সে কি বিস্ময়! চ্যাপম্যান্-এর হোমার পড়ে কীটস্ এর যে বিস্ময় একমাত্র তারই সঙ্গে এর তুলনা হ'তে পারে। এ কি আশ্চর্য্য কবিতা—এর প্রতি কথা, প্রতি ছত্র যে আমারই মনের কথা। এ কবিতাটা নিতান্ত আমারই লেখা উচিত ছিল। বেশ মনে আছে মনে মনে বিষম ক্রোধ হয়েছিল। আমি নেহাৎ বয়সে ছোট, তারই সুবিধে নিয়ে ভদ্রলোক কিনা আমার মনের কথা সব আগে ভাগেই বলে বসে আছেন। এ যে বিষম জবরদস্তি। নির্বোধ বালকের ক্রোধ শান্ত হতে অনেক দিন লেগেছিল। কিন্তু রাগের পশ্চাতে আরেকটা রাগ থাকে, তাকে বলে অনুরাগ। যিনি আমাদের অন্তরের কথা জানেন তাঁকে আমরা বলি অন্তর্যামী। সেদিন আমি তাঁকে অন্তর্যামীর আসনে বসিয়েছি। সেজন্যই তো বলেছি পঁচিশে বৈশাখের ডাক আমার রক্তের মধ্যে সঞ্চারিত। এমন একান্ত আপনার মানুষ বলে আর কাউকে জানিনি। কারণ তিনি আমার ঘুমপাড়ানি গানের সঙ্গে জড়িত, আমার শিশু মনের প্রার্থনা তাঁর ভাষায় উচ্চারিত, আমার কৈশোর স্বপ্ন তাঁর কাব্যে রূপান্তরিত।

মনে আছে কলেজে যখন পড়তুম তখন সহপাঠী এক বন্ধু একদা জিগগেস করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় দান' কি বলত? যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তির এমন প্রশ্নে থতমত খেয়ে যাবার কথা। কিন্তু তখন বয়স অল্প। কোনো প্রশ্নকেই ভয় করি না এবং জবাব দিতেও বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। তৎক্ষণাৎ বল্লুম, এই মৃত-যৌবন দেশে রবীন্দ্রনাথ যৌবন এনে দিয়েছেন। সেদিন এই জবাবটির মধ্যে জ্ঞান-বুদ্ধির চাইতে প্রগলভতাই ছিল বেশী। আজকে চল্লিশ উত্তীর্ণ করে দিয়ে সেই প্রগলভতা অনেক পরিমাণে স্তিমিত হয়ে এসেছে। কিন্তু আজও যদি কেউ ঐ প্রশ্ন জিগগেস করে তবে বিনা দ্বিধায় ঐ একই জবাব দেব। কারণ এখন মনে প্রাণে সেই সত্যকে অনুভব করেছি। যে দেশের লোক কথায় কথায় বলে মরলেই বাঁচি সেই অর্ধমৃত দেশে রূপে রসে গন্ধে বৈচিত্র্যে জীবনকে মনোহর করে তিনিই প্রথম দেখিয়েছেন। জীবনের পাত্র পূর্ণ করে তিনি অমৃত বিতরণ করেছেন, আমরা অঞ্জলি ভরে পান করেছি। গত অর্ধশতাব্দী কাল ধরে বাঙালীর যে প্রাণশক্তি দিকে দিকে স্ফুরিত হয়েছিল তার প্রধান উৎস রবীন্দ্রকাব্য নির্ঝর। ঐ দেখুন, বাঙালীকে তিনি কি দিয়েছেন সে কথা বলবার কথাই ছিল না। আমি কি পেয়েছি সে কথা বলবার জন্যই আজকের লেখা। সেই কথাটি বলে শেষ করি। কিন্তু অক্ষম আমার লেখনী। সে কথাটি রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলতে হবে—

—হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দন ভূমি
অমৃত আলয়ে। সেথা আমি জ্যোতিষ্মান
অক্ষয়-যৌবন-ময় দেবতা সমান
সেথা মোর লাবণ্যের নাহি পরিসীমা।

শয়ন বিলাস

আমি যে অত্যন্ত কুঁড়ে মানুষ, সেকথা আমার বন্ধুমহলে সুবিদিত। বলা বাহুল্য আমার বন্ধুরাও অধিকাংশই কুঁড়ে মানুষ। কেননা তাঁরা যদি সবাই করিৎকর্মা লোক হ'তেন, তবে তাঁদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হতে পারত না। আমাদের মজলিশে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা যেভাবে আড্ডা দিয়ে থাকি, তা দেখলে যে কোন ব্যক্তি মনে করবেন, এদের খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই। এমন কি leisured classএর লোক মনে করে সর্বহারাদের patronরা মনে মনে আমাদের গালও দিতে পারেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, আমার এহেন বন্ধুরাও বলেন আমার মতো কুঁড়ে মানুষ নাকি তাঁরা কখনও দেখেন নি। তাঁরা যখন আমাকে কুঁড়ের বাদশা বলে ডাকেন, তখন কিন্তু আমি রাগ করি না, এমন কি ওটাকে একটা অপবাদ বলেও মনে করি না।

কিছুদিন আগে একটি ছোট প্রবন্ধে আমি কুঁড়েমির গুণকীর্তন করেছিলাম। তাতে বহু যুক্তি প্রমাণ দিয়ে আমি বোঝাবার চেষ্টা করেছি যে, কুঁড়েমির অভ্যাসটা দোষাবহ তো নয়ই বরং মানুষের একটি অতি মহৎ গুণ। জানি না আমার পাঠকরা সে সব যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন কি না। বাস্তবিক পক্ষে আমার মতে নিষ্কাম ব্যক্তি এবং নিষ্কর্মা ব্যক্তিতে কোন তফাৎ নেই। উভয়েই উচ্চস্তরের জীব। বহু কামনা বাসনা ত্যাগ করলে তবেই মানুষ নিষ্কর্মা হতে পারে।

আপনারা অনেকেই হয়ত স্বীকার করতে চাইবেন না, কিন্তু আমি ভেবে দেখেছি বাঙালীকে কুঁড়েমী জিনিসটাতে যেমন মানায় এমন আর কিছুতে নয়। Dying in harness ইংরেজের অতি গর্বের

কথা। কিন্তু বাঙালী কখনো জোয়াল কাঁধে নিয়ে অমন undignified ভাবে মরতে রাজি নয়। জোয়ালটি কাঁধ থেকে নাবিয়ে বিছানায় শোবে, ধীরে ধীরে পিলের আকার বৃদ্ধি হবে, ডাক্তার বদ্যি আসবে, ওষুধ পথ্যিতে ঘর ভরবে, তারপর ধীরে সুস্থে রয়ে-সয়ে শান্তিতে মরবে এবং খাটিয়ায় চড়ে শ্মশানে যাবে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—এই প্রবাদ বাক্যের মধ্যেই বাঙালী, মানুষের আজীবন কর্মব্যস্ততার প্রতি যথাযোগ্য অবজ্ঞা প্রকাশ করে রেখেছে।

বাঙালীর সম্বন্ধে অপবাদ আছে যে, তারা বসতে জানলে উঠতে জানে না। আমি তারও বাড়া—আমি শুতে জানলে বসতে জানিনে। সত্যি বলতে কি, দিনের অধিকাংশ সময় আমি শুয়েই থাকি। তাকিয়া বালিস ঠেসান দিয়ে পূর্ণ কিংবা অর্ধশয়ান হতে না পারলে আমি ঠিক স্বস্তি পাইনে। আজকাল আমাদের আড্ডা স্থলে ফরাস এবং তাকিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সভ্যরা এসেই একেকটি তাকিয়া আশ্রয় করে শুয়ে পড়েন। নতুন কেউ প্রবেশ করলেই সমস্বরে অভ্যর্থনা করেন, এই যে আসুন, আসুন, শুয়ে পড়ুন। আমাদের এ রকম ব্যবস্থা দেখে এক ভদ্রলোক ঠাট্টা করে এর নাম দিয়েছেন—শয্যাশায়ী ক্লাব। আমি তার জবাবে বলেছি, তা ধরাশায়ী হওয়ার চাইতে শয্যাশায়ী হওয়া ভালো। দণ্ডায়মান থাকাটা যে একটা দণ্ড সে কথা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া দণ্ডায়মান ব্যক্তির পতন হওয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি শুয়ে আছে তার অধঃপতনের আশঙ্কা কম। যাই হোক্, আমাদের শয্যাশায়ী বললে কিন্তু ঠিক বলা হয় না। বলা উচিত শয্যাশ্রয়ী কিংবা সত্যাগ্রহীর মতো আমাদের শয্যাগ্রহীও বলা যেতে পারে; কারণ শয্যার প্রতিই আমাদের আগ্রহ।

আমার কাজকর্ম যথাসম্ভব আমি শুয়ে শুয়েই সমাপন করি। টেবিলে চেয়ারে বসে পড়াশুনার কাজ আমার দ্বারা হয় না। লিখতেও

হলে বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়েই লিখি। সেক্রেটারিয়েট টেবিলে বসে আমাকে যদি দশটা পাঁচটা আপিসের কাজ করতে হোতো তাহ'লে আমার দ্বারা একদিনও চাকুরি করা চলত না। আমাদের কংগ্রেসি নেতারা তবু কিঞ্চিৎ তাকিয়া-minded. স্বাধীন ভারতের শাসনবিধি চালু হলে যদি আপিসে আদালতে তাকিয়া-টাকিয়ার ব্যবস্থা হয় তবে অবশ্যই আমি চাকরির দরখাস্ত করব। এ সম্পর্কে একটি কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। ভারত সমস্যা যে আজ পর্যন্ত সমাধান হয়নি তার কারণ গান্ধী-জিন্না আলোচনা প্রতিবারেই জিন্না সাহেবের গৃহে হয়েছে এবং চেয়ারে বসে নেতৃদ্বয় আলাপ আলোচনা করেছেন। আমার নিশ্চিত ধারণা এঁরা দুজনে যদি তাকিয়া ঠেসান দিয়ে অর্ধশয়ান অবস্থায় আলোচনা করতেন তাহলে সমাধান অনেক সহজ হয়ে যেত। কারণ বসে দেখায় আর শুয়ে দেখায় angle of vision অনেকখানি বদলে যায়। চেয়ারে বসে চোখের সুমুখে আমরা যে terrafirma দেখতে পাই সেটাকে অবশ্যই হিন্দুস্থান পাকিস্তানে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু চীৎ হয়ে শুয়ে আমরা যে firmament দেখতে পাই সেখানে হিন্দুস্থান পাকিস্তান নেই। একই আকাশ উভয়ের মাথার উপর। বিধাতা পুরুষ হিন্দু মুসলমান সকলকে under the same roof বাস করবার ইংগিত দিয়ে রেখেছেন।

যাক্‌গে তত্ত্বকথা রেখে দিয়ে সোজা কথাই বলি। আমি সারাক্ষণ শুয়ে থাকি বলে আপনারা মনে করবেন না যে আমি সারাক্ষণ পড়ে পড়ে ঘুমোই। আমি যে ইন্‌সমনিয়ার রোগী সে কথা আপনাদের পূর্বেই বলেছি। রাতজাগার দিক থেকে আমি পৃথিবীর স্বনামখ্যাতদের দলে। নেতাজী রাত্রিতে মাত্র দু তিন ঘণ্টা ঘুমোতেন, হিটলার চার্চিলেরও চোখে ঘুম ছিল না—রাত্রি জেগে ক্যাবিনেট মিটিং

করতেন। এসব খবর একাধিকবার খবরের কাগজে বেরিয়েছে। আমার ওসব বালাই নেই। আমি কাজের কথাও ভাবি না, ঘুমের কথাও না। আমার ঐ শুয়ে থাকাতেই আনন্দ। পাশের জানলাটি খোলা, তারই ভেতর দিয়ে রাস্তার লোক চলাচল দেখি। না হয়ত পাশ ফিরে চোখটি বুজে শুয়ে থাকি। চোখ বুজলেই সব চেয়ে বেশি দেখা যায়, চোখ মেলে সামান্যই দেখি। তা ছাড়া চলমান জগতকে ভালো করে দেখতে হলে নিজেকে নিশ্চল হয়ে থাকতে হয়।

না ঘুমিয়ে মিছিমিছি শুয়ে থাকাটা অনেকে নিতান্ত বিরক্তির ব্যাপার মনে করেন। তাঁরা বলেন শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গোণা ছাড়া অন্য কাজ থাকে না। সেটাও একটা কাজ, কড়িকাঠ গুণতে গুণতে অনেক বড় বড় ভাবনা মাথায় এসে যায়। দুঃখের বিষয়—আজকাল আপনারা যে সব ঘরে বাস করেন তাতে কড়িকাঠ থাকে না। ফলে, বাঙালীর চিন্তাশক্তি ক্রমে হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। চেষ্টারটন বড় মজার কথা বলেছেন—

Lying in bed would be an altogether perfect and supreme experience if only one had a coloured pencil long enough to draw on the ceiling.

চেষ্টারটনের যা বিশাল বপু তাতে তাঁর পক্ষে এপাশ ওপাশ করা কঠিন ছিল। বোধকরি তিনি চীৎ হয়েই সাধারণত শুয়ে থাকতেন, কাজেই তিনি সিলিংএ ছবি আঁকবার কথা ভেবেছেন। যাঁরা আমার মতো পাশ ফিরে শোন (এই জন্যই বোধ হয় আমার মতামত একটু একপেশে) তাঁরা স্বভাবতই চোখ বুজে মনশ্চক্ষে ছবি দেখেন।

শুয়ে থাকাকে যাঁরা বৃথা কালক্ষেপ মনে করেন আমি তাঁদের দলে নই। আমার যে জগতে বিচরণ শয্যা আশ্রয় না করলে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। দিবাস্বপ্ন অবশ্যই বসে বসেও দেখা যায়, কিন্তু শুয়ে

শুয়ে দেখা আরো বেশি আরামের। লোকে কথায় বলে গড়ানে পাথরের কপালে শ্যাওলা জোটে না। আমি যে নিশ্চল অবস্থায় শুয়ে থাকি তার ফলে আমার ভাগ্যে কিঞ্চিৎ শ্যাওলা জুটেছে। ঐ শ্যাওলাই আমার চিত্তভূমিকে সরস করে রেখেছে। শুয়ে থাকার সেইটেই সবচেযে বড় লাভ। অতএব উপসংহারে আপনাদের সকলকে আমাদের ক্লাবের স্লোগানটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি—শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন, সবাই শুয়ে পড়ুন।

ট্রেণ-ফেল

আমার বন্ধুটি সেদিন যখন ট্রেন ফেল করে স্টেশন থেকে ফিরে এলেন তখন আমার ভারী আনন্দ হল। সেটা সাধারণ কৌতুক বোধের আনন্দ নয়। অপরের ক্ষতি কিংবা অসুবিধায় দুষ্ট ব্যক্তির মনে যে আনন্দ জন্মে এটা সে আনন্দও নয়। সত্যি সত্যি আমার ভালো লাগল। অনেকদিন কাউকে গাড়ি ফেল করতে দেখিনি। ট্রেন ফেল করাটাকে লোকে অত্যন্ত লজ্জার ব্যাপার মনে করে; আমি তা করি না। সংসারে অনেক লজ্জাকর ব্যাপার আছে, কিন্তু আমার মতে এটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি জীবনে অন্ততঃ পাঁচ ছ' বার ট্রেন ফেল করেছি। তাতে অপরে যতই কৌতুক বোধ করুক, আমি কখনো লজ্জাবোধ করিনি। আর গাড়ি ফেল করে কোন ক্ষতি কিংবা অসুবিধাও আমার হয়নি। যাঁরা মামলা মোকদ্দমা সংক্রান্ত কাজে কিংবা লাটের খাজনা জমা দেবার জন্য ট্রেন ধরতে যান তাঁদের আমি কখনো গাড়ি ফেল করতে বলব না। আমি ও রকম কোন জরুরী

কাজে কখনো রেলে যাতায়াত করিনি, আমি যেতে হলে বিনা প্রয়োজনে খোশখুশি মত যাই।

ইস্টেশন থেকে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসচে এর মধ্যে একটি বিশেষ এক ধরণের আনন্দ আছে। সুটকেশ হাতে ঘরে ঢুকতেই মা বলচেন, কিরে গাড়ি পেলিনে বুঝি? তা ভালই হয়েছে। বারবেলায় রওনা হলি, মনটা খুঁত খুঁত করছিল। ভাইবোনেরা হাততালি দিয়ে বলে উঠবে, কি মজা দাদা ফিরে এসেছে। স্ত্রী বোধকরি রান্না কিংবা ভাঁড়ার ঘরে কাজ করছিলেন; সাড়া পেয়ে তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠবেন। মুখখানা কৌতুকের হাসিতে উজ্জ্বল। আস্তে আস্তে ঘরে প্রবেশ করে বলবেন কেমন হ'ল তো? আমার কথা ঠেলে—! বাঙালী গৃহের অতি বিরল সুখচ্ছবির মধ্যে এটি একটি। আমার কথা শুনে আপনাদের অনেকেরই বোধ হয় ট্রেন ফেল করবার লোভ হচ্ছে। তা বেশ তো, অন্তত পরীক্ষা করবার জন্য হলেও একবার গাড়ি ফেল করে দেখুন না।

ইদানীং আমি অনেকদিন ট্রেন ফেল করিনি। তার কারণ আমি একলা বড় একটা কোথাও যাই না, বন্ধুবান্ধব সঙ্গে থাকেন। তাঁরা কিছুতেই ট্রেন ফেল করতে রাজি নন। তাতে বোধকরি তাঁদের প্রেস্টিজের হানি হয়। আর বন্ধুরা যদি সঙ্গে না থাকেন তো আমার স্ত্রী সঙ্গে থাকেন। তিনি এ বিষয়ে আরো বেশি কড়া। কোথাও যেতে হলে তিনি এমন আঁটসাঁট ভাবে সংসার গুছিয়ে যান যে দৈবাৎ ট্রেন ফেল হলে ফিরে এসে আবার সংসার চালু করা বিষম ব্যাপার। সেই ভয়ে তিনি কিছুতেই ট্রেন ফেল করতে রাজি নন। সুতরাং তিনি তাঁর বাক্স প্যাঁটরা এবং আমাকে নিয়ে—ট্রেন টাইমের অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা আগে গিয়ে ইস্টেশনে বসে থাকেন। সেটা যে কি শাস্তি কি বলব। পাঁচ মিনিটের জন্য গাড়ি ফেল করার চাইতে গাড়ি ধরবার

জন্য দেড় ঘণ্টা আগে গিয়ে বসে থাকা যে অনেক বেশি unpunctual ব্যাপার এটা ওঁকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারিনি।

সেবারে আমি ট্রেন ফেল করেছিলুম বলে একজন মহিলা আমাকে মিডিয়াভেল বা মধ্যযুগীয় বলে গাল দিয়েছিলেন। এ গালাগালটা যে একটা এ্যানাক্রনিজম্ তা আপনারা সহজ দৃষ্টিতেই বুঝতে পারছেন। কারণ মধ্যযুগের লোকেরা কখনো ট্রেন ফেল করতেন না, কারণ মধ্যযুগে রেলগাড়ি ছিল না। ঐ ভদ্রমহিলাও আমাকে প্রেস্টিজের দোহাই দিয়েছিলেন। আমি বলেছি যে আমার প্রেস্টিজ এমন ঠুন্‌কো নয় যে ট্রেন ফেল করলে প্রেস্টিজ ফেল করবে। তা ছাড়া, যে গাড়ি আপন সময় মত চলে, আমার সময় কিংবা সুবিধার জন্য বিন্দুমাত্র কেয়ার করে না সে গাড়িকে ধরাধরি করতেই আমার প্রেস্টিজে বাধে। সত্যি বলতে কি আমার বন্ধুদের সাহচর্যে এবিষয়ে আমার যথেষ্ট অবনতি হয়েছে। এই সেদিন এঁদের প্ররোচনায় আমাকে ভোর পাঁচটায় গাড়ি ধরতে হয়েছিল। ভাবুন একবার, বাড়ি থেকে দু মাইল দূরে ইস্টেশন, ভোর পাঁচটায় গিয়ে গাড়ি ধরা কি ব্যাপার! এমন undignified কাজ আমি জীবনে কখনো করিনি। গাড়ি ইস্টেশনে ইন্ করেছে, আমরা তখনো ইস্টেশনের হাতায় পৌঁছিনি। পড়ি কি মরি ছুটে গিয়ে গাড়ি ধরলুম। Running after one's hat এর চাইতেও এটা বেশি হাস্যকর দৃশ্য। সেদিন লজ্জায় আমি অধোবদন হয়েছিলাম।

আমাদের মেয়েরা আধুনিকাই হোন্ আর পৌরাণিকাই হোন্ কখনো ট্রেণ ফেল করেন না। তাঁরা একলা বড় একটা চলেন না, কাজেই সঙ্গের পুরুষ escortটি দয়া করে ট্রেন ফেল করলে তবেই তাঁরা গাড়ি ফেল করবার সুযোগ পান। তা ছাড়া যে দেশের শাস্ত্রে উপদেশ রয়েছে পথি নারী বিবর্জিতা সে দেশে নারীকে নিতান্ত বিবর্জন

করা না গেলে অগত্যা দেড় ঘণ্টা আগে গিয়ে ইস্টেশনে বসে থাকতে হয়। আধুনিকাদের কথা আলাদা। এমন যে আধুনিক রবীন্দ্রনাথ তিনিও আধুনিকাদের ট্রেন ধরার কসরৎ দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন—

শুনেছিনু নাকি মোটরের তেল
পথের মাঝেই করেছিল ফেল,
তবু তুমি গাড়ি ধরেছ দৌড়ে'—
হেন বীরনারী আছে কি গৌড়ে ?

আছে বৈকি, আছে। তবে সেই গাড়ি ধরার দৃশ্যটা বড় একটা edifying spectacle নয়। আমাদের মরালগমনারা যদি হঠাৎ ক্ষিপ্রগমনা হযে ওঠেন, তাতে আধুনিকাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকলেও নারীর সম্মান কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। দৌড়ে গিয়ে গাড়ি ধরার এমন কি দরকার ছিল বলুন তো ? উনি গাড়ি ফেল করলে সৃষ্টি একেবারে রসাতলে যেত না। বরং আমি বলি সৃষ্টির রস-মাধুর্য অনেকখানি বজায় থাকত।

দুঃখের বিষয় আজকাল ছেলে মেয়েরা বড় বেশি সময়তান্ত্রিক, বড় বেশি সেয়ানা। এঁদের স্বভাবে ঢিলেঢালা কিচ্ছু নেই একেবারে আঁট সাঁট। এঁরা ট্রেণ ফেল করেন না, হাতের ছাতাটি ভুলে কোথাও ফেলে যায় না, দুদণ্ড হাত পা ছড়িয়ে কোথাও বসে গল্প করেন না। হাতের অতি সূক্ষ্ম কব্জিতে সূক্ষ্মতর কব্জিঘড়ি বাঁধা। কেবলই বলেন, সময় নেই, উঠতে হ'ল। অনবরত তাড়া দিয়ে দিয়ে জীবনটাকে কোণঠাসা করে এনেছেন। তাঁরা ভাবেন কব্জি-ঘড়িতে বাঁধা সময়কে তাঁরা হাতের পুতুল করেছেন। জানেন না যে নিজেই নিজের হাতে সময়ের নিগড় বেঁধে দিয়েছেন। আমি কখনো ঘড়ি ব্যবহার করি না। ভগবানের দেওয়া অসীম সময়কে আমি টুক্‌রো টুক্‌রো করে কাটতে রাজি নই। যারা এক ভগবানকে dissect করে তেত্রিশ কোটি

দেবতায় পরিণত করেছে তারা অসীম সময়কে কেটে কুটে ঘণ্টা মিনিট সেকেণ্ডে পরিণত করবে, এ আর বিচিত্র কি ?

একমাত্র ভরসা ছিল মহাত্মা গান্ধীর উপরে। তিনি আমাদের যুগকে গরুর গাড়ির যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন, এমন আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু সেবারে দেখি তিনিও ট্যাঁক থেকে ট্যাঁকঘড়ি বের করে বলছেন, জলদি কর জলদি কর—I am working aganist time. কারণ কিনা তাঁকেও গাড়ি ধরতে হবে। যদিচ সেটা স্পেশাল ট্রেন, এবং তাঁর জন্যই ইস্টেশনে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে।

ইদানিং একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। আমরা যেমন গাড়ি ফেল করি গাড়িও তেমনি আমাদের ফেল করে। আজকাল প্রায়ই ইস্টেশনে গিয়ে দেখি গাড়ি পাঁচ ঘণ্টা ছ' ঘণ্টা লেট্ আসচে। কাজেই গাড়ির আশা ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। এ যুগের ব্যস্তবাগীশদের জব্দ করবার এটাই সব চেয়ে ভালো উপায়।

ঘাড়ে ছাঁটা চুল

সেদিন আমার কন্যার চুল ছেঁটে দেওয়ার প্রস্তাবে প্রথমটায় সে মাথা নেড়ে ঘোরতর আপত্তি জানালে। তারপরে নিষেধ সত্ত্বেও চুল কেটে দেওযাতে সে কেঁদেই ফেললে। চুল ছাঁটাই-এর এমন শোচনীয় পরিণাম হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। তার কেশ বৃদ্ধির জন্যই যে আমার ছাঁটাই প্রস্তাব সে কথা ওকে বোঝানো কঠিন হ'ল। আমি ভেবেছিলাম এতে ও খুশিই হবে, কারণ ঘাড়ে ছাঁটা চুল একেলে মেয়েদের ফ্যাশান বলেই জানি। আমার মেয়েটি কি তবে সেকেলে

ভাবাপন্ন ? তা বোধ হয় নয়। এখনও ওর মাথার চুল পিঠ ছাপিয়ে পড়েনি। মাথায় কেশের সম্বল যৎসামান্য। সেজন্যই অত মমতা। অল্প লইয়া থাকে, তাই ওর যাহা যায় তাহা যায়। সামান্য মূলধনের কণাটুকুও ও খোয়াতে চায় না। আসল কথা এগারো বছরের মেয়ে এখনও ফ্যাশান ধর্মে দীক্ষিত হয়নি। ফ্যাশানের জন্ম adolescensc-এর পরে। আর বছর দুতিন বাদে বোধ করি ওর কেশপ্রেম অনেকটা শিথিল হয়ে আসবে। অন্তত একথা নিশ্চিত যে এগারো বছরের মতামত একুশ বছর অবধি টিকবে না। তখন তার বিলম্বিত বেণী আজানুলম্বিত হবে না, ঘাড়ের কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে যাবে।

' আমি অনেক ব্যাপারে অতি আধুনিক, কিন্তু এ বিষয়ে আমি সেকেলে। মেয়েদের ঘাড়ে ছাঁটা চুল ঠিক আমার বরদাস্ত হয় না, আমার সৌন্দর্যবোধকে পীড়া দেয়। মেয়েদের পিঠ ছাপিয়ে-পড়া চুল দেখতে আমার ভারি ভালো লাগে। মেঘবরণ চুল শুধু মেঘের মতো কালো দেখতে নয়, মেঘের মত পুঞ্জ পুঞ্জ এবং বহু বিস্তৃত। আমাদের লেখকেরা বলেন—ঘন চুলের অরণ্য—কথাটা আমার কাছে বেশ লাগে। ঘন অরণ্যের মধ্যে নারী-রহস্যের ইংগিত আছে। আর অরণ্যের analogy বজায় রেখে বলা যেতে পারে—deforestation-এ যেমন ভূমির সরসতা নষ্ট হয় কেশ কর্তনে তেমনি নারীর সরসতা নষ্ট হয়ে যায়। প্রাচুর্যের মধ্যেই সৌন্দর্য, বৃদ্ধির মধ্যেই সমৃদ্ধি। ইয়োরোপের মেয়েরা আধিক্য বর্জনের পক্ষপাতী। তাঁদের বক্ষ অনাবৃত, গাত্রাবাস সংক্ষিপ্ত, কুন্তল কর্তিত। অতি নিষ্ঠুর হস্তে দেহের উপরে কাঁচি চালিয়ে চেহারাটাকে এরা আটপৌরে করে তুলেছে। মনে রাখা উচিত ছিল যে সৌন্দর্যচর্চায় কোনো সর্ট-কাট্ পন্থা নেই।

কিন্তু আমাদের দেশে কেশ কর্তনের চলন এল কেমন করে ? একি কেবলমাত্র ইয়োরোপের অনুকরণ ? আমার মনে হয় এর পশ্চাতে

আমাদের দেশের ছেলেদের অনুমোদন আছে। মেয়েদের বেশ-বিন্যাস) বলুন, কেশ-বিন্যাস বলুন সবই ছেলেদের রুচি অনুযায়ী। ছেলেদের চোখে যেমন ভালো লাগে মেয়েরা ঠিক তেমনিভাবে নিজেদের সাজায়। অবশ্যি এর উল্টোটাও সত্য। ছেলেরা সাজে মেয়েদের রুচি অনুযায়ী। আমাদের মেয়েরা যদি জোর করে বলতে পারত যে হ্যাট-কোট-নেকটাইতে আমাদের ছেলেদের কুৎসিৎ দেখায় তবে বিদেশী পোষাক কোন্ দিন দেশছাড়া হয়ে যেত। পর্ রুচি পরনা কথাটা সত্য। অবশ্য এখানে পর অর্থে মেয়েদের পক্ষে ছেলে আর ছেলেদের পক্ষে মেয়ে। একালের মেয়েরা যদি পরার্থে কেশ উৎসৃজেৎ করে থাকেন তবে তাঁদের ঠিক প্রাজ্ঞ বলা চলে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করা চলে কিন্তু নিজের কেশ কর্তন করে পরের মনোরঞ্জন করা উচিত কিনা সেটাই প্রশ্ন।

কেশ কর্তনে মেয়েদের মস্তিষ্ক বিকৃত না হলেও মস্তক যে কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত হয় এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। তাছাড়া ফ্যাশানের কাছে মস্তক বিক্রয় করা নিশ্চয় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বেণীচ্ছেদনের প্রস্তাবে শিখবীর তরু সিং জবাব দিয়েছিলেন—

যা চেয়েছ তার কিছু বেশি দিব
বেণীর সঙ্গে মাথা।

বীরের মতো কথা বটে। আমাদের বিলম্বিতবেণী কন্যাদের মুখে সেই জবাবটা শুনলেই আমরা খুসি হতাম। কেশ বিনাশ না করে কেশ-বিন্যাস করলে পরম সুখের কথা হতো।

আমাদের পূর্ববর্ত্তী সাহিত্যিকেরা সুকেশিনীর শিরোশোভা নিয়ে কত শত মনোরম চিত্র রচনা করেছেন। ইদানীং সাহিত্যিকদের রচনায় রমণীয় কেশ বর্ণনার প্রাচুর্য নেই। হালের লেখকদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেব বসু এই জিনিসটিকে যথাযোগ্য মূল্য দিয়েছেন। অন্যেরা

এ বিষয়ে অল্পবিস্তর উদাসীন। না হয়ে উপায় কি? যার মাথা তারই যদি ব্যথা বোধ না থাকে তবে অপরে মাথা ঘামাবে কেন? আগে স্ত্রীলোকের কেশ স্পর্শ করলে রক্ষা থাকত না এখন সেই কেশের কি দুর্দশাই না হয়েছে!

এ যুগের হ্রস্বকুন্তলাদের জন্য কেবলমাত্র আমিই দুঃখ করছি এমন নয়। আমি জানি আপনাদের মধ্যেও অনেকের এ বিষয়ে মর্মবেদনা আছে। পাঠিকাদের মনের কথা অবশ্য আমি জানিনে। আমার বক্তব্য হচ্ছে বিধাতাপুরুষ রমণীকে রমণীয় করেই সৃষ্টি করেছেন, বিধাতার উপরে বৃথা কারসাজি করতে যাওয়া কেন? এমন কি পাশ্চাত্য রমণীদের কেশ কর্তন তেমন তেমন পাশ্চাত্যরাও বরদাস্ত করতে পারেননি। তাঁরা নিতান্ত সেকেলে ব্যক্তি নন। ডি এইচ লরেন্সকে কেউ সেকেলে বলবে না। কোনো কোনো বিষয়ে তাঁর উগ্র মতামত এখনও পর্যন্ত ইংলণ্ডের লোকদের ধাতস্থ হয়নি। এহেন ডি এইচ লরেন্সের মুখেও আমরা আক্ষেপোক্তি শুনেছি। তাঁর একটি কবিতায় তিনি বলেছেন—

> Why did they cut off their hair
> That they could comb by the hour
> In luxurious quiet?

এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? সুমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর। কিশোর বয়সে যখন প্রথম এই কবিতা পড়েছিলাম তখন বধূ অমিতার এই ছবিটি আমার মনকে আশ্চর্য রকম নাড়া দিয়েছিল। এইজন্য বড় হয়ে যখন লেখায় হাত মক্স করতে শুরু করি তখন আমার এক উপন্যাসের নাম দিয়েছিলাম বধূ অমিতা। আমার আরেকখানি উপন্যাসেও আমি আধুনিক হ্রস্বকুন্তলাদের স্মরণ করে কিঞ্চিৎ আক্ষেপোক্তি করেছিলাম। যদিচ, সেটা বক্রোক্তি

নয় তথাপি জানিনা আমার পাঠিকারা তাতে মর্মাহত হয়েছিলেন কিনা। অবশ্যি তাঁরা রাগ করলেও আমি দীর্ঘকুন্তলের গুণকীর্তন করতে ছাড়ব না। কালিদাস শকুন্তলা কাব্য রচনা করেছেন। আমার যদি ক্ষমতা থাকত তবে সকুন্তলাদের স্তুতিগান করে কাব্য রচনা করতুম।

চিঠির তাড়া

আমি যখন প্রথম লিখতে শুরু করেছিলাম, তখন ভাবিনি যে, এসব জিনিস লোকে মন দিয়ে পড়বে। অথচ কেউ পড়বে না ভাবলে লেখার উৎসাহ একটুও থাকে না। লেখা জিনিসটা একতরফা হতেই পারে না। লেখক এবং পাঠক—এই দুই পক্ষ নিয়ে লেখার কারবার। অন্যান্য ব্যবসার মতো এখানেও সাপ্লাই এবং ডিমাণ্ডের প্রশ্ন। লেখা পড়ে কারো ভাল লাগবে কারো লাগবে না, কেউ প্রশংসা করবেন কেউ নিন্দা করবেন। কিন্তু যে লেখার প্রতি পাঠক-সাধারণ উদাসীন, যার ভাল মন্দ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, সে লেখার সার্থকতা কোথায়?

খুব আনন্দের কথা যে, আমার লেখা একেবারে ব্যর্থ হয় নি। তার প্রমাণ আমি ঘরে বসেই পাচ্ছি। কারণ উৎসাহী পাঠকদের তরফ থেকে আমার প্রতি মাঝে মাঝে পত্রাঘাত হয়। এঁদের মধ্যে কেউ বা কৌতূহলী, কেউ বা গুণগ্রাহী, কেউ বা বিরুদ্ধ সমালোচক। আমার লেখা যে শুধু হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে না, পাঠকের মর্মমূলে আঘাত দিয়ে তাঁকে ভাবিয়ে কিংবা রাগিয়ে তুলেছে এইটাই লেখার সব চেয়ে বড় পুরস্কার। An effective writer teases people out of

indifference. এদিক থেকে বিচার করতে গেলে আমার লেখনীকে নিতান্ত ব্যর্থ লেখনী বলা চলবে না।

ইতিমধ্যে যে সব চিঠি এসে জমেছে, আজকের আসরে তার কিছু কিছু জবাব দেবার চেষ্টা করব। অবশ্য এর মধ্যেও বিপদ আছে। আমি অতি কুক্ষণেই জনৈকা পাঠিকাকে উদ্দেশ করে খাতার পাতায় কিঞ্চিৎ লিখেছিলাম। তার প্রতিক্রিয়া এখনও চলছে। উক্ত প্রবন্ধে আমি বলেছিলাম যে, আমি স্বনামধন্য লেখক নই, আমি পরনাম-ধন্য। কারণ আমারই নামে একজন সুসাহিত্যিক, সুপণ্ডিত এবং খ্যাতনামা দার্শনিক বাঙলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই সূত্রে নাম না দিয়ে কেবলমাত্র টেলিফোন নম্বর উল্লেখ করে যিনি চিঠি লিখেছেন, তাঁর কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, কিছুদিন পূর্বে আমার একটি বন্ধু তাঁর জনৈক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিচ্ছিলেন। আমার নাম বলতেই ভদ্রলোক বললেন, ও আপনার নাম তো ঢের শুনেছি। আমি বললুম, দুঃখের বিষয় যাঁর নাম শুনেছেন তিনি কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছেন। যাক্ এ প্রসঙ্গে অলমতিবিস্তরেন।

অপর একজন পত্রলেখক বলেছেন, আপনি ছদ্মনামের আড়ালে আত্মগোপন করলে কি হবে, আসলে আপনি প্র-না-বি'র নতুন সংস্করণ। পাঠক যদি আমাকে প্র-না-বি বলেই মনে করে থাকেন, তবে বুঝতে হবে আমি প্র-না-বি'র রচনা কৌশল কথঞ্চিৎ পরিমাণে আয়ত্ত করেছি। তাতে আমি নিশ্চয় গৌরববোধ করব। কিন্তু প্র-না-বি স্বয়ং কি ভাববেন, আমি জানিনে। কারণ I have no reputation to lose, but প্র না-বি has. অতএব ইন্দ্রজিতের সঙ্গে জড়িয়ে প্র-না-বি'র খ্যাতি প্রতিষ্ঠার কিছু যদি হানি হয়, তবে আমি সেজন্য দায়ী নই; এ কথাটি সবিনয়ে তাঁকে জানিয়ে রাখছি।

কিছুদিন পূর্বে একটি প্রবন্ধে আমি পলিটিক্সের চর্চা করেছিলাম। একজন মুসলিম ভ্রাতা তাতে মর্মাহত হয়েছেন। যাঁরা ইন্দ্রজিতের খাতা নিয়মিত পড়ে আসচেন, তাঁরা নিশ্চয় জানেন যে, ইন্দ্রজিৎ লোকটার ধর্মজ্ঞান নেই। ধর্মধ্বজী রাজনীতিতে আমি বিশ্বাস করি না। সুতরাং আমার মুসলিম ভ্রাতাটি দুঃখিত হলেও আমার মতামত বিন্দুমাত্রও বদলাবে না। লীগ আন্দোলনের ফলে মুসলমানরা সম্প্রতি পাকিস্তান লাভ করেছেন; কিন্তু তার শীর্ণ এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত মূর্তি দেখে মুসলিম ভ্রাতারাই এখন আতঙ্কিত হবেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের ন'কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার কোটি পাকিস্তানের বাইরে পড়ে যাচ্ছে।

উক্ত মুসলমান বন্ধুটির চিঠিতে একসঙ্গে অনেকগুলি তার বেজে উঠেছে। একটি বাক্য উদ্ধৃত করছি—"মধ্যে মধ্যে আপনার লেখা-গুলিকে শ্রদ্ধা করি, কেননা আপনি বড় স্পষ্টবাদী। ভালবাসি, সব দিকে দৃষ্টি রাখেন বলিয়া আর প্রশংসা করি পড়িতে আরাম পাই বলিয়া। কিন্তু রাগ ও নিন্দা করি এইজন্য যে আপনি মিথ্যাবাদের পক্ষপাতিত্ব করিয়া মধ্যে মধ্যে বড় সত্য কথা বলেন।" দুঃখের বিষয় শেষের কথাটির অর্থ আমি বুঝতে পারি নি। তথাপি আমার লেখার ফলে একই মানুষের মনে এত বিচিত্র রকম ভাবের উদয় হয়েছে জেনে আমি বিস্মিত এবং পুলকিত হযেছি এবং পত্র লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু কি কুক্ষণেই যে আমি জনৈকা পাঠিকার পত্রের উল্লেখ করেছিলাম। এর ফল এমন শোচনীয় হবে, আগে জানতুম না। জনৈক পাঠক বিষম ক্রুদ্ধ হয়ে লিখেছেন যে, উক্ত পাঠিকা কি দেখে আমার লেখার প্রশংসা করলেন, তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। অবশ্য আমিও বুঝতে পারি নি। "প্রতি সপ্তাহে আপনি দুই বা তিন

পাতা পেয়ে থাকেন; কিন্তু কোন স্থায়ী রসের সাহিত্যবস্তু কি আপনি দিতে পেরেছেন?" নিশ্চয় নয়। সাময়িক পত্রে স্থায়ী বস্তুর স্থান নেই। আজকের জিনিস কালকে বাসি। কিন্তু মজা দেখুন, গত আট মাস ধরে আমি লিখছি। ইন্দ্রজিতের খাতা যে এক পাতায় নিবদ্ধ পাঠক সে খবরটিও রাখেন না। পাঠকের আরেকটি নালিশ এই যে, ইতিপূর্বে যাঁরা এ ধরণের জিনিস লিখেছেন তাঁদের লেখায় wit এবং allegory থাকত। আমার লেখায় তাও নেই। আমার মুস্কিল এই যে, আমি allegoary নামক পদার্থটায় বিশ্বাস করি না। আমি রূপ বুঝি, রূপক বুঝি না। আর wit এবং allegory'র মিশ্রণে যে অপূর্ব খিঁচুরি প্রস্তুত হয়. সে জিনিসটা কি আপনারাই বলুন তো? সেটা কি আলিগড়ি wit? সর্বনাশ, আমি তার ধারে কাছেও থাকতে রাজী নই। পত্রলেখক আজকালকার সকল লেখকের উপর খড়্গহস্ত। বলেছেন, "সাহিত্যগগণে নতুন কোন জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব না হলে স্থায়ী সাহিত্যের সৃষ্টি আপনারা যাঁরা আছেন, তাঁদের দিযে সম্ভব হবে না।" আমারও তাই মনে হয়। মস্কো থেকে কিছু লেখক আমদানী না করলে বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার। উপসংহারে পত্রলেখক বলেছেন—"আপনার দপ্তর পড়েন অনেকেই, আনন্দও হয়ত কেউ কেউ পান, কিন্তু প্রশস্তি যাঁরা আওড়ান, তাঁরা সাধুসাধ্বী লোক হলেও অল্পবুদ্ধি।" আমার সাইকলজিস্ট বন্ধুকে চিঠিখানা দেখিয়েছিলাম। তিনি ঈষৎ হেসে বললেন, মেয়েরা কারো প্রশংসা করেছে শুনলে কোন কোন লোকের মেজাজ বিষম বিগড়ে যায়। এটি তারই নিদর্শন। আমি ছাই psychology কিছু বুঝিনে। কিন্তু সত্যি হলে বড় বিপদের কথা। কাজেই সম্প্রতি শ্রীযুক্তা বনলতা ভট্টাচার্য আমাকে প্রশস্তি জ্ঞাপন করে যে চিঠি লিখেছেন, তাঁকে সাবধান করে দেওয়া কর্তব্য যে অত সহজে প্রশস্তি আওড়ানো

নিরাপদ নয়। মিছিমিছি তিনি নিজে অল্পবুদ্ধি বলে সাব্যস্ত হবেন, আর মাঝখান থেকে আমার উপরে যত সব চতুর ব্যক্তিরা চটে যাবেন। বনলতা দেবী আমার কাছে বন্ধুত্ব এবং স্নেহের দাবী করেছেন। নিশ্চয়, একশোবার। প্রশংসা-কৃপণ দেশে কেউ যদি প্রশংসা করেন, তাঁকে বন্ধু বলব না তো কাকে বলব? তাঁকে অসঙ্কোচে আমার বন্ধুমহলের অন্তর্ভুক্ত করে নিলুম। তাতে পত্রাঘাত হয় হোক্, প্রতিঘাত হয়, তাও শিরোধার্য।

দৈবজ্ঞ বৃত্তি

হাল্কা সুরে কথা বলে বলে আমার স্বভাব কেমন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। গোড়ায় যখন লিখতে সুরু করেছিলাম ভেবেছিলাম হাল্কা সুরে গভীর কথা বলব, কেননা গভীর কথা গভীর সুরে বললে কেউ শুনতেই চায় না। চিনির প্রলেপ না দিলে ছেলেপিলেদের যেমন কুইনাইন গেলানো যায় না, এও তেমনি। যাও-বা একবার একটু গম্ভীর কথা বলতে গিয়েছিলাম, তাতেই কোনো কোনো পাঠক মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন। কিন্তু আপনারা রাগই করুন আর গালই দিন গম্ভীর কথা না বললে আর চলছে না।

দেশের আবহাওয়াটা এমন গম্ভীর থম্ থমে হয়ে উঠেছে যে হাল্কা কথা ব'লতে অমনিতেই লজ্জা করে। দেশময় ছোট বড় মাঝারি যত রকম নেতারা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বিবৃতি কিংবা বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন। পাঠক আর শ্রোতাদের এখন মাথা ঠিক রাখা দায় হয়েছে। নিতান্ত অকিঞ্চন ব্যক্তি হলেও আমি আর কিছুতেই লোভ সামলাতে

পারছিনে। মাইক্রোফোনের সুমুখে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বলতে ইচ্ছে করছে—ভো ভো অমৃতস্য পুত্রাঃ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক ভেবে দেখলুম সংসারে একটি মাত্র গম্ভীর বিষয় আছে, সেটি রাজনীতি। কারণ ওটা মানুষের জীবন মরণের সমস্যা। আমার বন্ধুদেরও তাই মত, এতদিন যা বলেছে সবই নাকি বাজে কথা। তাঁরা বলেন, এহ বাহ্য, আগে কহ আর। আমি বলি শোন তবে সর্বসাধ্য সার। অতএব আজ অনেক সব গুরুতর কথা বলব স্থির করেছি। সাহিত্য বলুন, শিল্প বলুন সব হাল্‌কা জিনিস অর্থাৎ মন থেকে ভাবনা চিন্তার ভার নাবিয়ে মনকে হাল্কা করতে পারলে তবেই শিল্প সাহিত্যের চর্চা সম্ভব। ওগুলো হচ্ছে arts of peace. আর রাজনীতি হল art of warfare যদিচ সে art অধিকাংশ ক্ষেত্রেই fair হয় না।

প্রথমেই আমার একটি প্রস্তাব আছে। সেটি হচ্ছে, আমাদের ভাষা থেকে 'রাজনীতি' কথাটা উচ্ছেদ করতে হবে। রাজার সঙ্গে যখন সম্পর্ক চুকতে বসেছে তখন আবার রাজনীতি কি? এখন থেকে হবে রাজ্য নীতি বা রাষ্ট্র নীতি। পাকিস্তানে জিন্না সাহেব বাদশা হোন্ শাহেনশাহ্ হোন আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই; কিন্তু ভারত রাষ্ট্রে (হিন্দুস্থান কথাটা এ মুহূর্তেই পরিত্যজ্য) 'রামরাজ্য' যদি বা হয় রাম রাজা চলবে না, এমন কি গান্ধী মহারাজাও নয়। এখন আমরা সবাই রাজা।

সেদিন 'দেশ' পত্রিকা সম্পাদকীয় মন্তব্যে সুন্দর একটি কথা বলেছেন—ইংরেজ যাচ্ছে বটে কিন্তু দেশকে আস্ত রেখে যাচ্ছে না। আমি বলি, শুধু দেশ নয়, আমাদেরও যে আস্ত রেখে যাবে এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজ তার কূট কৌশলে দেশে এমন আগুন' জ্বালিয়েছে এখন তা নেবাবার ক্ষমতা তার নিজেরও নেই, বন্যা

বাহুল্য ইচ্ছেও নেই। মুসলিম লীগের হাতে মশালটি তুলে দিয়ে ইংরেজ তার ইন্ধন জুগিয়েছে। এখন যে দাবানল জ্বলছে তা নেবানো জিন্না সাহেবের ক্ষমতার বাইরে। জিন্নার নেতৃত্ব কত বড় মিথ্যা তা তাঁর appeal-এর ব্যর্থতার দ্বারাই প্রমাণিত হযেছে। আগুন একবার জ্বললে জ্বলে জ্বলে আপনি নিঃশেষ না হতে শান্তি নেই। তার এখনও ঢের বাকি। অন্তত আগামী পাঁচ বৎসর কাল দেশে কোথাও শান্তি থাকবে না।

দৈবজ্ঞবৃত্তি সকল ক্ষেত্রেই হাস্যকর, রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও। আমি দৈবজ্ঞের মতো কথা বলছি দেখে আপনারা মনে মনে হাসছেন। এইচ জি ওয়েলেস যখন রাজনৈতিক দৈবজ্ঞবৃত্তি শুরু করেছিলেন তখন লোকে হাসতে কসুর করেনি, যদিচ তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছিল। আমি এইচ জি ওয়েলেস-এর মতো মানবসমাজের কুষ্ঠি বিচার করতে জানিনে। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থাটা এতই সুস্পষ্ট যে এর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দৈবজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে স্বাধীনতা হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল হিন্দুস্থান পাকিস্তানের গোলমালে সে স্বাধীনতা দশ বছর পিছিয়ে গেল। ১৯৫৭র আগে আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ হবে না। দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে আরো দশ বৎসর ইংরেজের কর্তৃত্ব পরোক্ষভাবে এদেশে থেকে যাবে।

Transition period সকল দেশের পক্ষেই সঙ্কটকাল। জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েও রাশিয়া গৃহ যুদ্ধ থেকে মুক্তি পায়নি। সেই নরমেধ যজ্ঞে রাশিয়ার সাড়ে তেরো লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হযেছিল। ভারতবর্ষেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটা অসম্ভব নয়। বহু রক্ত মোক্ষণের পর দেশ শান্ত হবে। তখন পাকিস্তান থাকবে না, হিন্দুস্থান থাকবে না, রাজস্থান থাকবে না। ভারতময় এক বিরাট রাষ্ট্র গঠিত হবে। সেই

শুভদিনের প্রত্যাশায় আমরা বেঁচে থাকবার প্রাণপণ চেষ্টা করব, যদিচ পারব কি না সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

কিন্তু এই কুরুক্ষেত্রের কোনই প্রয়োজন ছিল না। মহাত্মা গান্ধী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন তা ব্রহ্মাস্ত্রের চাইতেও শক্তিশালী। মাত্র পঁচিশ বৎসরের চেষ্টায় যৎসামান্য রক্তপাতে চল্লিশ কোটি মানবের মুক্তি তিনি করায়ত্ব করেছিলেন। জগতের ইতিহাসে এই ঘটনা অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব। হায়রে, সেই স্বাধীনতা যখন হাতের মুঠোর মধ্যে তখন সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করেছে তাঁরই স্বদেশবাসী এবং সেই সব স্বদেশবাসী যাঁরা সংগ্রামে নির্লজ্জভাবে নিশ্চেষ্ট ছিল। যে যত বেশি নিশ্চেষ্ট সে তত বেশি ভাগ আদায়ের চেষ্টা করেছে। যে স্বাধীনতার উদ্দীপনায় দেশবাসী হাসি মুখে সকল দুঃখকষ্ট লাঞ্ছনাকে বরণ করেছিল সেই স্বাধীনতার নামে মানুষের মনে আজ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। আজ এমন মানুষের অভাব নেই দেশে, যারা মুখে স্বীকার না করলেও মনে মনে ভাবছে—দরকার নেই স্বাধীনতায়—এর চেয়ে ইংরেজ রাজত্ব শ্রেয়। এই কলংককর অবস্থার সৃষ্টি যারা করেছে তাদের ক্ষমা করবে কে? এ দুঃখ রাখবার স্থান কোথায়? সেদিন বেতার বার্তায় জওহরলালের আর্তকণ্ঠে ভারতবর্ষের এই অন্তর্বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সমস্ত স্বপ্নসাধ ভেঙে চুরমার হয়ে গেলে যে হতাশা সেই হতাশার আভাস ছিল তাঁর কণ্ঠে। সেদিন ইংরেজ কবি ওয়েন্-এর একটি লাইন বারম্বার আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল—

Was it for this the day grew tall?

অহমিকা

আমি যে একজন অহংকারী ব্যক্তি সেকথা আমার বন্ধু মহলে সুবিদিত। শুধু বন্ধুবান্ধব কেন মাত্র তিন দিনের জন্যও যদি কারো সঙ্গে পরিচয় হয়, তবেই তিনি আমার এই মহৎ গুণটি অনায়াসে টের পেয়ে যান। অহংকার নামক রিপুটি মানুষ কিছুতেই গোপন রাখতে পারে না। ওটি আপন স্বভাবগুণেই প্রকাশ পেয়ে যায়। আমার মতে অহংকার মানুষের সব চাইতে বড় রিপু। তার কারণ অন্য কোনও কোনও রিপু থেকে মুক্ত মানুষ আমি দেখেছি, কিন্তু অহমিকা শূন্য মানুষ আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি। অতিশয় অমায়িক প্রকৃতির মানুষ দেখেছি, মৌখিক বিনয় প্রকাশ তো অহরহই শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু অহমিকার প্রচ্ছন্ন মূর্তিটি এর মধ্যেও নিরন্তর উঁকি মারতে থাকে।

'রিপু' কথাটা আমাদের দেশে তাৎপর্য-দোষ-দুষ্ট। আপনাদের মত কি জানি না, আমি কিন্তু মানুষের ছ'টি রিপুর একটি রিপুকেও ঘৃণা করি না। আমার মতে এই ছ'টি রিপু মানুষের সব চেয়ে বড় মিত্র। এরা না থাকলে মানুষ হ'ত কতগুলি নিষ্প্রাণ নির্জীব কাদা মাটির তাল। রিপুহীন মানুষ অমানুষ হ'ত, এমন কি পশুও হ'তে পারত না, কারণ পশুদেরও রিপু আছে। বোধ করি তারা দেবতা হ'ত। কিন্তু দেবতা হবার জন্য যদি অমানুষ হ'তে হয়, তবে বোধ করি আমার মতো আপনারাও তাতে রাজি হবেন না। সাধুসন্তরা মিলে রিপু সংহারের চক্রান্ত করতে হয় করুন কিন্তু আমরা সে চক্রান্তে যোগ দেব না।

যাক, কথাটা কেন উঠল সেকথাই আগে বলি। সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে অহংকারী বলে লজ্জা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি তাতে কিছুমাত্র লজ্জিত কিংবা অপ্রতিভ হইনি। আমি তৎক্ষণাৎ বললুম, দেখুন, আমার অনেক রকম দোষ আছে, কিন্তু বিনয় নামক দোষটি আমার নেই। আমি বিনয় করে কখনও কথা বলি নি। কথা বলতে হলে অহংকারের সঙ্গেই বলি। শুনে ভদ্রলোক অবশ্যই মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং এতাদৃশ অহংকারী ব্যক্তির পতন যে অবশ্যম্ভাবী সেকথা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু মনে মনে খুশি হয়েছিলাম এই ভেবে যে পতন যার অবশ্যম্ভাবী তার উত্থানও অবশ্যম্ভাবী, কারণ উত্থান না হলে পতন হ'তে পারে না। আমার মধ্যে অহং ভাব এতই মজ্জাগত যে, উত্থানের আশায় আমি পতনকেও সানন্দে মেনে নিতে রাজি আছি। লোকে বলে, পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে। তা মরুক না তবু তার জীবন সার্থক। স্বল্পকালের জন্য হলেও সে যে আকাশবিহারী হয়েছে সে সার্থকতা যাবে কোথায়? পক্ষবিহীন পিপীলিকার কখনও সে গৌরব হবে না।

কিছু দিন আগে আমি যে মুসলমান পাঠকটির উল্লেখ করেছিলাম তাঁর একটি কথা আমার বড় ভাল লেগেছে। বলেছেন, আপনার আত্মগর্বীভাব দেখে মনে মনে হিংসা হয়। অহংকার জিনিসটা যে মূলত খুব ভাল জিনিস এটি তার আরেকটি প্রমাণ কারণ, ভাল জিনিস না হলে লোকে তাই নিয়ে হিংসা করবে কেন?

আমাদের শাস্ত্রে বলেছে বিদ্যা বিনয়ং দদাতি। আমার মধ্যে যে বিনয়ের অভাব আছে সেটা বোধ করি বিদ্যার অভাবেই হয়েছে। শুনেছি বৈদিক ভাষায় বিনয় কথাটার মানেই নাকি শিক্ষা। পাছে অতিরিক্ত বিনয় নম্র হয়ে পড়ি এই ভয়েই আমি বরাবর বিদ্যাকে পাশ

কাটিযে চলেছি। শাস্ত্রে তৃণাদপি সুনীচ হওয়ারও উপদেশ আছে। এর চাইতে মারাত্মক উপদেশ আর কিছু হ'তে পারে না। একবার ভেবে দেখুন তো তৃণকে কে না পায়ে মাড়িযে চলে! অতখানি বৈষ্ণব বিনয় আমার অসহ্য।

বিনয় করে কথা বলবার সব চেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে লোকে তৎক্ষণাৎ তা বিশ্বাস করে বসে। যেই না বিনয় করে বললুম, আমার বিদ্যে নেই, বুদ্ধি নেই, আমি মূর্খ, আমি অধম, ব্যস আর রক্ষে নেই লোকে অমনি বিশ্বাস করে বসল। যদিচ বক্তা ঠিক এর উল্টোটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। বিনয় জিনিসটা যদি ভাল investment হ'ত তবে সংসারী লোক হিসেবে আমি এই মুহূর্তে বিনয়ী সেজে বসতুম।

লজ্জা যেমন স্ত্রীলোকের ভূষণ বিনয় তেমনি তেমন তেমন মহাপুরুষের ভূষণ। আমাকে আপনাকে তা মানায না। এমন কি তাতে হিতে বিপরীত হ'তে পারে। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের হর্তা কর্তা বিধাতা। সুতরাং তিনিই বলতে পারেন—আমি বলবার কে? আমি তো চার আনার সদস্যও নই। ষোলো আনা ক্ষমতা হাতে আছে বলেই সিকি পরিমাণ বিনয় তাঁকে সাজে। এ জাতীয় বিনয় যে অহংকারেরই নামান্তর তা নিতান্ত মূর্খরাও বুঝতে পারে। গান্ধীজি বিনয় করে বলে থাকেন যে, তিনি infallible নন্, ভুল ভ্রান্তি তাঁরও হয়ে থাকে। কিন্তু সে সব ভুলকে তিনি আখ্যা দিয়েছেন Himalayan blunders. বুঝুন একবার তাঁর ভুল ভ্রান্তিও হিমালয়ের সমতুল্য। একে বিনয় বলবেন না অহংকার বলবেন? কেন ভুলভ্রান্তি কি আমরা করি না? কই, উই-এর ঢিবির সঙ্গেও তো কেউ তার তুলনা করে না।

থাক্ মহাত্মার কথা বলে আর কি হবে, নিজের কথাই বলি। নইলে অহমিকা বজায় থাকে না। আমি জীবনে একটি মাত্র কবিতা লিখেছিলাম। আপনারা শুনে কৌতুক বোধ করবেন সে কবিতাটির

নাম 'অহংকারী'। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তি জীবনে একটি মাত্র কবিতা লিখেছে সে ব্যক্তি কবি পদবাচ্য নয়। বাস্তবিক পক্ষে কবিতা আমার আসে না, কারণ আমি ছন্দ মিলাতে জানিনে। গদ্য কবিতার রেওয়াজ হয়েছে বলেই সাহস করে উক্ত কবিতাটি লিখেছিলাম। ছন্দ জিনিসটা আসলে এক ধরণের ডিসিপ্লিন। আমার মনের মধ্যে কোনো রকম ডিসিপ্লিন নেই, কাজেই ছন্দ মিলিযে কবিতা লেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। যাক, সেই কবিতার প্রথম দুটি লাইন আমার মনে আছে—

"আমার একটি মাত্র গুণ, সে আমার অহংকার
তোমরা বিনয়কে বল ভূষণ আমি অহংকারকে বলি অলংকার—"

তারপরে যে সব উপমার দ্বারা অহংকারের গৌরচন্দ্রিকা করেছিলাম, একমাত্র মহাকবি কালিদাসের পক্ষেই তা সম্ভব হ'ত। বলেছিলাম হিমালয় যে উন্নত-শির আকাশে তুলেছে, সে কি তার অহংকার নয়? আর অহংকার যদি নিন্দনীয় হবে, তবে সকলের মুখে কেন হিমালয়ের স্তুতি গান? তাকে কেন বল দেবতাত্মা নগাধিরাজ? মূর্খ আমাদের বিন্ধ্যপর্বত—মাথা নত করে অগস্ত্যকে দিয়েছিল পথ, অগস্ত্য আর কি ফিরেছে? বিন্ধ্য আর কি মাথা তুলেছে? তাহলেই দেখুন আমি যদি আজ মাথা নত করি, তবে আমার মনুষ্যত্ব ডিঙিয়ে যাবে আমাকে, সে হ'বে আমার মনুষ্যত্বের অগস্ত্য যাত্রা। অতএব বিনয় কদাপি নয়। অহংকার আত্মপ্রত্যয়ের লক্ষণ। আপন শক্তির পরে শ্রদ্ধার অভাব আত্মহত্যার মতোই পাপ।

ছ্যাবলামো

সম্প্রতি কিছুদিন আমি একটা অত্যন্ত স্বভাববিরোধী কাজে লিপ্ত ছিলাম। ফলে আমার মন মেজাজ বিষম বিগড়ে গিয়েছিল। সেজন্য পর পর তিন সপ্তাহ আমি লেখা পাঠাতে পারি নি। কাজটা মাথায় একটা বোঝার মতো চেপে ছিল। বোঝা খালাস করে মাথা বেমালুম ফাঁকা করতে না পারলে ইন্দ্রজিতের লেখার হালকা সুরটা ঠিক বেরোয় না। আমার এ সব লেখা যে প্রবন্ধ কিংবা রচনা জাতীয় জিনিস নয় তা আপনারা এতোদিনে নিশ্চয় বুঝে নিয়েছেন। এগুলো অনেকটা আপন মনে কথা বলে যাওয়ার মতো অর্থাৎ বলতে পারেন এগুলো ইন্দ্রজিতের স্বগতোক্তি। কিন্তু গত তিন সপ্তাহ আমি এতো ব্যস্ত ছিলুম যে, অপরের সঙ্গে তো দূরের কথা আপন মনে কথা বলারও ফুরসৎ ছিল না।

প্রতি সপ্তাহে লেখা পাঠাব বলে আমি সম্পাদকমশায়ের কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ। সে অঙ্গীকার রক্ষা করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত এবং লজ্জিত। সহৃদয় পাঠকবর্গের কাছে জবাবদিহির তেমন কোন প্রয়োজন বোধ হয় নাই। তার কারণ তিন সপ্তাহ ইন্দ্রজিতের খাতা না পড়ে তাঁরা নিশ্চয শোকে কাতর হয়ে পড়েন নি। বরং আমার মনে হয় বহু সপ্তাহ ধরে এক ধাঁচের লেখা পড়ে পড়ে পাঠকদের যখন হাঁপ ধরে আসে তখন কিছু দিনের বিরাম লেখকদেব পক্ষেও স্বাস্থ্যকর পাঠকদের পক্ষেও। পাঠকেরা অবশ্য বলতে পারেন, তা হ'লে ধাঁচটা বদলালেই হয। কিন্তু লেখার ধাঁচ বদলানো আর

লেখকের স্বভাব বদলানো এক কথা। সংসারে সব কিছুর অদল বদল সম্ভব, কিন্তু স্বভাব বদলানো অসম্ভব।

এ ছাড়া ইন্দ্রজিতের আর এক ফ্যাসাদ। সেটা বিষয় নির্বাচনী ফ্যাসাদ। আমরা সকলেই বিষয়ী লোক, বৈষয়িক আমাদের মন। কাজেই বিষয় নির্বিশেষে কথা বলতে গেলে অনেকেরই মন ওঠে না। বিশেষ করে আমাদের দেশ নৈয়ায়িকের দেশ। এখানে সবাই চুলচেরা তর্ক করে কথা বলেন। ন্যায়শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে কথা বললেও যে অন্যায় কথা বলা হয় না সে কথা এদেশের লোককে বোঝানো শক্ত। আমার মতে লজিককে বাদ দিলে তবেই কথা বলার আর্ট স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করে। গুরুগম্ভীর বিষয় ছেড়ে নেহাৎ আমরা যাকে বলি কথার কথা তাই নিয়ে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন, তাঁরা যথার্থই উঁচু দরের শিল্পী। ইংরেজী সাহিত্যে চার্লস ল্যাম্ব থেকে শুরু করে জি কে চেস্টারটন্ পর্যন্ত অনেকে এ ধরণের সাহিত্য সৃষ্টি করে যশস্বী হয়েছেন। আমাদের ভাষায় ছদ্মনাম-খ্যাত বীরবল এ জাতীয় সাহিত্য রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি বলেছিলেন, বাঙলা সাহিত্যে 'গবেষণাযুক্ত' ছ্যাবলামোর বড় অভাব। অর্থাৎ উঁচু দরের সাহিত্যেও যে ছ্যাবলামোর স্থান আছে এই মহা সত্যটি তিনি স্বীকার করেছিলেন। আর ছ্যাবলামো যখন গুণপণাযুক্ত হয়, অর্থাৎ সাহিত্যের প্রসাদ লাভ করে, তখন সেটা আর নিছক ছ্যাবলামো থাকে না। প্রমথ চৌধুরীমশায় সুসাহিত্যিক, তিনি অসাধু ভাষায় সাধু বিষয়ক সাহিত্য রচনা করেছেন। বীরবলও সুসাহিত্যিক, তিনি সাধু ভাষায় (অর্থাৎ গুণপণাযুক্ত ভাষায়) ছ্যাবলামো করেছেন। কিন্তু আমার মতে সাহিত্যিক হিসাবে প্রমথ চৌধুরীর চাইতে বীরবল-এর স্থান ওপরে। সংসারে গুণবান মানুষের অন্ত ছিল না। এতো মানুষ থাকতে প্রমথবাবু বিদূষক বীরবল-এর ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন

কেন? বিদূষণ জিনিসটা যে দোষনীয় নয় এইটি প্রমাণ করাই বোধ করি তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

এককালে আমাদের রাজা ছিল, রাজসভা ছিল। এখন গণতন্ত্রের যুগে রাজা এবং রাজসভার স্থান গ্রহণ করেছে জনসাধারণ অর্থাৎ বৃহত্তর সমাজ। গণতন্ত্রের সুবিস্তৃত রাজসভায় বিদূষক-এর স্থান গ্রহণ করবেন সাহিত্যিক এবং বিদূষণ শিল্প অচিরে সাহিত্য কলার মর্যাদা লাভ করবে। অন্যান্য দেশে ইতিমধ্যেই তা হয়েছে। বীরবল যাকে বলেছেন গুণপণাযুক্ত ছ্যাবলামো সে জিনিসটা যে আমাদের সাহিত্যে তেমন বিস্তার লাভ করে নি তার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ ছ্যাবলামোকে আমরা গুণ বলে স্বীকার করি না, ওটাকে নির্গুণ লোকের লক্ষণ বলে অশ্রদ্ধার চোখে দেখি। সেটা যদি রীতিমতো গুণপণাযুক্ত হয় তা'হলেও তাকে সম্যক মর্যাদা দিতে আমাদের পণ্ডিতী রুচিতে বাধে। দ্বিতীয় কারণটা সামাজিক এবং ঐতিহাসিক। আমাদের দেশে শিক্ষা অতি অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ। বাছাই করা জন কয়েকের জন্য যে সাহিত্য রচনা হয় তা গুরুগম্ভীর না হয়ে যায় না। সেখানে হাল্কা কথাও ওজনে ভারী হয়ে ওঠে। শিক্ষা যখন বহু বিস্তৃত হ'বে, তখন বহুসংখ্যক অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তির জন্য সাহিত্য রচনা হ'বে। সে সাহিত্যের প্রধান টেকনিক্ হ'বে গম্ভীর কথা হাল্কা সুরে বলা। অবশ্য সেই হাল্কা কথা গুণপণাযুক্ত হওয়া চাই। অর্থাৎ ছ্যাবলামোটা রস নিংড়ে-নেওয়া কথার ছিবড়ে হ'লে চলবে না। হাল্কা সুরটি রস-ঘন হ'লে তবেই তা সাহিত্যপদবাচ্য।

ইংরেজ সাহিত্যিক বেকন্ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি বলতেন ইংরেজী ভাষা ভদ্রলোকের ভাষা নয়, লিখতে হয় তো ল্যাটিন ভাষায়। অতএব তিনি বহু পরিশ্রমে ল্যাটিন ভাষায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তিনি নিতান্তই কৃপাপরবশ হয়ে এও তা

নিয়ে—ইংরেজি ভাষায় কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন। অদৃষ্টের এমনি পরিহাস ল্যাটিন ভাষায় লেখা বেকনের গুরুগম্ভীর দার্শনিক প্রবন্ধ আজকাল বিস্মৃতপ্রায়। অপর পক্ষে হাল্কা ঢংএ লেখা তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ সর্বজনগ্রাহ্য এবং সর্বত্র আদৃত।

আজকাল আমরা যাকে বলি Belles letters তার জন্ম ফরাসী দেশে কিন্তু ইদানীং ইংরেজী সাহিত্য এ বিষয়ে যেমন উৎকর্ষ লাভ করেছে এমন আর কোনও সাহিত্য নয়। দৈনিক টাইমস পত্রিকায় তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সম্পাদকীয় স্তম্ভ এ ও তা নিয়ে লেখা। বলা বাহুল্য এ সব অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা। এগুলো সংবাদপত্র সুলভ প্রাত্যহিক প্রযোজনকে অতিক্রম করে সর্বকালীন না হলেও দীর্ঘকালীন মূল্য লাভ করেছে। তার প্রমাণ ঐ সব প্রবন্ধ সংকলিত হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত সাধারণ জিনিস নিয়ে তাঁরা অসাধারণ রচনা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। নিতান্ত কুকুর বেড়াল নিয়ে এমন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখেছেন যা আমাদের দেশে গো-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও লেখা সম্ভব নয়। সুখের বিষয় ইদানীং আমাদের নবীন সাহিত্যিকদের মধ্যে কেউ কেউ এ ধরণের রচনায় হাত দিয়েছেন এবং যথেষ্ট কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। বুদ্ধদেব বসু এবং বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙলা সাহিত্যে যে এ জাতীয় লেখার বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে তা এঁরা আপন শক্তির দ্বারা প্রমাণিত করেছেন। সাধারণকে অসাধারণ করতে গেলে ভাষা প্রয়োগে যথেষ্ট কারুকার্য প্রয়োজন। বাঙলা সাহিত্যে Belles lettersএর বহুল প্রচলন হ'লে আমাদের ভাষাগত কারুশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হবে।

বিরহ

উঁহুঁ, আপনারা না ভেবেছেন তা নয়। আমি বিরহী যক্ষ নই। ইন্দ্রজিৎ লোকটা সময়ে সময়ে মেঘলোকে বিচরণ করে বটে কিন্তু তাই বলে আকাশের মেঘকে বার্তাবহ নিযুক্ত করে প্রমীলা পুরীর উদ্দেশে বিরহবিলাপ প্রেরণ করবার প্রয়োজন সে বোধ করে না। বিশেষ করে প্রমীলা দেবী যখন দুহাত মাত্র ব্যবধানে বসে ঈষৎ হাস্য বিস্তার করছেন তখন ইন্দ্রজিতের বিরহের প্রশ্নই ওঠে না। যেখানে দুটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সংসারাশ্রম আবদ্ধ সেখানে বিরহের অবকাশভূমি স্বভাবতই অতিশয় সংকীর্ণ। বিরহটা সেখানে সমস্যা নয়—মিলনটাই সমস্যা। এত সংকীর্ণ সীমার মধ্যে সীমান্ত সংঘর্ষ লেগে থাকবারই কথা; কোনো বাউণ্ডারি কমিশন সে সংঘর্ষ নিবারণ করতে পারে না। তার উপরে ধরুন যদি প্রমীলা দেবী রক্ষকুল বধূর মতোই তেজস্বিনী রমণী হতেন এবং মেঘনাদী ভাষায় যখন তখন বলতেন—'আমি কি ডরাই কভু ইত্যাদি ইত্যাদি তাহ'লে আমি তো কোন ্ার তেমন তেমন বীর পুরুষকেও ঘর ছেড়ে মেঘলোকে আশ্রয় নিতে হ'ত। বিবহ তাপ বরং সওয়া যায় কিন্তু মিলনের দাহ কখনো কখনো মর্মান্তিক হয়ে ওঠে। আমার মতে মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মাঝে মাঝে বিরহ জিনিসটা কিছু অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ঠেলা-ঠেলি ঠাসাঠাসি গাদাগাদির যুগে আমাদের মধ্যযুগীয় বিরহী মনটা একেবারে চেপ্টে মরেছে। শুধু কি তাই? টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, টেলিভিশন এসে বিরহের যেটুকু বাকী ছিল তাও শেষ করেছে। মানুষ দুদণ্ড নিরালায় বসে একটু বিরহ যাতনা উপভোগ করবে তার পথ কোথায়? যন্ত্রণাও যে উপভোগ্য হয় সে কথা প্রেমিক মাত্রেই স্বীকার করবেন। যাক্ সে

কথা—বিংশ শতাব্দী ব্যবধানকে জয় করেছে দূরকে কাছে এনেছে। সেটাকে যদি এ যুগের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব বলে মেনে নিই তাহলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে বিংশ শতাব্দীর biggest casualty হচ্ছে বিরহ। তার প্রমাণ—যে বিরহ এককালে কাব্যের প্রধান উপকরণ ছিল এখন তা সাহিত্যরাজ্য থেকে নির্বাসিত।

আমি পূর্বে বলেছি যে বিরহ জিনিসটা মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর। মিলনের satiety দূর করবার জন্য বিরহের interlude প্রয়োজন। কিন্তু এখানে একটি জরুরী কথা বলবার আছে। বিরহ আমার কাছে অসহ্য। কারণ আমাদের কাব্যসাহিত্যে বিরহ নিয়ে বড় বেশি মাতামাতি কান্নাকাটি হয়েছে। বিরহের কবিতা মাত্রেই ছিচকাঁদুনে কবিতা। পড়লে বিরক্তি ধরে যায়। বুক ফাটা দীর্ঘশ্বাস আর চোখ ফাটা লোনা জল মিশিয়ে একটা বিতিকিচ্ছিরি পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা বিরহ নিয়ে বিষম বাড়াবাড়ি করেছেন। সংস্কৃত কাব্যেও বিরহের কথা যথেষ্ট আছে, কিন্তু সে কাব্যে বিরহের ভাষা সংযত যদিচ মিলনের ভাষা অসংযত। বৈষ্ণব কাব্যের ভাষা অমনিতেই অতি মাত্রায় গদগদ। তার ওপরে বিরহের বেলায় কবিরা নাকের জলে চোখের জলে মিশিয়ে বিরহ-কাব্যকে যা করে তুলেছেন সেটা এযুগেব পাঠকের পক্ষে রীতিমতো অস্বস্তিকর। আমাদের চিটে গুড়ের মতো একটা যেন চটচটে ব্যাপার। বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরহের কবিতা পড়ে অবধি বিরহের প্রতি আমার বিষম বিতৃষ্ণা জন্মেছে। এর সাংসারিক মূল্য যদিবা কিছু থাকে কাব্যিক মূল্য একটুও নেই। আমি যদি কবি হতাম তবে আর যাই লিখি বিরহ নিয়ে কক্ষনো কবিতা লিখতুম না। বীরবল বলেছিলেন বর্ষা সম্বন্ধে কবিতা লিখতে তাঁর ভরসা হয় না। কারণ কিনা ভরসা ছাড়া আর কোনো শব্দের সঙ্গে বরষার মিল নেই। বিরহ কথাটা যদিচ মিলন বিরোধী তথাপি বিরহের কবিতা

লিখতে বোধ হয় মিলের কোন অভাব হয় না; অভাব যদি হ'ত তাহলে বিরহ সম্বন্ধে এত অপর্যাপ্ত কবিতা কখনো লেখা হ'ত না।

কিন্তু একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথ এত বড় কবি হয়েও বিরহ নিয়ে মাতামাতি করেন নি; সেজন্য কবিগুরুর কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। আর তিনি যে বিরহকে ক্রমাগত পাশ কাটিয়ে গেছেন আমার মনে হয় সেটা বৈষ্ণব কাব্যেরই re-action। অথচ বাস্তব জীবনে বিরহের মূল্য তিনি স্বীকার করেছেন। বলেছেন, যে স্বামী-স্ত্রী সারাজীবন একসঙ্গে কাটিয়েছেন তাঁরা একজন আরেকজনকে সম্পূর্ণ জানতে পারেন নি। কাছের মানুষকে দূরে থেকে না দেখলে পুরোপুরি দেখা হয় না। মুখের কথায় যা বলা যায় না নীল খামের চিঠিতে তা অনায়াসে বলা যায়। যে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে জীবনে কখনো পত্র বিনিময় হয়নি তাঁদের মন জানাজানির মধ্যে অনেকখানি ফাঁক থেকে গেছে। ফাঁক মানেই ফাঁকি। অর্থাৎ একজন আরেকজনকে ফাঁকি দিয়েছেন। বিরহবর্জিত অবিচ্ছিন্ন দাম্পত্যজীবন অবৈজ্ঞানিক। মিলন এবং বিরহ এক বৃন্তে দুটি ফুল, একটি আরেকটির পরিপূরক। যেখানে সাময়িক বিরহ নেই সেখানে চিরমিলন চিরবিরহে পরিণত হয়।

সংস্কৃত কবি এবং বৈষ্ণব কবি উভয়েই স্বীকার করেছেন যে বর্ষা বিরহের ঋতু। আমি যে আজ হঠাৎ বিরহ সম্বন্ধে লিখতে বসে গেলুম শ্রাবণের ধারার সঙ্গে বোধ করি কোথাও তার যোগ আছে। বর্ষার অবিশ্রাম ঝমঝমানির মধ্যে চিত্ত আপনিই উদাস হয়ে যায়। চল্লিশ পার করে দিয়ে মনের নবীনতা এবং সরসতা বোধ করি অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছি তবু কিন্তু শ্রাবণের ধারাকে উপেক্ষা করতে পারিনে। বৃষ্টির রিমঝিম শব্দে উদাসী চিত্ত মেঘলোকে পথ হারিয়ে ফেলে। সংস্কৃত কবি মিথ্যা বলেন নি—মেঘলোকে ভবতি সুখীনাপি অন্যথা বৃত্তিচেতঃ। নিতান্ত সুখী ব্যক্তিরও চিত্ত উদাস হয়।

প্রিয়া যদি কণ্ঠলগ্না হয়েও থাকেন তথাপি ব্যবধান ঘোচে না—কিম্ পুনর্দূরসংস্থে ?—দূরে থাকলে তো কথাই নেই।

বন্ধু-বিরহ

আমার এক বিষম বদভ্যাস। একটা কোনো বিষয় নিয়ে লিখব ভাবি কিন্তু শুরুতেই এত অবান্তর কথা এসে যায়, শেষ পর্যন্ত বক্তব্য বিষয়টা আর বলাই হয় না। বহু দূর থেকে জল ঘোলাতে ঘোলাতে অগ্রসর হ'তে থাকি ; অনেক আঁটঘাট বেঁধে শেষটায় যখন মূল বিষয়টার দোরে এসে পৌচেছি—তখন দেখি আমার খাতার বরাদ্দ এক পাতা শেষ হয়ে গেছে। তার ফল হয়েছে এই যে আমার প্রত্যেকটি পাতা একেকটি প্রবন্ধের ভূমিকা মাত্র অর্থাৎ প্রবন্ধের মুখবন্ধ। জি কে চেস্টারটনের এক সমালোচক বন্ধু তাঁর সম্বন্ধে অনুরূপ অভিযোগ করেছিলেন। বলেছিলেন পড়তে পড়তে ঠিক যেখানটায় এসে ভাবি এবার আসল বক্তব্যটা শুরু হবে ঠিক সেখানটাতেই চেস্টারটনের প্রবন্ধ শেষ হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, আমি চেস্টারটনের কোনো গুনেরই অধিকারী নই ; কিন্তু তাঁর ঐ প্রধান দোষটি বেশ ভালো করে আমি আয়ত্ত করে নিয়েছি।

এই ধরুন গেলবারে আমি যে বিরহের কথা লিখেছি সে বিষয়ে লিখবার আমার উদ্দেশ্যই ছিল না। বিরহ কোন কালে আমার ধাতে সয় না। বোধ করি, বিরহ শব্দটা উচ্চারণ মাত্রেই আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়েছিল, সেজন্য যে কথা বলব বলে ভেবেছিলাম তা না বলে বিরহের উপরে খানিকটা ঝাল ঝেড়ে নিয়েছি। আসলে আমি যে বিরহের

কথা বলতে গিয়েছিলাম সেটা লৌকিক অর্থে আপনারা যা বোঝেন তা নয়—প্রিয়া বিরহ নয়, প্রিয়জনের বিরহ অর্থাৎ বন্ধু বিরহ। সম্প্রতি আমি বন্ধু-বিরহ-কাতর। যে বন্ধু-মজলিশটি বহুদিন ধরে আমার মনে রসের যোগান দিয়ে আসছিল ইদানীং সেটি হঠাৎ অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গেছে। আমাদের মধ্যে যিনি ছিলেন বয়সে সকলের চাইতে ছোট কিন্তু উৎসাহে সকলের চেয়ে বড়, তিনি সম্প্রতি বিদেশে চলে গিয়েছেন। গানে গল্পে হাস্যরসে তিনি একাই ছিলেন একশো। প্রমীলা দেবী পরিহাস করে ওঁকেই বলতেন আমাদের মৌচাকের মক্ষিরাণী। সত্যি বলতে কি একজন মানুষ যে কতখানি যায়গা জুড়ে থাকতে পারেন সে কথা আগে ভেবে দেখিনি, এখন প্রতি মুহূর্তে বুঝতে পারছি। আগের মতোই এখনও আমাদের মজলিশ বসে, কিন্তু রসালোচনা আগের মতো তেমন আর ফেনিয়ে ওঠে না। ভাঙা মজলিশে বসে ভাঙা গলায় আমরা বঙ্গভঙ্গের আলোচনা করি। সেই তর্কমন্থনে অমৃতের চাইতে বেশি ওঠে বিষ। আগে সেটি হ'তে পারত না। ঈষাণ কোণে পলিটিক্সের ঝড় উঠবার সম্ভাবনা দেখলেই আমাদের বন্ধুটি কৌতুকহাস্যে পলিটিক্সের তুফানকে উড়িয়ে ঘুরিয়ে দিতেন। হয়ত তর্কের মাঝখানে হঠাৎ রবীন্দ্র সঙ্গীতের এক কলি গেয়ে দিলেন, মজলিশের আবহাওয়াটা এক মুহূর্তে হাল্কা হয়ে যেত। আমরা তর্ক করতুম, তিনি তর্কের জট ছাড়াতেন। তাঁর অভাবে আমাদের আড্ডা নির্জীব হয়ে গেছে আর আড্ডা-অন্ত প্রাণ ইন্দ্রজিতের কি দশা হয়েছে বুঝতেই পারেন। হঠাৎ মনে হচ্ছে, আমার কথার ভাণ্ডার ফুরিয়ে গেছে। আমি তো আগেই বলেছি, আমি লেখক মানুষ নই, আমি কথক মানুষ। যিনি লেখক তিনি পাঠককে উদ্দেশ করে লেখেন। যিনি কথক তিনি শ্রোতাকে উদ্দেশ করে বলেন।

ইদানীং আমার কথা বলার উৎসাহ গেছে কমে তার কারণ আমাদের

প্রধান শ্রোতাটি অনুপস্থিত। সুখের বিষয়—'দেশ' পত্রিকার দৌলতে আমাদের আড্ডাটি এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের দেয়াল অতিক্রম করে দূরান্তরে বিস্তার লাভ করেছে। ইন্দ্রজিতের খাতা যাঁদের কাছে ভালো লাগে তাঁরা সকলেই আমাদের এই মজলিশের অন্তর্ভুক্ত। সেইজন্যই তো আমার মনোবেদনাটি আপনাদের কাছে নিবেদন করে চিত্তভার লাঘব করবার চেষ্টা করলুম।

আমাদের মজলিশের মধ্যে আমার সমবয়স্ক বন্ধু একজনও নেই। আমি উত্তর-চল্লিশ আর এঁরা প্রাক্-তিরিশের কোঠায়—বাইশ থেকে তিরিশের মধ্যে এঁদের বয়স। আমার চাইতে বেশি বয়সের লোকের সঙ্গে কোনো কালে আমার সম্পর্ক নেই, এমন কি সমবয়স্কদের সঙ্গেও না। সমবয়স্কদের এড়িয়ে চলি বলে তাঁরা আমাকে রীতিমতো অবজ্ঞা করেন। আমি পরিহাস করে বলতুম বড়দের সঙ্গে মিশি না; তার কারণ বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। কিন্তু এখন দেখছি ছোটদের পীরিতিই বালির বাঁধ। ওটা টেঁকসই জিনিস নয়। যে বয়সের লোকের সঙ্গে সাধারণত আমার বন্ধুত্ব সে বয়সে মানুষের স্থিতি-স্থাপকতা থাকে না। দুদিন এখানে, দুদিন ওখানে। এঁরা মোটেই নির্ভরযোগ্য মানুষ নয়। কেউ বা নতুন চাকরি নিয়ে, কেউ বা নতুন বিয়ে করে দল ছেড়ে চলে যান। এঁরা হয় পিতৃ-আজ্ঞা নয়ত পত্নী-আজ্ঞাবহ। আমার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তির আজ্ঞা যদি শ্রবণ করতেন, তবে চিরকাল সুখে আড্ডা দিয়ে কাটাতে পারতেন। কিন্তু সংসারে সদুপদেশ তো কেউ শুনতে চায় না।

আমার যা বয়স, তাতে নিতান্ত স্থবির না হলেও আমি এখন এক রকম স্থিতি লাভ করেছি। আমার মনটা কতক পরিমাণে গতিশীল হলেও দেহটি এমন স্থিতিশীল যে, যখন তখন স্থানচ্যুত হবার কোন আশঙ্কা নেই। তার প্রমাণ আমাদের আড্ডার সাবেক সভ্যদের মধ্যে

আমি এখন একলা। আর সবাই নতুন। টেনিসনের ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীটির মতো আর সবাই আসে আর যায়—কিন্তু I go on for ever. একেকজন যখন যায় অনেকখানি জায়গা ফাঁকা করে দিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর বিধানে যেমন একটি sense of justice আছে আড্ডার বিধানেও তাই। Natureএর ন্যায় আড্ডাও abhors vacuum. শূন্য স্থান শূন্য থাকে না। নতুন আরেকজন এসে ফাঁকটুকু ভর্তি করে।

এঁদের অনেকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অতি স্বল্পস্থায়ী। আড্ডাজাত যে বন্ধুত্ব কালের মাপে তার গুরুত্ব নয়। এ জাতীয় বন্ধুত্ব অতি দ্রুতগামী, সাতদিনে সাত বছরের পথ অতিক্রম করে। দ্রুতগামী বলেই এর স্বল্পস্থায়িত্বে কিছু এসে যায় না। এজন্য যাঁরা অল্পদিনের জন্য এসেছেন এবং চলে গিয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার কোনই নালিশ নেই। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা যা দিয়েছেন, তার তুলনা হয় না। এঁদের অল্পবয়সের যাদু আমার মনকে নবীন এবং সরস করে রেখেছে। আর কিছু না হোক্ অন্তত এই কারণেও এঁদের কাছে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

অনেক দেখে বুঝেছি, সংসারে যত রকম সম্পর্ক আছে, তার মধ্যে বন্ধুত্ব সর্বশ্রেষ্ঠ। রক্তসম্পর্কিত আপনজনের কাছে যে স্নেহভালবাসা পাই, সেটা অনেকটা পৈত্রিক সম্পত্তির মতো আপ্‌সে মিলে যাওয়া। কিন্তু নিঃসম্পর্কিত বন্ধুজনের কাছে যে ভালবাসা পাই, সেটা আমার নিজ গুণে অর্জিত। তার মূল্য অনেক বেশী। লোকে যখন বলে আমার বন্ধুভাগ্য ভালো, তখন আমি মনে মনে খুশি হই,—এই ভেবে যে, শুধু আমার বন্ধুরাই ভাল মানুষ নয়, আমিও লোকটা ভালো, নইলে অত বন্ধু জুটবে কেন?

স্বাধীনতা দিবস

আমাদের নিজেদের আড্ডা ছেড়ে দৈবাৎ কখনো যদি অন্য কোনো আড্ডায় গিয়ে পড়ি তাহলে আমার যে কি দুর্দশা হয় কি বলব—ঠিক যেন ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো। এই সেদিন এ রকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। যেখানটায় গিয়ে পড়েছিলাম সেটা এক বিরাট আড্ডা। আমরা অল্প জলের অধিবাসী, গভীর জলে গিয়ে অমনিতেই থৈ পাই না। তার উপরে আবার গিয়ে দেখি ওখানকার অধিকাংশ লোক বিষম বিদ্বান। বিদ্বান ব্যক্তিরা যেমন ভালো বক্তা তেমন খারাপ শ্রোতা। তাঁরা সবাই বলেন, কেউ শোনেন না। আড্ডা জিনিসটা যদিচ খাঁটি বাঙলা দেশের জিনিস তথাপি দেখা যাচ্ছে এ যুগের বাঙালীরা ইংরেজি কেতায় বক্তৃতা করতে শিখেছেন, কিন্তু বাঙালী রীতিতে আড্ডা দিতে ভুলে গিয়েছেন। আড্ডার প্রাণশক্তি হ'ল হাস্যরস। বিদ্বানের আড্ডায় হাস্যরস থাকে না, কিন্তু সবটা মিলিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর হয়ে ওঠে।

আলোচনা শুরু হয়েছিল স্বাধীনতা দিবস নিয়ে; কিন্তু গোড়াতেই তর্ক উঠল স্বাধীনতা মানে কি, স্বাধীনতা এবং freedom-এর মধ্যে কি তফাৎ ইত্যাদি। একজন বললেন, আমরা যা পাচ্ছি সেটা স্বাধীনতাও নয় freedomও নয়, সেটা হচ্ছে independence. আরেকজন বললেন এর কোনটাই না বলে একে শুধু ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান বলাই বিধেয়। আড়াই ঘণ্টা ধরে এমন বিষম তর্ক চলল এবং প্রত্যেকটি কথার এমন সূক্ষ্ম মর্মার্থ প্রকাশ পেতে লাগল যে সে তর্কের গোলক ধাঁধায় পড়ে আমার ইংরেজি বাঙলার সামান্য যে জ্ঞানটুকু ছিল তাও তালগোল পাকিয়ে গেল। তা ছাড়া স্বাধীনতা যে কি বিষম গোলমেলে ব্যাপার

সেটা ওখানে গিয়েই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম। স্বাধীনতার এসব ভাষ্যকারেরা ঘরে বসে আড়াই ঘণ্টা ধরে তর্কযুদ্ধে যা হয়রাণ হলেন গত পঁচিশ বছর ধরে যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছেন তাঁরাও বোধকরি ততখানি হয়রাণ হননি।

বহু তর্কের পর স্থির হল যে স্বাধীনতা আমরা পাইনি—১৫ই তারিখ থেকে স্বাধীনতার পথে সবে আমাদের যাত্রা শুরু হ'বে। ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখলেই কৌতুকটা বুঝতে পারবেন। ভদ্রলোক এক কথায় ষাট বৎসরের ইতিহাসকে একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। কংগ্রেস এতদিন যে লড়াই করল তাতে আমরা স্বাধীনতার পথে একটুও অগ্রসর হইনি। স্বাধীনতার এঞ্জিনটা এখনও ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ১৫ই তারিখে স্বাধীনতার স্টীম ভর্তি করে নিয়ে এঞ্জিনটা হঠাৎ পুরোদমে হুস হুস করে চলতে শুরু করে দেবে।

যাঁরা স্বাধীনতা কথাটায় আপত্তি করছিলেন তাঁরা বলতে চান দেশের লোকের যখন পেটে অন্ন নেই, গায়ে বস্ত্র নেই, মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই তখন একে আমরা স্বাধীনতা বলব না। শুনুন কথা, দু'শ বৎসর ধরে আমরা অন্নহীন, বস্ত্রহীন, বাসগৃহহীন আজ স্বদেশী শাসন চালু হ'বামাত্র ১৫ই তারিখে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দৈন্যদশা এক মুহূর্তে ঘুচে যাবে, এ আমরা কেমন করে আশা করতে পারি? বিয়াল্লিশ দিন জ্বরে ভুগবার পর যে রোগীকে আজ ভাত পথ্য দেওয়া হ'ল সে যদি ডাক্তারকে বলে তার রোগ সারেনি, কারণ কিনা সে ক্রস-কান্ট্রি রেস দিতে পারছে না—সেটা কি নিতান্তই আবদারের মতো শোনাবে না? স্বদেশী মন্ত্রীদের হাতে যে আলাদিনের ল্যাম্প নেই সে কথাটা কিছুদিন অন্তত স্মরণ রাখা কর্তব্য। এতদিন যে দুঃখ, অক্ষমতার দরুণ সহ্য করেছি এখন দুটা বছর না হয় ধৈর্য এবং উদারতার সঙ্গেই সহ্য করলাম। দুশো বৎসরের এই দৈন্যদশা যত শীঘ্র ঘোচে

সেজন্য অবশ্যই নিরলস চেষ্টার প্রয়োজন। সেটা সমালোচনার দ্বারা হ'বে না সহযোগিতার দ্বারা হ'বে। স্বদেশী মন্ত্রিমণ্ডলীর কর্মপন্থা ধৈর্য ধরে লক্ষ্য করুন। যে মুহূর্তে তাঁরা বিপথে যাবেন সে মুহূর্তে নিশ্চয় বাধা দেবেন।

একথা অবশ্য-স্বীকার্য যে, দেশী মন্ত্রী হ'লেই স্বদেশী শাসন হয় না। দেশী মন্ত্রী আগেও অনেক হয়েছেন, দুর্দশা বেড়েছে বই কমেনি। এককালে আমরা বলেছি Good government is no substitute for self-government. সুশাসনের চাইতে স্ব-শাসন ভালো। সে যুগ গিয়েছে। এখন বলব Self-Government is no substitute for good Government. স্বদেশী দুঃশাসনদের কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না। এই সূত্রে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রি-মণ্ডলী স্বদেশী শাসনের যে কাঠামোটি তৈরি করেছেন সেটি মোটেই আশাপ্রদ নয়। সেই অতি পুরাতন ইস্পাতের ফ্রেমের উপরে একটু শুধু কংগ্রেসি সোনার পাত লাগানো। অর্থাৎ কিনা সোনার পাথর বাটি। একদিকে সিভিল সার্ভিসের Steel frame অপর দিকে পুলিশ সার্ভিসের pig iron frame—এই দুই-এর সাহায্যেই এতকাল বৈদেশিক শাসন বলবৎ ছিল। যেসব ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলনকে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল কংগ্রেসের কাছ থেকে আজ তারাই পেয়েছে সর্বপ্রথম পুরস্কার। সেদিনের পঞ্চম বাহিনীকে কংগ্রেস তার প্রধান বাহিনী করেছেন, শুধু বাহিনী নয় করেছেন বাহন। এর চাইতে দুর্দৈব আর কি হ'তে পারে। Indefendence makes strange bedfellows.

এই যদি স্বদেশী গভর্নমেন্টের রকম হয় তবে এর রং বদলালেও ঢং বদলাবে না। বাঙলার সরকারে যা দিল্লীর দরবারেও তাই। সেখানেও আই সি এস আর ব্রিটিশ প্রতিপালিত নাইটেদের প্রাধান্য। অথচ যে

হরিবিষ্ণু কামাথ দেশের আহ্বানে আই সি এস পদ ত্যাগ করেছিলেন তিনি তো ও৭ মধ্যে নেই। কেন, তিনি কি কেন্দ্রীয় কিংবা কোন প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী হ'তে পারিতেন না ? পুলিশের চাকুরিতে I. N. A. officerদের নিযুক্ত করা যেত না ? Experience-এর দোহাই দিয়ে পুরোনো আমলকেই বজায় রাখা হযেছে। অত্যাচার, অবিচার, ঘুষ, চুরি, কালাবাজারি—এই তো পুবাতন Administration-এর experience. সেই experience আমাদের কোন্ কাজে লাগবে। নাঃ, থাক স্বদেশী শাসনের স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে অনেক বিদ্রূপ এসে গেল। বলেছিলেম বিরূপ সমালোচনার দ্বারা কোন লাভ হবে না। কিন্তু স্বভাব যায না মলে, এমন কি স্বাধীন হলেও। স্বাধীনতা-প্রাপ্তিতে এক-আধটু স্বাধীন মত ব্যক্ত করবার লোভ কিছুতেই কাটাতে পারলুম না।

সোনার কাঠি

আজ ১৫ই আগস্ট। স্বাধীন ভারতের প্রথম সূর্যোদয় দেখলুম, স্বাধীন দেশের বাতাস প্রাণভরে বুকে টেনে নিলুম। জীবনে কোনোদিন জ্ঞাতসারে কোনো পুণ্য কাজ করিনি তথাপি জীবনের চরম পুরস্কার হাতের কাছে এল। যাঁদের সুকৃতির পুণ্যফল আমরা অকৃতীরা লাভ করলুম তাঁদের পায়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি।

রূপকথার মতোই রোমাঞ্চকর। স্বাধীনতার সোনার কাঠি ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতে দু'শ বছরের ঘুম থেকে রাজকন্যা জেগে উঠেছে। যে রাজপুত্র সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দু'শ বছরের ঘুম ভাঙালেন সর্বাগ্রে তাঁকে প্রণাম করি। ভিখারীর বেশে আমাদের রাজপুত্র—দরিদ্রের কুটীরে আর ভাঙ্গি বস্তিতে তাঁর নিঃশব্দ পদসঞ্চরণ। যেই দিনটিতে তাঁর সহকর্মীরা সগৌরবে প্রবেশ করেছেন গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদে ঝাণ্ডা উড়িয়েছেন গগনচুম্বী প্রাসাদ শীর্ষে সেইদিনে তিনি গিয়েছেন বেলেঘাটার পথের প্রান্তে। আগে ভাবতুম দেশ যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন আমরা তাঁকে কোথায় বসাব, কোথায় রাখব। এখন দেখছি সবচেয়ে বড় সম্মানের আসনটি তাঁরই জন্য রাখা ছিল। "সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ।" জাতির সব চাইতে বড় মহোৎসবের দিনে আর কোনো স্থানেই তাঁকে মানাত না—পথের মানুষ পথেই তাঁর স্থান—সবার পিছে, সবার নিচে, সাবহারাদের মাঝে।

আমি সম্বৎসর এত আজে বাজে কথা বলি, আমার মুখে গম্ভীর কথা মানায় না—ভূতের মুখে রাম নামের মতো শোনায়। কিন্তু আজকে মনের ভাবটা যা হয়েছে কোনো রকমেই তা প্রকাশ করতে পারছিনে—না গম্ভীর সুরে না হাল্কা ঢং এ। এ যে কি অত্যাশ্চর্য

অনুভূতি কি বলব! মাথায় যে কটা পাকা চুল ছিল মনে হচ্ছে সে কটা নিশ্চয় আবার কাঁচা হয়ে যাবে। মূককে বাচাল হ'তে শুনেছি। কিন্তু আমার মতো বাচাল মানুষও বিস্ময়ে সম্ভ্রমে স্তব্ধ। উদ্বেল জনতার সাগর সঙ্গমে দাঁড়িয়ে জীবনে আজ প্রথম তীর্থদর্শন করলুম। ভাবলে আশ্চর্য লাগে আজকে রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট দেশ এবং জাতির জীবনে কত বড় পরিবর্তন ঘটে গেল অথচ বিশ্বপ্রকৃতির কি উদাসীন মূর্তি! সেই আকাশ, সেই বাতাস, সেই সূর্যালোক, এতটুকু তার পরিবর্তন নেই। উদাসীন প্রকৃতির চোখের পাতাটুকু পর্যন্ত নড়ল না। ওদিকে যে মানুষটা একদিন আগেও ছোরা হাতে খুন করেছে সে আজ ছোরা ফেলে দিয়ে আতর বিলোচ্ছে, পিস্তলের বদলে গোলাপ জলের পিচকিরি হাতে ছুটছে। বলছে, ভাই যদি ভায়ের বুকে ছোরা মারতে চায় তবে তার স্থান বেলেঘাটা নয়, রাজাবাজার নয়। মানুষের প্রকৃতিতে আর বিশ্বপ্রকৃতিতে এখানেই তফাৎ বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টির শিকলে বাঁধা; তা থেকে তার মুক্তি নেই, কিন্তু মানবপ্রকৃতি যে কোনো অবস্থা থেকে মুহূর্তে মুক্তিলাভ করে।

যে কাজ বহু নেতা মিলে করতে পারেননি স্বাধীনতা তাই করেছে। এখনও আমরা স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করিনি। আমাদের নবজাত স্বাধীনতার বয়স মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এখনও ওটা ধরাছোঁয়ার অতীত একটা কথা মাত্র, কিন্তু open sesame-এর মতো মানুষের মনের কপাট গিয়েছে খুলে। দেশের মুখ রক্ষা হয়েছে। আমরা বরাবর বলে এসেছি তৃতীয় পক্ষ ইংরেজ সরে দাঁড়াক—আমাদের ঘরোয়া বিবাদ আমরা নিজেরাই মিটিয়ে নেব। হিন্দু মুসলমানের ঝগড়া দুই সতীনের ঝগড়া। ইংরেজ আবার একজনকে করেছে সুয়োরাণী আরেকজনকে দুয়োরাণী। এখন ইংরেজ গেছে, দুই সতীন আর কি নিয়ে ঝগড়া করবে?

হিসেব খতিয়ে দুজনেই দেখেছে ইংরেজ শুধু দেনাই রেখে গেছে—liabilities without assets. রেখে গেছে শুধু পেটের খিদে। পেটের খিদে নিয়ে ঝগড়া করা পোষায় না—এই একটি কথা বুঝতে পারলে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ একদিনে ঘুচে যাবে। ঝগড়া লাগাবার মতো তৃতীয়পক্ষ অবশ্য অন্য দেশেও আছে। এদের পেটের খিদে নেই, কিন্তু নেতৃত্বের খিদে আছে। এদের বিশ্বাসং নৈব কর্তব্য। ইংরেজের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে, কিন্তু নেতার হাত থেকে রক্ষা করবে কে? 'স্বাধীন ভারতের' ওটাই হবে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

আজ হঠাৎ যে মিলনটা হয়েছে সেটা ধোপে টিকবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ এর মধ্যে লজিকের চাইতে ম্যাজিকের অংশ বেশি। কি করব আমাদের পাপ মন, অবিশ্বাসী মন—আমরা miracleএ বিশ্বাস করি না, যদিচ গান্ধীজী বলেছেন—the days of miracle are not yet gone. অবশ্য গান্ধীজীর নিরলস সাধনা সার্থক হউক, এই প্রার্থনাই করি।

এই সূত্রে আরেকটা কথা মনে আসচে। পরাধীন ভারতে যাঁরা ছিলেন নেতা, স্বাধীন ভারতে তাঁদেরই নেতৃত্ব করতে হবে এমন কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই। স্বাধীনতা অর্জন করা এক কথা, স্বাধীনতা রক্ষা করা আরেক কথা। দুটোর দুই টেকনিক্। ইংলণ্ডের যুদ্ধকালীন নেতা হিসাবে চার্চিল ছিলেন indispensable, কিন্তু শান্তিপর্বে রাজনীতি থেকে তাঁর মহানিষ্ক্রমণ। ভারতবর্ষেও সেটি হ'লে মঙ্গল হবে। বর্তমান নেতাদের ভুল-ভ্রান্তির ফলে আমাদের রাজনীতিতে যে সব জট পাকিয়েছে, ভবিষ্যতের নেতারা সে সব জট ছাড়াবেন। অর্থাৎ সে সব নেতাদের approachটা হবে ধর্ম-নিরপেক্ষ। এতদিন জাত আর ধর্ম নিয়ে মানুষে মানুষে লড়াই হয়েছে, এখন হবে রাষ্ট্রে

রাষ্ট্রে। হিন্দু স্কুল কিংবা ইসলামিয়া কলেজ যেমন বিদ্যা-মন্দিরের অপমান, হিন্দু রাষ্ট্র মুসলিম রাষ্ট্র তেমনি রাষ্ট্রনীতির অপমান।

না, এ নৈরাশ্যের সুরটা আজ না আনলেই ভালো হতো। বলেছি তো আমার পাপ মন, সেজন্যই যত রকম সন্দেহ কেবলি মনের কোণে উঁকি মারছে।

ঐ যে আমাদের পাড়ার ছেলেমেয়েরা গান ধরেছে—তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী। মনটা নেচে উঠছে। না, অবিশ্বাস আর নয়। অবিশ্বাস পরাজয়ের লক্ষণ, বিশ্বাসেই শক্তি।

১৫ই আগষ্টের আনন্দটা আজ কদিন ধরে ধীরে আস্তে রসিয়ে উপভোগ করছি। ইচ্ছে করেই দেরি করে আপনাদের দরবারে পেশ করলুম। হয়তো দরকার ছিল না। কিন্তু এমনি বদভ্যাস হয়ে গেছে আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে উপভোগ করতে না পারলে এখন আর কিছুতেই রস পাই না।

মেজাজ

আমি মানুষটা যে বদমেজাজি, সে খবর আপনারা রাখেন কিনা আমি জানিনে। কিন্তু যাঁরা আমার নিত্য সহচর অর্থাৎ যাঁদের সঙ্গে আমাকে সারাক্ষণ সাম্প্রতিক রাজনীতি কিংবা আধুনিক সাহিত্য নিয়ে তর্ক করতে হয় তাঁরা জানেন যে, আমার মেজাজ যখন-তখন বিগড়ে যায় এবং গোল্ডস্মিথের ইস্কুল মাষ্টারের মতো আমি তর্কে হেরে গেলেও তর্ক করতে ছাড়িনে। আর শুধু কি তর্ক? এমনিতেই কারণে-অকারণে যখন-তখন আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। চায়ে চিনি বেশি হলে (আজকাল অবশ্য এর উল্টোটাই হয়) মেজাজ খারাপ হয়, টিপ টিপ বিষ্টিতে মেজাজ খারাপ হয়, গদ্য-কবিতা পড়ে মেজাজ খারাপ হয়, তার উপরে নেতাদের স্টেটমেণ্ট পড়লে তো কথাই নেই। এহেন লোকের সঙ্গে তর্ক করা বড় কঠিন ব্যাপার। অবশ্য আমার বন্ধুরাও এ বিষয়ে বড় আদর্শ ব্যক্তি নন। মেজাজ ঠিক রেখে তর্ক করা একটা বড় রকমের আর্ট। বাঙালী চরিত্রে ঐ গুণটি বড়ই বিরল। বাঙলা দেশ নব-ন্যায়ের দেশ অর্থাৎ কিনা তার্কিকের দেশ আর তর্ক করা মানেই মেজাজ খারাপ করা। তাছাড়া বাঙালী জাতটি ডিসপেপটিক জাত এবং ডিসপেপটিক লোক মাত্রই বদমেজাজি হ'তে বাধ্য। আমি স্বয়ং তার দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ বাঙালীকে ঠাট্টা করে বলেছেন—তৈল ঢালা স্নিগ্ধ তনু—দুঃখের বিষয়, সে রকম স্নিগ্ধ তনু বাঙালী এ যুগে বড় একটা দেখা যায় না। ঘি এবং তেলের বাজারে যে পরিমাণ ভেজাল চলছে, তাতে তনু মন প্রাণ সব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ঘৃতের বিকৃতির সঙ্গে যকৃতের বিকৃতি এবং তৎসঙ্গে বাঙালীর প্রকৃতিরও বিকৃতি ঘটেছে।

তার ফলে এখন সমগ্র জাতিটি বদমেজাজী হয়ে উঠেছে। বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে—বাঙালীকে কিছুদিন একটু ভেজালহীন ঘি তেল খেতে দিন, কাঁকরবিহীন চাল আর তেঁতুলবিচিহীন আটা দিন দেখবেন দুদিনে বাঙালীর মেজাজের যথেষ্ট উন্নতি হয়ে গেছে। খাদ্যের ভেতরে কিঞ্চিৎ পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থ না থাকলে মানুষের মনে স্নেহ দয়া মায়া আসবে কোত্থেকে? সুখের বিষয়, আমাদের প্রধানমন্ত্রী গোড়াতেই balanced diet-এর আশ্বাস দিয়েছেন। Diet-এর balance রক্ষা হলেই মেজাজেরও balance রক্ষা হবে। চাই কি হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ পর্যন্ত থেমে যেতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন কি শুধু মুখের বাক্যে হবে? পেটের খাদ্যে মিলন হলে তবেই সেটা টেকসই হবে। পেটে খেলে তবে ধর্মে সইবে, নইলে ধর্ম-বিরোধ কেউ থামাতে পারবে না।

অন্য প্রদেশের বেলায় যাই হোক বাঙলা দেশের হিন্দু-মুসলমান যে ভাই-ভাই, সে কি নতুন করে আজ বলতে হবে? শক হুন দল পাঠান-মোগল এক দেহে হ'ল লীন—বাঙলা দেশের মতো এটি এমন আর কোথায় হয়েছে? হিন্দু-মুসলমান আর কোথায় এক ভাষায় কথা বলে? আরে ভাই, এই যে মেজাজের কথা বলছি—এই শব্দটা এল কোত্থেকে? এটি তো আরবী শব্দ। আর মেজাজ মানে কি শুধুই বদমেজাজ? মেজাজ বলতে বুঝি বাদশাহী মেজাজ। ছোট্ট একটি শব্দের মধ্যে কি বিরাট ব্যাপ্তি! এর একটি প্রতিশব্দ অন্য ভাষায় খুঁজে বের করুন তো। ইংরেজি temper অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত। ইংরেজরা temper হারায়, আমাদের মেজাজ কখনো হারায় না বা খোয়া যায় না। আমাদের মেজাজ খুশ হয়, মেজাজ শরীফ হয়। আর আমাদের মেজাজ একবার যদি বিগড়োয় তখন কাছে আসুক দেখি temper-হারানো ইংরেজ! দেখি কতক্ষণ টিকতে পারে?

আমাদের মেজাজের ধাক্কায় temper তো temper ওদের empire পর্যন্ত ভেঙে গেল।

সত্যি বলতে কি মেজাজ শব্দটার একটা epic significance আছে। শব্দটা উচ্চারণ মাত্র আমার মন এক মুহূর্তে চলে যাচ্ছে নবাবী আমলে। চোখের সুমুখে স্পষ্ট দেখছি—বাদশাহ, আমীর, ওমরাও, দাসী বাঁদী, অনেক অনেক বেগম, সুসজ্জিত হারেম আর হরেক রকম রঙীন পানীয়। তাই বলে আশা করি, আমার চরিত্রের প্রতি আপনারা কটাক্ষ হানবেন না—বাদশাহী মেজাজ সময়ের স্রোতে বহুল পরিমাণে শোধিত হয়ে এসেছে। সময়ের সঙ্গে আমাদের মেজাজ গিয়েছে বদলে। ফলে আমার হারেমে একটিমাত্র বেগম—আর গণতন্ত্রের যুগে দাসী বাঁদীর কথা না বলাই ভালো। বলতে গেলে দেশব্যাপী ধর্মঘট হবার আশঙ্কা আছে।

তবু মেজাজ কথাটার সঙ্গে একটা ক্লাসিক ঐশ্বর্য যুক্ত রয়েছে। বলতে পারি, আভিজাত্যের অন্য নাম মেজাজ। মেজাজের জোরেই রাজা সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে, মদ্যপ মাতাল কপর্দকহীন হতে পারে—এমন কি গরীব হাতি পর্যন্ত পুষতে পারে। এই আমার নিজের কথাই ধরুন না কেন। এই যে মাঝে মাঝে 'দেশ' এর পাতা থেকে ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হচ্ছেন—কিছু মেজাজ তার অবশিষ্ট আছে বলেই তো। জানি এতে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে, তার চাইতে বড় কথা আত্মপ্রচারের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি—তবু আমার সর্বজনপ্রখ্যাত কুঁড়েমিয় মেজাজটি বজায় থাকছে তো! যদিচ অভিজাত সম্প্রদায়ের লোক নই, তথাপি মেজাজের জোরে খানিকটা আভিজাত্য রক্ষা করবার চেষ্টা করছি।

আমি মেজাজকেই বলেছি আভিজাত্য। কিন্তু ফ্যাশনেবল পাড়ার যে আভিজাত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সেটা আর সব জিনিসের মতো বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। সত্যিকারের যে মেজাজী

আভিজাত্য সেটা নিউ মার্কেটে কেনবার সামগ্রীই নয়, অনেক পুরোনো আমলের জিনিস। মেজাজের সম্পর্ক হচ্ছে মগজের সঙ্গে। সেজন্যই জিনিসটা দামী। যাক্, তত্ত্বকথা বাদ দিয়ে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই গণতন্ত্রের যুগে মেজাজী আভিজাত্য চলবে কিনা। আমি বলি আলবৎ চলবে। তার কারণ, গণতন্ত্র তো আভিজাত্যবিরোধী নয়—অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরোধী। ক্ষুদ্র অভিজাতসমষ্টির বিনষ্টিতে আপামর সকল মানুষের মনে যেদিন আভিজাত্য বোধ সঞ্চারিত হবে অর্থাৎ প্রত্যেকটি মানুষ যখন আপন আপন মেজাজ মত চলতে পারবে, সেদিন যথার্থই সমাজের মেজাজ সুস্থ হবে, শান্ত হবে।

ফরমায়েসি লেখা

ইদানীং আমি রাজনীতি নিয়ে বড় বেশি আলোচনা করেছি। কেউ কেউ তাতে আপত্তি করে বলছেন, এমনিতেই উঠতে বসতে চলতে ফিরতে রাজনীতির জ্বালায় আমরা অতিষ্ঠ—দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক যাই ধরি, তাই রাজনীতি-কণ্টকিত। তার উপরে আপনারা যাঁরা বাজে কথা লেখেন, তাঁরাও যদি হঠাৎ কাজের কথা বলতে শুরু করেন, তবে আমরা যাই কোথায়? আমার বন্ধুদের প্রতি এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। রাজনীতি জিনিসটা ক্রমেই বড় গুরুপাক হয়ে উঠছে। আগে এক রকম ছিল ভালো। ইংরেজের উদ্দেশে দুটো কড়া রকমের গালাগাল দিতে পারলেই মোটামুটি রাজনীতির জ্ঞান প্রকাশ পেত। জিনিসটা স্বাস্থ্যের পক্ষেও অনুকূল ছিল। ভূরিভোজনের পরে তাম্বুল চর্বণের সঙ্গে ইংরেজকে দুটো গাল দিতে পারলে হজম ক্রিয়াটা সহজ হ'ত। কিন্তু ইংরেজ গিয়ে অবধি আমাদের রাজনীতি যে আকার ধারণ করেছে, সেটা না হজমের পক্ষে ভালো, না মেজাজের পক্ষে।

এ কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য যে, আমি নিজেও কাজের কথার চাইতে বাজে কথাকে ঢের বেশি মূল্য দিয়ে থাকি। উঁচু দরের কথা অর্থাৎ বাজে কথা সব সময়ে আয়ত্তে আনতে পারিনে বলেই বাধ্য হয়ে মাঝে মাঝে আমাকে নীচু দরের কথা অর্থাৎ কিনা রাজনীতির আশ্রয় নিতে হয়। মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা শুধু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে নয়, সাহিত্য শাস্ত্রেও রীতি। একজন নেতৃস্থানীয় ইংরেজ বলেছিলেন—Politics is the last resort of a scoundrel. আর আমার বেলায় যা দাঁড়িয়েছে, তাতে দেখছি—Politics is the last resort of a

spent-up writer. নিত্য নিত্য বাজে কথা আমি কোথায় খুঁজে পাই, বলুন! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সহজ কথা নয়তো সহজ বলা। আপনারা চান বাজে কথা, সেটা প্রায়ই বাঁকা কথা, কাজেই বাজে কথা বলা আরও দুঃসাধ্য ব্যাপার। বাজে কথাকে রসগ্রাহ্য করে পরিবেশন করা অতিশয় উঁচুদরের আর্ট। আলু-পটলের ডাল্‌না রাঁধতে পারেন সবাই, কিন্তু সাত-পাঁচ মিশিয়ে ছেঁচকি রাঁধতে পারেন শুধু 'ওস্তাদ' রাঁধুনি। আড্ডার আসরে আমি বাজে বকুনিতে মহা ওস্তাদ, কিন্তু দেখেছি, যে কথা জিবের ডগায় অনায়াসে আসে, কলমের ডগায় তার প্রকাশ অতিশয আড়ষ্ট, তখন তার রূপ যায় বদলে। কালির কালিমা মেখে কথাগুলির মূর্তি কিম্ভুত কিমাকার হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আমি যে দরের বলিয়ে, সে দরের লিখিযে নই।

আমার বন্ধুরা মাঝে মাঝে আমাকে এটা ওটা নিয়ে লিখবার ফরমাযেস করেন—অর্থাৎ এক-আধটা 'বাজে' বিষয়বস্তু বাৎলে দেন। তাঁদের ফরমায়েস অনুযায়ী এক-আধটা বিষয়ে আমি লিখেওছি, জানিনে সেটা তাঁদের পছন্দসই হয়েছে কি না। আমার একজন শ্রদ্ধেয় বন্ধু আমাকে মেজাজ সম্বন্ধে লিখতে বলেছিলেন, তাঁরই অনুরোধে গত সপ্তাহের খাতায় আমি কিঞ্চিৎ মেজাজ প্রদর্শন করেছি। ফরমায়েসি লেখা ঠিক আমার ধাতে সয় না। নিজের দিক থেকে তাগিদ না এলে অপরের তাগিদে লেখা বড় কঠিন হয়ে ওঠে। ফরমায়েসি জিনিস লিখতে গেলে প্রমথ চৌধুরী বর্ণিত ফরমায়েসি গল্পের ঘোষালের মতো দুরবস্থা হয়। মনিবের ফরমাস মতো কেবলই গল্পটার কান মোচড়াতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ছড়া কিংবা পদ্য লিখবে কোন লোকের ফরমাসে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয়কো তেমন শর্মা সে। তা, আপনারা যাই বলুন, আমিও তেমন শর্মা নই। বরং রবীন্দ্রনাথকেই

বহু লোকের ফরমাসে বহু পদ্য লিখতে হয়েছে, কারো বা বিবাহ, কারো বা মৃত্যু উপলক্ষে। জলযোগের দই থেকে শুরু করে বাটা কোম্পানির জুতো পর্যন্ত বহু পদার্থের গুণগান তাঁকে করতে হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। তিনি ছাই ধরলেও সোনা হয়ে যায়, নিতান্ত বিজ্ঞাপনী ইস্তাহারও সার্থক সাহিত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবার আমি তাঁকে অ্যান্টিম্যালেরিয়াল সোসাইটির সভায় বক্তৃতা করতে শুনেছিলাম। সে বক্তৃতা শুনে যে বাঙলা দেশে ম্যালেরিয়া নিবারণ হয়নি—সে কথা আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কিন্তু সাহিত্য-পিপাসুদের তৃষ্ণা নিবারণ হয়েছিল।

'বাজে' বিষয় নির্বাচনে সহৃদয় পাঠকরাও আমাকে মাঝে মাঝে সাহায্য করেছেন। কিছুদিন আগে আমার একজন পাঠক অনুরোধ জানিয়েছেন, বাঁশের বাঁশী সম্বন্ধে কিছু লিখতে। জিনিসটা সময়োপযোগী। গত পঁচিশ বছর ধরে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের নিরন্তর লড়াই চলছিল। ভেবেছিলাম, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে এখন দেশে শান্তি স্থাপিত হবে—ইংরেজিতে যাকে বলে piping times of peace. এখন আর কোন কাজ নয়—বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশী কাটবে সকালবেলা। দুঃখের বিষয়, আমি বাঁশী বাজাতে জানিনে, কিন্তু পত্রলেখক বন্ধুটি জানেন, সে খবর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, আমাদের সাহিত্যে বাঁশের বাঁশীর স্থান কোথায় এবং কতটুকু। বাঙালা দেশ বৈষ্ণব কাব্যের দেশ। সে কাব্যের নায়ক বংশীধারী। যাকৃগে, ওসব পুরোনো কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু বলব যে, বাঁশীর যে সুর সেইটিই সাহিত্যের মূল সুর। এ বিষয়ে আমি রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষী মানতে পারি। রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর প্রথম বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আজকে যখন

বক্তৃতা করতে আসছিলুম, তখন আমাদের পাশের বাড়িতে বিয়ের সানাই বাজছিল। বলেছিলেন, সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি যা বলতে চান, তা সমস্তই ঐ সানাইএর সুরে প্রকাশ পেয়েছিল। সেদিন শ্রোতারা যদি সেই সানাই শুনতেন, তবে আর রবীন্দ্রনাথকে অত বড় বক্তৃতা করতে হ'ত না। আমি অন্তত এইটুকু বলতে পারি, আমি যদি পাঠক বন্ধুটির মতো বাঁশী বাজাতে পারতুম, তবে ইন্দ্রজিতের খাতা লিখে কক্ষনো সময় নষ্ট করতুম না। আমি অকেজো মানুষ। জীবনে আমার একটিমাত্র সাধ—সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত, আমি শুধু ছিন্নবাধা পলাতক বালকের মতো সারাদিন বাজাইব বাঁশী। কবি যতই চেঁচিয়ে ডাকুন না—ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা —আমি তবু উঠব না, আমি বাঁশী বাজাব। আগুন লেগেছে তো ফাযার ব্রিগেড ডাক, আমাকে কেন? আমাকে বাঁশী বাজাতে দাও। কলকাতা জ্বলুক, আমি রাজা নীরোর মতো বাঁশী বাজাব।

আমাদের নেতারাও যদি সারাক্ষণ পলিটিক্সের বিউগল না বাজিযে বাঁশের বাঁশী বাজাতেন, তাহলে দেশ রক্ষা পেত। কবি বলেছেন—বংশে যদি বাঁশী নাহি বাজে, বংশ তবে ধ্বংস হবে লাজে। অতএব আমার কথা শুনুন, আপনারা সবাই মিলে বাঁশী বাজাতে শুরু করুন, নইলে শুধু বংশ নয়, সমস্ত বঙ্গ ধ্বংস হবে।

চাদর

আমি মানুষটা যে বিনয়ী নই সে কথা আমি পূর্বাহ্নেই বলে রেখেছি, তা ছাড়া আমার অহঙ্কৃত মনোভাব খাতার পাতাতেও বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মুখের ভাষায় এবং লেখার পাতায় আমার দুর্বিনীত স্বভাব হামেশা প্রকাশ পেলেও হেঁটে চলে বেড়াবার সময় আমি সারাক্ষণ গলবস্ত্র হয়ে চলি অর্থাৎ আমার গলায় একটি চাদর জড়ানো থাকে। বহুকালের অভ্যাস এখন দ্বিতীয় প্রকৃতিতে দাঁড়িয়ে গেছে। গলায় চাদর না থাকলে আমার মনে আস্থা থাকে না, দেহে স্বস্তি থাকে না। ওদিকে আমার চাদর দেখে দেখে বন্ধুরা এমন অভ্যস্ত হয়েছেন যে কদাচিৎ কখনো চাদরবিহীন অবস্থায় রাস্তায় বেরোলে আমার বন্ধুরা বিষম বিস্মিত হন। এমন কি কিছুদিন আগে আমার এক বন্ধুপত্নী রাস্তায় আমাকে বিনা চাদরে দেখে নাকি চিনতেই পারেননি। সেই থেকে দেখা হলেই তিনি আমাকে ইন্দ্রজিতের খাতায় আমার চাদর সম্বন্ধে লিখতে অনুরোধ করেন। আমি সম্ভব অসম্ভব সকল বিষয়েই লিখে থাকি তবু যে এতদিন আমার চাদর সম্বন্ধে কিছু লিখিনি সেটা বললে বিশ্বাস করবেন কি না জানিনে নিতান্ত বিনয় বশতই করিনি। আমার দুর্বিনীত প্রকৃতিকে এ যাবৎ আপনারা নিজ গুণে ক্ষমা করে এসেছেন, কিন্তু তাই বলে গান্ধী টুপি, বিদ্যেসাগরী চটির সঙ্গে যদি ইন্দ্রজিতের চাদরটা যোগ করে দিই তাহলে আপনারা নিশ্চয় আমার আস্পর্ধাকে ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করবেন। কাজেই গোড়াতেই বলে রাখছি আমার চাদরটাকে আপনারা উপরোক্ত দুটি জিনিসের সঙ্গে যুক্ত করে দেখবেন না। সংসারে অতি অল্প জিনিসকেই আমি শ্রদ্ধা করতে

শিখেছি। কিন্তু ঐ দুটি জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম। আগেই তো বলেছি আমি বিদ্যেসাগরী চটি শিরোধার্য করে নিয়েছি, কখনো পায়ে পরিনি। আমার মতে কারোই পরা উচিত নয়; কারণ চরণ মাত্রই শ্রীচরণ নয়।

এখানে কোনো পাঠকের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বিদ্যেসাগর মশায়ের প্রতি আমার যখন এতই ভক্তি তখন বিদ্যেসাগরী চাদরের কথা না বলে ইন্দ্রজিতের চাদরের কথা বলা কেন? প্রশ্নটা স্বাভাবিক হলেও অনাবশ্যক। কারণ, এটা আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে ইন্দ্রজিৎ লোকটা নিজের কথা বলতে পারলে অপরের কথা বড় একটা বলে না। তাছাড়া বিদ্যেসাগরের চাদর আর আমার চাদরে মস্ত বড় একটা পার্থক্য আছে। সেটা বুঝতে পারলে আর আপনাদের মনে কোনো গোল থাকবে না। লোকে বিদ্যেসাগর মশায়কে দিয়ে তাঁর চাদরকে চেনে আর আমার বেলায় তো দেখছেনই আমার চাদর দিয়ে তবে লোকে আমাকে চেনে। সেদিন আমাদের আসরে একটি আর্টিস্ট বন্ধু আমার একটি কার্টুন এঁকে ছিলেন তাতে দেখলুম আমার চাদরটাই চৌদ্দ আনা, আমি দু আনা। অর্থাৎ গলায় চাদর না থাকলে আমার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কোনো দামই নেই। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক দেশী-বিদেশী অধিকাংশ কার্টুনিস্টই ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট প্রকাশ না করে বহির্বঙ্গের বৈশিষ্ট প্রকাশ করেন—চুরুট দিয়ে চার্চিলকে চিনতে হয়, কপাল ঢাকা চুল দিয়ে হিটলারকে।

চাদর পরবার ঢংএও বিদ্যেসাগর মশায়ের সঙ্গে আমার তফাৎ আছে। তাঁর মতো আমি চাদরটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পরি না, গলায় ঝুলিয়ে রাখি। আর আমার চাদরটা যদিচ খদ্দরের তৈরি তবু বিদ্যেসাগরী চাদরের মতো সেটা অমন পুরু বুনটের নয়, কারণ গায়ের চামড়া পুরু হলে চাদর সরু হলেও চলে।

আমার পোশাকটা খাঁটি বাঙালীর পোশাক। ধুতি পাঞ্জাবী চাদরে বাঙালীকে যেমন মানায় এমন আর কিছুতে নয়। এমনকি শার্ট জিনিসটাও বাঙালীকে তেমন মানায় না, পাঞ্জাবী যেমন পাঞ্জাবীকে মানায় না। বাঙালীর অন্ন বলতে ডালভাত, বস্ত্র বলতে ধুতি চাদর। সেই চাদর পরলে লোকে কেন অবাক হবে আমি ভেবে পাইনে। বরং বাঙালীকে চাদরবিহীন অবস্থায় দেখলেই আমার অবাক লাগে। কোঁচা দুলিয়ে চাদর লুটিয়ে যদি না চললাম তবে বাঙালী বলে পরিচয় দেব কোন্ মুখে? বাঙালী ছেলেরা যখন মাল কোঁচা মেরে কিংবা পাজামা পরে জহর জ্যাকেট এঁটে ঘুরে বেড়ায় তখন দেখতে কি যে বেখাপ্পা লাগে কি বলব। কবিগুরু দুঃখ করে বলেছেন, সাত কোটি বাঙালী সন্তান বাঙালী হতে গিয়ে মানুষ হয় নি। আর ইন্দ্রজিতের দুঃখ হচ্ছে বাঙালী সন্তানরা মানুষ হতে গিয়ে অবাঙালী হয়ে যাচ্ছে। আমার মতে অবাঙালী হওয়া অমানুষ হওয়ার চাইতে বড় অপরাধ। কারণ বাঙালীকে আমি মনুষ্য-শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি, তার সকল দোষ সত্ত্বেও।

আমাদের এই গরম দেশে চাদর ছাড়া আর সব গাত্রবস্ত্রই অনাবশ্যক বাহুল্য বলে মনে হয়। এমন কি আমাদের পৌষ মাসের শীতও একটা খদ্দর চাদর দিয়ে অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়। সাক্ষী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শিলং পাহাড় থেকে লিখছেন—একটা খদ্দর চাদর হলেই শীত ভাঙানো সম্ভব।

আশ্চর্যের বিষয় এহেন অত্যাবশ্যক জিনিসবর্জন করবার জন্য এককালে আমাদের দেশে আন্দোলন হয়েছিল। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছেলে বয়েসে চাদর নিবারণী সভা স্থাপন করেছিলেন। অথচ দ্বিজেন্দ্রলালের যত ছবি আমি দেখেছি তার প্রত্যেকটি চাদর গায়ে। বেশ বোঝা যায় তিনি বিলেত যাবার আগেই বিলেতফেরতদের আওতায় এসেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে তাঁর যে ভুল ভেঙেছিল তাতে কোনো

সন্দেহ নেই। সেকালের ধুতি-চাদর বিদ্বেষী বিলেতফেরতদের তিনি নির্মমভাবে ব্যঙ্গ করেছেন। নিজেকেও ছেড়ে কথা কননি। নতুন কিছু কর একটা'—নামক ব্যঙ্গ সঙ্গীতটিতে বলছেন—

ডাল ভাতের দফা, কর সবাই রফা
কর শীগগির ধুতি চাদর নিবারণী সভা।

বালক বয়সে নিজে যে চাপল্য প্রকাশ করেছিলেন পরিণত বয়সে তিনি তাকেই ব্যঙ্গ করেছেন।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর বসন ভূষণের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হবে আশা করা যায়। হ্যাট-কোট নেকটাই একদিন ছিল গলার ফাঁসি হয়ে। এখন সে পাপ বিদেয় হোক। আমাদের সনাতন চাদর বহু দিন পরে এসে বন্ধুর মতো আবার আমাদের গলা জড়িয়ে ধরুক। বাঙালী সন্তান আরেকবার স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে বলুক—
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারই উত্তরীয়।

গাধা

আর বলেন কেন, এ সপ্তাহের লেখাটা আরেকটু হলেই বাদ পড়ে গিয়েছিল আর কি। আপনারা তো জানেন, আমার এক রোগ আছে—মাঝে মাঝে গম্ভীর কথা বলবার বিষম সখ চেপে যায়। কালকে রাত্তির বেলায় সবে ইন্দ্রজিতের খাতা খুলে বসেছি, অতিশয় গম্ভীর মুখ করে একটা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়ের অবতারণা করতে যাচ্ছি এমন সময় কানের কাছে এক বিকট চীৎকার। হঠাৎ এমন চমকে উঠেছিলুম যে খাতা একধারে আর কলম আরেক ধারে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল। আমি বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের নাম গ্রহণ করলে কি হবে আসলে আমি অতিশয় ভীরু প্রকৃতির মানুষ। অস্ত্রের ঝঙ্কার তো দূরের কথা রমণী কণ্ঠের ঝঙ্কারেও আমি মাঝে মাঝে আঁৎকে উঠি। তাছাড়া আমি আবার অন্যমনস্ক স্বভাবের লোক। কোনো কিছুর জন্যই প্রস্তুত থাকি না, কাজেই অল্পেতেই অপ্রস্তুত হতে হয়।

ব্যাপারটা আসলে যৎসামান্য। কিছুদিন যাবৎ আমাদের পাড়ায় গাধার বড় উপদ্রব হয়েছে। তারই একটা কখন যে বেড়া ডিঙ্গিয়ে একেবারে আমার জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা জানতেই পারিনি। তার উপরে সবে যখন ইন্দ্রজিতের খাতার সূচনা করব ভাবছি ঠিক সেই মুহূর্তে এমন বিনা মেঘে গর্দভাঘাত হবে তা তো একেবারেই ভাবিনি। মনটা যৎপরোনাস্তি বিকল হয়ে গেল। আমার এত সাধের গুরুগম্ভীর বিষয়বস্তুটি—গাধার ধমক খেয়ে ভেঙে চৌচির হয়ে ছিটকে পড়ল। ভাঙা চিন্তার টুকরোগুলোকে আর কিছুতেই জোড়া লাগাতে পারলুম না। খাতাপত্তর গুটিয়ে রেখে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম।

মনে আছে অনেকদিন আগে পড়ছিলাম Cowper's Letters. বন্ধুকে লেখা কবির চিঠি যখন বেশ জমে উঠেছে তখন হঠাৎ চিঠি বন্ধ করে দিয়ে কবি বলছেন, চিঠি এইখানেই শেষ করতে হ'ল। কারণ কিনা my neighbour's ass seems to be much too musically disposed to-night. সেই গাধাটার উপরে সেদিন বিষম চটেছিলাম। রসভঙ্গ আর কাকে বলে!

নিজেকে কাউপারের সমপর্যায়ে স্থাপন করে রসভঙ্গের দায়টা রাসভনন্দনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। আর নয়, ইন্দ্রজিতের খাতা এইখানেই ইস্তফা। কারণ গাধার এই অট্টহাসিটা নিশ্চয় আমাকেই উদ্দেশ করে। আমার রস পরিবেশনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও একটি মাত্র হাসির ধমকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে যতই ভাবছিলাম ব্যাপারটা ততই কৌতুক বাষ্পে ঘন হয়ে মনের মধ্যে পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল। গাধার ডাকটা নিতান্ত অর্থহীন নয়। আমাকে উদ্দেশ করে ও যা বলতে চেয়েছে ক্রমেই তার অর্থটা স্পষ্ট হচ্ছে। আমি বারম্বার বলেছি আমি প্রশংসা-লোভী, প্রশংসার খুদ্ কুড়োবার জন্য সপ্তাহে সপ্তাহে আমার আত্মপ্রচারের আপ্রাণ চেষ্টা। গাধাটা বলছে, ওরে মূর্খ, চেয়ে দেখ্ আমার দিকে—বিশ্বের নিন্দা বয়ে বেড়াচ্ছি, কিন্তু কিছুমাত্র দৃকপাত করি না। জানি বিশ্বব্যাপী নিন্দা সত্ত্বেও সংসারে প্রয়োজন তো আমার ফুরোয়নি। প্রয়োজনই সব চেয়ে বড় প্রশংসা। প্রয়োজন যেদিন ফুরোবে প্রশংসাও সেদিনই ফুরোবে।

তবে ? তবে তো আমার প্রশংসার বুদ্বুদটি ফাটবার সময় হয়েছে। কারণ, আমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। ইন্দ্রজিতের পরমায়ু আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র। অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমাকে এখন অজ্ঞাতবাসে যেতে হবে। ইতিমধ্যে যদি কিছু পুণ্য অর্জন করে থাকি তবে নিশ্চয় আমার দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হবে এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করলে আমি যে আগের

মতোই যশোলিপ্সা নিয়ে জন্মগ্রহণ করব সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আর এ কথাও বলতে পারি যে, জন্মগ্রহণ করলে আবার এই 'দেশে'তেই অবতীর্ণ হ'ব।

গোড়াতে যখন লিখতে শুরু করেছিলাম তখনই বলে নিয়েছিলাম—যা তা নিয়ে লিখব কিন্তু যা-তা লিখব না। জানি না সে সঙ্কল্প রক্ষা করতে পেরেছি কি না। অনেক আজে বাজে বিষয় সম্বন্ধে লিখেছি, কিন্তু গাধার বিষয়ে কিছু লিখিনি। ইন্দ্রজিতের খাতা আগাগোড়া উপেক্ষিত বিষয় নিয়ে লেখা। (গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে সামান্য যেটুকু লিখেছি সেটুকু প্রক্ষিপ্ত বস্তু)। ইন্দ্রজিতের কাব্যে গাধাটাকে আর কাব্যের উপেক্ষিত করে রাখব না। আমার কাব্যে গাধাটাই প্রধান নায়ক কারণ সকল কথার সার কথা সে-ই আমাকে বলেছে। তার অট্টহাসিটা আমার কানে আজ দৈববাণীর মতো ঠেকছে।

সংসারে গাধার মতো উপেক্ষিত প্রাণী আর নেই। অথচ শুনেছি যীশুখ্রীষ্ট যখন জেরুজেলাম-এ প্রবেশ করেছিলেন তখন গাধার পিঠে চেপে এসেছিলেন। এত বড় সম্মান আর কোনো প্রাণীর ভাগ্যে ঘটেনি। কিন্তু মানব সমাজে গাধার ভাগ্যে অসম্মান ছাড়া আর কিছুই জোটেনি। যে মানুষ যীশুখ্রীষ্টকেই সম্মান করতে শেখেনি সে গাধাকে অসম্মান করবে সেটা আর বিচিত্র কি? বরং মানুষ যীশুর প্রতি কিঞ্চিৎ করুণা দেখিয়েছে—তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে, কিন্তু গাধাটাকে চিরকালের জন্য অপমানের শূলে চড়িয়ে রেখেছে। স্বয়ং যীশুখ্রীষ্টও ওর প্রতি অবিচার করেছেন। মানুষকে ভেড়ার মতো (meek as lamb) হবার উপদেশ দিয়েছেন; বলি, গাধার মতো হতে দোষ ছিল কি? এমন সহনশীল জীব সংসারে ক'টি আছে?

যে দু-চার জন ব্যক্তি গাধাকে যথাযোগ্য সম্মানের আসন দিয়েছেন তাঁরা আমার প্রণম্য। আর এল স্টিভেনসন ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চল ভ্রমণে

গিয়েছিলেন। সঙ্গে একমাত্র সঙ্গী ছিল একটি গাধা (Travels with a Donkey দ্রষ্টব্য)। একবার ভাবুন তো আমার আপনার মতো বহু সজ্জন ব্যক্তি থাকতে স্টিভেনসন কেবল ঐ গাধাটাকেই সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কেন? তিনি প্রকৃতই রসজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। জানতেন প্রকৃতির নিভৃত অঙ্গনে মানুষই মূর্তিমান রসভঙ্গ। ও শুধু তর্ক করে চারিদিকের ল্যাণ্ডস্কেপ্‌টাকে নখরাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে।

আরেকজন রসজ্ঞ ব্যক্তি জি কে চেস্টারটন। গাধার সম্বন্ধে তিনি উৎকৃষ্ট কবিতা লিখেছেন। গাধার বিষয়ে এর চাইতে সুন্দর জিনিস কোনো সাহিত্যে আজ পর্যন্ত লেখা হয়নি। সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করবার স্থান এখানে নেই, একটিমাত্র স্তবক উদ্ধৃত করছি—

Fools, for I also had my hour ;
    One far fierce hour and sweet ;
There was a shout about my ears,
    And palms before my feet.

চেস্টারটনের মতো আমি যদি কবিতা লিখতে পারতুম তবে আমিও গাধার আসন কাব্যে দিতাম পেতে। তা যখন হবার নয় তখন ইন্দ্রজিতের খাতার প্রধান নায়ক হিসাবে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসনটি ছেড়ে দিলুম।

কেন লিখি

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ থেকে 'কেন লিখি' বলে একখানা বই প্রকাশিত হয়েছে। বইখানা বেরিয়েছে বেশ কিছুদিন আগে, আমি পড়লুম মাত্র সেদিন। ইদানীং আমি নিজের লেখা ছাড়া অপরের লেখা বড় একটা পড়িনে। যখন নিজে লিখতুম না তখন অবশ্যই অপরের লেখা পড়তুম। নিতান্ত বাধ্য হয়েই মধুর অভাবে তখন গুড় দিয়ে অবসর-বিনোদন করতে হতো। আপনারা হয়তো ভাবছেন, আমার এ কথা শুনে সাহিত্যিক সম্প্রদায় ভয়ানক চটে যাবেন। কিন্তু আমি সে রকম কিছু আশঙ্কা করি না, কারণ আমি জানি সাহিত্যিকরা আমার এ লেখা কখনো পড়বেন না ; অপরের লেখা তাঁরা আমাব চাইতেও কম পড়ে থাকেন।

যাঁরা উক্ত গ্রন্থে নিজ নিজ লেখা সম্বন্ধে জবানবন্দী প্রকাশ করেছেন তাঁরা সকলেই খ্যাতনামা লেখক। দুঃখের বিষয়, তাঁদের সে জবানবন্দী পড়ে আমি বড নিরাশ হয়েছি। আমি ভাবতুম তাঁবাই সাহিত্যিক যাঁরা কঠিন কথ সহজ করে বলতে পারেন। এক্ষেত্রে দেখলুম এঁরা সবাই একটা অত্যন্ত সহজ কথাকে ভয়ানক কঠিন করে বলেছেন। তাঁরা সকলেই সুলেখক। তাঁরা কেন লেখেন সেটা তাঁদের বই পড়েই মোটা-মুটি বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু তাঁদের জবানবন্দী পড়ে মনে হ'ল এঁরা কেন লেখেন তার মূলে একটা রীতিমতো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে এবং সে উদ্দেশ্যটা মোটেই সহজবোধ্য ব্যাপার নয়।

কেন লিখি—এ প্রশ্নের জবাবে এঁরা কেউ বলেন নি যে লিখতে পারি বলেই লিখি। লিখতে না পারলে নিশ্চয় লিখতুম না। গাইতে

জানলেই লোক গাইয়ে, বাজাতে জানলেই বাজিয়ে, লিখতে জানলেই লিখিয়ে। ফুটবল খেলতে পারি বলে ফুটবল খেলি, কবিতা লিখতে পারি বলে কবিতা লিখি'। এইতো সোজা কথা। কেন খাও জিগগেস করলে যে লোকটা বলে খিদে পায় বলে খাই, সে-ই সব চেয়ে সত্য কথা বলে। আর যে বলে, না খেলে শরীরে কেমন করে বল হবে, শরীরে বল না হলে কেমন করে দেশের এবং দশের কাজ করব এবং সেই সূত্রে ভিটামিন-তত্ত্বের বক্তৃতা শুরু করে দেয়, তাকে সোজা কথায় বলা যায়—pedant. Pedanticism জিনিসটা সাহিত্যিককে একেবারে মানায় না। এঁরা সকলেই সুলেখক, কিন্তু এঁদের জবানবন্দী পড়ে বাস্তবিক আমার বড় কৌতুক বোধ হয়েছে। দুঃখও হয়েছে এইজন্য যে, তাঁরা তাঁদের লেখার রস ভুলে গিয়ে তার কষ বের করেছেন।

রেখেঢেকে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়, সেজন্য গোড়াতেই বলে নিচ্ছি যে, আমি লিখতে পারি বলেই লিখি। আপনারা হয়তো বলতে পারেন এ-কথার মধ্যে লেখকোচিত বিনয় প্রকাশ পাচ্ছে না। তা নাই বা পেল। সত্য কথা সব সময়েই দুর্বিনীত। আর লক্ষ্য করে দেখবেন, উক্ত সাহিত্যিকরা ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যে সব কথা বলেছেন তার মধ্যেও খুব যে একটা বিনয় প্রকাশ পেয়েছে এমন আমার মনে হয়নি। আমি কেন লিখি তার প্রথম কারণটা স্পষ্ট করেই বলেছি। দ্বিতীয় কারণটা হচ্ছে—আমি যা বলতে চাই তা অন্য কেউ বলছেন না। অপর কেউ যদি ঠিক এসব কথা লিখতেন, তবে আমাকে আর মিছিমিছি লিখতে হ'ত না। প্রত্যেক লেখকের বেলাতেই তাই। তাঁর মনের কথাগুলো অপর কেউ প্রকাশ করতে পারছেন না বলেই তাঁকে কলম ধরতে হয়েছে। অপর কেউ যদি-বা ও-সব কথা বলেনও তবু ঠিক 'তাঁর মনের মতো করে বলতে পারেন না। আমার মতে 'কেন লিখি'র মূল তত্ত্ব এইখানে। রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে আমরা অত যে আরাম

পাই, তার প্রধান কারণ তিনি ওসব কথা না লিখে গেলে আমাদেরকেই বসে বসে লিখতে হোতো—না লিখে উপায় থাকত না। তিনি আমাদের কাজ বহুল পরিমাণে সহজ করে দিয়ে গেছেন, কারণ, আমাদের মনের কথা বারো আনাই তিনি আগেভাগে বলে রেখেচেন। আমরা যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণ স্বীকার করি, তখন এই কারণেই করি।

'কেন লিখি' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের মুখবন্ধে রোমাঁ রোলাঁর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি আছে। তাতে তিনি বলেছেন—To write is, for me to breathe, to live. রোমাঁ রোলাঁ এ যুগের সাহিত্য মহারথীদের অন্যতম। তিনি যা বলেছেন, সেটা তার নিজের সম্বন্ধে যে সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বেলায় ওকথাটা মোটেই সত্য নয়। কারণ আমার কাছে লেখাটা breathe করবার মত সহজ ব্যাপার নয়, বরং লিখতে বসলে আমার breathing difficulty হয়। লেখার চাইতে না লেখা বেশি আরামের, একথা লেখকমাত্রই স্বীকার করবেন। মনকে একটু যদি সাধাসাধি করতে না হয়, তবে তো লেখার মর্যাদাই থাকে না। ওস্তাদ গাইয়েকে দিয়ে কি সহজে গান করানো যায়? গান করতে বললেই তাঁদের একশো রকমের ওজর-আপত্তি দেখা দেয়—গলা খুস্‌খুস্‌, দাঁত কন্‌কন্‌, কান কট্‌কট্‌ অনেক কিছু শুরু হয়ে যায়। ওস্তাদ লিখিয়েদের যদি এতাদৃশ মুদ্রাদোষ অল্প-বিস্তর থাকে, তবে সেটাকে এমন কিছু অমার্জনীয় দোষ বলা চলে না।

'কেন লিখি'র লিখিয়েরা কেউ কেউ বলতে চান তাঁরা মানবহিতায় কিংবা জগদ্ধিতায় লিখতে শুরু করেছেন। সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁদের এবম্বিধ মতামত তাঁদের অবশ্যই লেখবার জন্য সাধাসাধি বা খোসামুদির প্রয়োজন হবে না। তাঁরা আপন তাগিদেই নিরলস অধ্যবসায়ের সঙ্গে লিখে

যাবেন। সাহিত্য প্রসঙ্গে সমাজ-সেবা কিংবা মানবহিতের কথা তুলতে গেলে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে কার জন্য লিখি। যাঁরা মানবহিতের জন্য লেখেন তাঁরা নিশ্চয় সমগ্র মানবসমাজের জন্যই লেখেন। আমার নিজের সম্বন্ধে এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, আমি সম্পূর্ণরূপে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হয়ে লিখি, কাজেই আমার লেখার দ্বারা সংসারে কোনো ব্যক্তির কোনো হিত হবে, একথা ভাবাই হাস্যকর। 'দেশ'এর সমস্ত পাঠকের জন্য আমি কখনো লিখি না। মুষ্টিমেয় যে ক'জন পাঠক আমার সত্যিকারের সমঝদার, আমি শুধু তাঁদের জন্যই লিখি। এযাবৎ চিঠিপত্রে যা বুঝেছি তাঁদের সংখ্যা বড় জোর পঁচিশ কিংবা ত্রিশ। এ ছাড়া নিত্যকার আসরের বন্ধু ধরুন আরো কুড়ি পঁচিশ জন। কাজেই দেখতেই পাচ্ছেন সাত কোটি বঙ্গ-সন্তানের মধ্যে বড় জোর জন পঞ্চাশেক লোকের জন্য আমি লিখে থাকি। আমার পাঠকসংখ্যা যে অতিশয় সীমাবদ্ধ তাই নিয়ে আমি দুঃখ করি না। বরং মনে মনে এইভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করি যে কবি কিংবা যাত্রা গানেই ভিড় জমা সম্ভব, কিন্তু যেখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আলাপ, সেখানে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় রসজ্ঞের সমাবেশ। যাঁরা মানবহিতায় সাহিত্য পরিবেশন করেন, দেখা যাচ্ছে, তাঁরা এখনও মল্লিকবাড়ির কাঙালীভোজনে বিশ্বাস করেন। কারণ এই দুটো একই জাতীয় জিনিস এবং আমার বিশ্বাস এর কোনোটার দ্বারাই সমাজের কল্যাণ হবে না।

আতঙ্কময়ীর আগমনে

যেতে যেতে হঠাৎ আমার কন্যা রাস্তার মাঝখানে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। বললে আঃ, কি সুন্দর শিউলি ফুলের গন্ধ। আমিও থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। পিতা পুত্রী দু'জনে একই সৌগন্ধে মুগ্ধ। আমার কন্যার বয়সে আমার মনেও এমনি চমক লাগত। ক্ষণকালের জন্য শিশুকন্যার মধ্যে আমার আপন শৈশবটি জেগে উঠেছিল। সে শৈশব থেকে বহুদূরে চলে এসেছি। অনেক বৎসর কেটে গেছে অনেক ঘটনা ঘটেছে, ইতিহাসের পূতিগন্ধে জীবনে মালিন্য স্পর্শ করেছে, কিন্তু শিউলি ফুলের গন্ধটি এতটুকু মলিন হয় নি। শেষ বর্ষণের জল-ধারায় ধুয়ে শরতের আকাশ গাঢ় নীল হয়ে উঠেছে। আনন্দময়ী এসেছেন এবং চলে গেছেন। একমাত্র ঐ শিউলি ফুলের গন্ধটা ছাড়া আর কোথাও তাঁর আগমন ও গমনের বার্তার ঘোষণা নেই। আমি অধার্মিক ব্যক্তি, দেবদেবী কোনোকালে বুঝিনি, কিন্তু আনন্দময়ীকে বুঝেছি, শিউলি ফুলকে চিনেছি, শরতের আকাশ দেখে মন নেচে উঠেছে। সেই আনন্দময়ীর আগমনে আতঙ্কে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। আনন্দময়ী অকস্মাৎ আতঙ্কময়ী হয়ে উঠেছিলেন। শুনেছি নাকি ভিটেমাটি ছেড়ে বাচ্চাকাচ্চা তল্পিতল্পা নিয়ে মানুষ পালিয়েছিল।

এই সেদিন নিন্দে করে বলেছিলাম বিশ্বপ্রকৃতি সৃষ্টির শিকলে বাঁধা। মানুষের মন যে মুক্তির সন্ধান জানে বিশ্বপ্রকৃতি তা জানে না। গর্ব করে বলেছিলাম এইখানেই প্রকৃতির উপরে মানুষের জয়। কিন্তু মানুষের মুক্তির স্বরূপ যদি এই হয় তবে সে মুক্তি কার কি কাজে লাগবে? স্বাধীন মানুষ মানে কি হিংস্র মানুষ? বনের পশুর স্বাধীনতা আর মানুষের স্বাধীনতা কি এক কথা? আগে বাঘ-ভালুকের ভয়ে মানুষ পালাত,

এখন মানুষের ভয়ে মানুষ পালাচ্ছে। এমন যে সুন্দর বন তারও আশে পাশে মানুষ ঘর করেছে, নিরাপদে বাস করছে। কিন্তু পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষ পালাচ্ছে মানুষের ভয়ে। মানুষ হয়েছে এখন হিংস্রতম জীব। পাঞ্জাবে মুসলমানের ভয়ে হিন্দু পালিয়েছে, হিন্দুর ভয়ে মুসলমান। Have I no 'reason' to lament then, what man has made of man? মনুষ্যত্বের এত বড় অপমান কবে কোথায় হয়েছে? ইয়ুরোপের প্রলয়ঙ্করী যুদ্ধের সময়ও অর্ধকোটি নরনারী বাড়ি ঘর ছেড়ে দেশান্তরে পালায়নি। গ্যাসের যুদ্ধ ইয়ুরোপেও হয়নি, কিন্তু ভারতবর্ষে আজ যত বিষবাষ্প ছড়িয়েছে জার্মানির গুপ্ত অস্ত্রাগারেও এত বিষবাষ্প লুকায়িত ছিল না। এই বিষ অগণিত মানুষকে মারবে। যে সব নেতারা দেশময় এই হিংসার বাষ্প ছড়িয়েছেন তাঁরাও বাদ পড়বেন না। একটি মাত্র আশার কথা এই যে, যত দ্রুত এই বিষোদ্গীরণ হয়েছে তত দ্রুত এর নিরসন হবে। হিটলার-তন্ত্রের যেমন দ্রুত উত্থান তেমনি দ্রুত পতন।

ভাবলে আশ্চর্য লাগে যে এখনও শিউলি ফুল ফোটে এবং সে ফুলে গন্ধ থাকে। মানুষ তার ধর্মকে ভুলেছে, কিন্তু ছোট্ট শিউলি ফুলটি শরতের ধর্মকে ভোলে নি। বাঙলা দেশের হৃদয়-ছেঁচা গন্ধটি শরতের আকাশে ছড়িয়ে দিয়েছে। ফুলের গন্ধ আসে যেন মায়ের গন্ধ হয়ে। সাত কোটি সন্তানের জননী বঙ্গমাতার কেশ-সুরভি ভেসে আসছে। এখন ডেকে আনুন র‍্যাডক্লিফ কমিশন—সেই সৌরভটিকে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যাক্। হায়রে কি সুসন্তানই আমরা হয়েছি—মায়ের দেহটিকে কেটে দুখানা করে নিয়েছি। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী আমি, পশ্চিম বঙ্গের এক প্রান্তে বসে বসে ভাবছি এখানটায় আমি alien অর্থাৎ বিদেশী কারণ আমি ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। মাদ্রাজী, মারাঠী, বিহারীর কাছে এটা স্বদেশ, কিন্তু

আমার বেলায় বিদেশ। নিজ বাসভূমে পরবাসী—কবিবাক্য এত বড় নিদারুণ পরিহাস হয়ে উঠবে একথা কে ভেবেছিল!

যে বাঙলাদেশ গুণে গরিমায় জগৎসভায় স্থান পেয়েছে সে বাঙলা দেশকে গড়ে তুলেছিলেন কে? রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্রের নিজ হাতে গড়া বাঙলাদেশ। সেই বাঙলাদেশ একত্র থাকবে কি আলাদা হবে, বাঙলা দেশকে ল্যাজে কাটবে কি মুড়োয় কাটবে তার নির্দেশ দেবেন জিন্না সাহেব আর র‍্যাড্‌ক্লিফ সাহেব? গড়বার দিনে কেউ ছিল না। আর ভাঙবার বেলায় সবাই ওস্তাদ। বঙ্গ বিভাগ সমগ্র বাঙালী জাতির আত্মসম্মানের প্রতি চ্যালেঞ্জ। কার্জনী বঙ্গবিভাগ হিন্দু মুসলমান দুই-এ বাতিল করে দিয়েছিল, জিন্নাকৃত বঙ্গ-বিচ্ছেদও হিন্দু মুসলমান দুই-এ মিলেই বাতিল করবে। সেই সুবুদ্ধি আজকের উত্তেজনা নিবে এলে অদূর ভবিষ্যতে দেখা দেবে। হয়ত এজন্য বাঙলা দেশকে কংগ্রেস এবং লীগ উভয়ের পলিটিক্সকেই ত্যাগ করতে হবে। ট্র্যাজেডির মূল তো এইখানেই। জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তারে—বঙ্গবীণা ঠিক সুরে তাই বাজে না রে। কংগ্রেস এবং লীগের পলিটিক্স বাঙলা দেশের গলায় ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদা বাঙলাদেশ ছিল আর সব প্রদেশের পুরোভাগে। যেদিন থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতির জন্ম হয়েছে সেদিন বাঙলা দেশকে দু-পা পিছিয়ে এসে অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে পা মেলাতে হয়েছিল। পশ্চাদ্‌গমন মাত্রই পাপ। বাঙলাদেশ আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে। কংগ্রেসী পলিটিক্স যে বাঙলা দেশের পলিটিক্স নয় তা বারম্বার প্রমাণিত হয়েছে। বাঙলা দেশের যাঁরা অবিসম্বাদিত নেতা তাঁরা কেউ বেশি দিন কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথ পারেননি, চিত্তরঞ্জন পারেননি, সুভাষচন্দ্র পারেন নি। যাঁরা পেরেছেন তাঁরা কংগ্রেসের নেতা হয়েছেন কিন্তু বাঙলা

দেশের নেতা হননি। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পরে কংগ্রেস যেদিন বাঙলা দেশের নেতৃত্বকে বিভক্ত করেছে সেদিনই ভারতবর্ষের কপাল পুড়েছে। এই কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে ভারত বিভক্ত হতে বাধ্য সেদিনই আমাদের বোঝা উচিত ছিল। মুসলিম লীগ কংগ্রেস পলিটিক্সেরই বাই-প্রডাক্ট। আবার এ কথাও সত্য যে, কংগ্রেসী পলিটিক্স যেমন বাঙলা দেশের ধাতে সয়নি, লীগ পলিটিক্সও বেশি দিন বাঙালী মুসলমানের ধাতে সইবে না। পূর্ববঙ্গে লীগবিরোধী আন্দোলন অবশ্যম্ভাবী।

বিভক্ত ভারতবর্ষকে একত্র করার দায়িত্ব বাঙলা দেশকেই গ্রহণ করতে হবে। এখন আমাদের একমাত্র রাজনীতি হওয়া উচিত—উভয় বঙ্গের মিলন চেষ্টা। কংগ্রেস লীগের পলিটিক্স ভুলে গিয়ে একমাত্র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শত শত যুবক কেবলমাত্র এই মিলনের মন্ত্র প্রচার করুন। এই দারুণ দুর্যোগের মধ্যেও শুভদিন আসন্ন। হিন্দু মুসলমান উভয়ের সব চেয়ে বড় পর্ব এবার একসঙ্গে এসেছে। বর্তমান উত্তেজনার মুহূর্তে এইটিই অধিকতর আতঙ্কের কারণ হয়েছে। এই দুই পর্বের শুভমিলন আতঙ্কের না হয়ে আনন্দের হউক। হিন্দু মুসলমানকে বিজয়ার সম্ভাষণ জানাক, মুসলমান হিন্দুকে ইদ্ মোবারক্ জানাক।

বিলাতফেরত বনাম জেলফেরত

ইন্দ্রজিৎ লোকটা যে বেঁচে আছে, মরেনি সে কথাটা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যই অনেকদিন পরে দুটো কথা লিখতে বসেছি। অবশ্যি লোকটা সত্যি সত্যি মরলে এতদিনে নিশ্চয় বাঙলা দেশের কোনো মহাকবি নব পর্যায় মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করে ফেলতেন। তা যখন হয়নি তখন বেঁচে যে আছি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। মাঝখানটায় সামান্য একটু খটকা লেগেছিল ; কারণ প্র-না-বি তাঁর অ্যালবামের ভূমিকায় আমাকে প্রায় স্বর্গদ্বার অবধি পৌছে দিয়েছিলেন। বাঙলা দেশে মৃত্যুর পূর্বে কেউ বড় একটা প্রশংসা লাভ করে না। অমর হতে হলে আগে মরতে হয়। প্র-না-বি'র কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তিনি আগে ভাগেই আমার epitaph রচনা করে রেখেছেন।

আপনাদের পূর্বাহ্লেই বলে রেখেছিলাম যে, পুণ্যফলে আমার যদি কোনকালে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি ঘটে তবে আবার এই 'দেশে'তেই জন্মগ্রহণ করব। অর্থাৎ যদি লিখি তো 'দেশে'এর পাঠকদের জন্যই লিখব। তবে কিনা বৎসরকাল যাবৎ আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার যে সাপ্তাহিক সম্বন্ধটি গড়ে উঠেছিল সেটি অবশ্যই বজায় রাখতে পারবো না। কারণ আমি নিয়মতান্ত্রিক মানুষ নই, নিয়মমাফিক কাজ করা আমার ধাতে সয় না। পুরোপুরি এক বছর সে-কাজ করে আমি যে কি পরিমাণ হয়রান হয়েছি কি বলব। ঠিক করেছি এখন আমি খেয়াল খুশী মতো লিখব, সেটা মাসে একবার হতে পারে চাই কি বৎসরেও একবার হতে পারে।

আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন আমার আগের কোন লেখায় আমি ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধার করেছি। আজকেও একটু ইতিহাসের চর্চা

করব যদিচ সেটা ইস্কুল পাঠ্য কিংবা কলেজ পাঠ্য ইতিহাস নয়। বাঙলা দেশে তথা ভারতবর্ষে এক যুগ গেছে যখন বিলেতফেরতদের নিয়ে সমাজে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। কালো বরণ নিয়েও যাঁরা কালাপানি পার হতেন দেশে ফিরে এলে সমাজ তাঁদের সহজে রেহাই দিত না। গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তবে ছাড়ত। এঁরা যে স্বয়ং প্রমিথিয়ুসের মতো বিলিতি স্বর্গ থেকে বহ্নি-শিখা এনে তিমিরাচ্ছন্ন দেশে আলোক বিকিরণ করছেন সেকথা সমাজ স্বীকার করত না। প্রথম যুগে বন্দী প্রমিথিয়ুসেব মতো এঁদেরকেও হিন্দুসমাজ রীতিমতো কোণঠাসা করে রেখেছিল। তবে কিনা এঁরাও ছেড়ে কথা কননি। দলে ভারি হবার সঙ্গে সঙ্গে কালাপাহাড়ী তাণ্ডবে হিন্দু সমাজের ভিতশুদ্ধ নেড়ে দিয়েছিলেন। নিষিদ্ধ মাংস আধা সেদ্ধ করে খেয়েছেন, হাড় ছোবরা বামুন পণ্ডিতের বাড়িতে ছুঁড়ে ফেলেছেন, গঙ্গোদক ছেড়ে বিলিতি পানীয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। অবশ্যি এসব অ-হিঁদুয়ানির হাতেখড়ি হিন্দু কলেজেই সর্বপ্রথম হয়েছিল। তাবপরে ধীরে ধীরে সময়ের গতির সঙ্গে সমাজের মতি বদলেছে। আমাদের গত একশো বছরের ইতিহাস প্রমিথিয়ুসের বন্ধনমুক্তির ইতিহাস। বিলাতফেরতরা সমাজবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সমাজও বহু সংস্কার থেকে মুক্তি লাভ কবেছে। এটা মস্ত বড় ঐতিহাসিক ঘটনা। সে ইতিহাস ভারতবর্ষের রেনেসাঁসের ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। রাষ্ট্রে সমাজে ব্যবসায়ক্ষেত্রে চাকরীর বাজারে ক্রমে বিলাতফেরতদেরই প্রাধান্য হ'ল। সমাজের ভাঙা গড়ার ইতিহাস বড় বিচিত্র। ভাবলে হাসি পায সমাজ একদিন যাদের একঘরে করে রেখেছিল পরে তারাই সমাজপতির আসন দখল করেছে। এর সবচেয়ে হাস্যকর পরিণতি হচ্ছে বর্তমান হিন্দু মহাসভা। নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন হিন্দু মহাসভার উচ্চতম কর্মকর্তারা ভট্টপল্লীর ভট্‌চাজ বামুন নন্—অধিকাংশই বিলেত-

ফেরতসাহেব। তাও আবার যেমন তেমন বিলাতফেরত নন—বিলাত-ফেরতদের মধ্যে সবচেয়ে যে ঝাঁঝালো সেই ব্যারিষ্টার সম্প্রদায়ের লোক। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন—

এ যে ভারি আশ্চয্যি
বিলেত ফেরতা টানছেন তামাক
সিগারেট খাচ্ছেন ভটচায্যি।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। সনাতন হিন্দুধর্ম সংরক্ষণীর ভার পড়েছে বিলাতফেরতদের ওপরে। তামাক টানা তো সামান্য ব্যাপার। টিকির ভেতরে অ্যাটমিক শক্তির ব্যাখ্যা এখন এঁরাই করবেন।

ভারতীয় রেনেসাঁসের প্রথম পর্যায়ে যেমন বিলাত গমন, দ্বিতীয় পর্যায়ে তেমনি জেল গমন। সেটাও বন্ধনমুক্তিরই ইতিহাস—প্রথমটি সামাজিক বন্ধন থেকে, দ্বিতীয়টি রাষ্ট্রিক বন্ধন থেকে। মহাত্মাজী ভদ্র এবং শিক্ষিত সমাজের কাছে কারাগৃহের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এর আগে কারো কারাবাস হ'লে তাকে সমাজে পতিত হতে হ'ত। এক্ষেত্রেও গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবার বিধি প্রচলিত ছিল। এমন কি কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে জেলে গেলেও জেলফেরতার মনে হিঁদুয়ানীর খুঁতখুঁতুমি থেকে যেত। গোরা উপন্যাস তার প্রমাণ। গোরা জেল থেকে এসে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছিলেন। গান্ধী এসে সব ওলট পালট করে দিলেন। সমুদ্রযাত্রার মতো জেলে যাওয়ার ভীতিও সমাজ থেকে দূর হ'ল। এমনকি জেলে যাওয়াটাই ফ্যাশানে দাঁড়িয়ে গেল। যারা গেল না তারা কৃপার পাত্র হয়ে রইল। বেশ মনে আছে আমাদের যে সব বন্ধুরা গোড়ার দিকে জেল ঘুরে এসেছিলেন তাঁরা আমাদের চোখে প্রায় 'হিরো' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বিলেতফেরত বন্ধুরা ওদেশের নীলনয়নাদের সম্বন্ধে যেমন রোমাঞ্চকর বর্ণনা দিতেন

জেলফেরত বন্ধুর দল জেলের 'লপ্.সি' সম্বন্ধেও প্রায় তদনুরূপ বর্ণনাই পেশ করতেন।

যাক্ প্রায়শ্চিত্ত তো দূরের কথা, এখন থেকে জেলফেরতটাই হ'ল সমাজে সব চেয়ে বড় কৌলিন্য। বিলিতিয়ানার সত্যিকারের প্রায়শ্চিত্ত এইখানেই হ'ল। গান্ধীজী দেশবাসীকে বিলিতিয়ানা ছেড়ে স্বদেশীয়ানায় দীক্ষা দিলেন। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে সে যুগের বিলাতফেরতদের নিয়েই তিনি নবযুগের সূচনা করেছিলেন। বিলাতি যুগের হোতাদেরই স্বদেশী যজ্ঞে সর্বপ্রথম আহুতি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বিলাতফেরতরাই সর্বাগ্রে জেলে গিয়েছেন।

জেলখানা এ যুগের সবচেয়ে বড় তীর্থ। শ্রীঘর হয়েছে শ্রীক্ষেত্র। ধনী নির্ধন শিক্ষিত অশিক্ষিত ছোট বড় সবাই এক জায়গায় মিলিত হয়েছে। বহু মানবের মিলনক্ষেত্রই মহামানবের শিক্ষাকেন্দ্র। গত ত্রিশ বছরে ভারতবর্ষের জেলখানাগুলো যে শিক্ষা দিয়েছে দেশের সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয় মিলেও সে শিক্ষা দিতে পারেনি। এইসব জেলখানায় ভারতবর্ষের সত্যিকারের সিভিল সার্ভেণ্ট তৈরি হয়েছে। রাউণ্ড টেবিল বৈঠকের সময় গান্ধীজী স্বয়ং এই জেলফেরত কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের সিভিল সার্ভেণ্ট আখ্যা দিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত বিলেত ফেরতের যুগ গিয়েছে। তারপর থেকে জেল ফেরতের যুগ। রাষ্ট্রে সমাজে বিলাতফেরতদের যে সম্মান প্রতিপত্তি ছিল সেটা এখন জেলফেরতে বর্তালো। চাকরির বাজারে বিলিতি ডিগ্রীর যেমন বিশেষ মূল্য ছিল, জেলগমন কোন কোন মহলে অনুরূপ মূল্য পেতে লাগল। হ্যাট কোট নেকটাই ছাপিয়ে শুভ্র খদ্দরের মহিমা বাড়ল। বিলেতফেরতরা আলাদা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের পোষাক আলাদা। ভাষা আলাদা, চালচলন আলাদা। তাঁদের বেলায় পর কৈনু আপন,

আপন কৈনু পর। সুখের বিষয় জেলফেরতরা আলাদা সমাজ গড়েননি। ইঙ্গবঙ্গ তো দূরের কথা—এঁরা অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সব এক জায়গায় জড় করেছিল। এঁদের আপনপর বিভেদ ছিল না। ঘরকে বাহির করেননি বরং বাহিরকেই ঘর করেছেন।

অবশ্যি কালে কালে সব সমাজেই একটু স্নবারি এসে যায়। জেলফেরত সমাজ পুরোপুরি স্নবারিমুক্ত এমন কথা বলতে পারিনে। বিলেতফেবতরা যেমন মনে করতেন তাঁরাই দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক জেলফেরতরাও হয়তো ভেবে থাকেন দেশ-প্রেমেব একচেটিয়া অধিকাবটা তাঁদেরই। অন্ততঃ ওরা ভাবুন আব নাই ভাবুন আমি নিজেকে সত্যি অন্ত্যজ মনে কবতুম। বন্ধুবান্ধব মিলে প্রায়ই বলাবলি করতাম যে একবার কযেক মাসের জন্য জেলে ঘুরে এলে হোতো। যে দেশে হনলুলু কিংবা হণ্ডুরাসের ডিগ্রীর প্রতিও মোহ রযেছে সে দেশের স্বাধীন রাষ্ট্রে জেলফেরতের বাজার দর একটু বাড়বেই। কিন্তু ইংরেজ এমন সাততাড়াতাড়ি তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেল যে শেষ পর্যন্ত জেলে যাবার অবসরই মিলল না। অবশ্যি এখন যা দেখছি তাতে দুঃখিত হবার তেমন কারণ নেই। এর চাইতে বরং ইংরেজের হাতে পায়ে ধবে খেতাব টেতাব জুটিযে রাখলে হোতো। দেখা যাচ্ছে উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ করে দিলেই কংগ্রেসী দেবতাদেব তুষ্ট করা যায। মহাত্মাজী জেলফেরতা কংগ্রেস-সেবীদের বৃথাই সিভিল সার্ভেণ্ট আখ্যা দিযেছিলেন। ইংরেজ আমলের সিভিল সার্ভেণ্টরা এখন আরো জাঁকিয়ে বসেছেন। কারণ কিনা এঁদের অভিজ্ঞতা আছে—চুরি জুয়াচুরি, ঘুষ ঘুষি ইত্যাদি অনেকরকম অভিজ্ঞতা। আবার বিলেত-ফেরতার দিন ফিরে আসছে। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে লোকে বিলেত যাচ্ছে—অর্ণবযানে ব্যোমযানে—কালাপানি পার হতে আর তর সইছে না। ইংরেজের লোহার শেকলটি ছিঁড়েছে, কিন্তু স্বর্ণশৃঙ্খলের এখনও অনেক বাকি। মোহ না ঘুচলে মুক্তি ঘটে না।

পান্তির মাঠ

আমি খুব যখন ছেলেমানুষ—বয়স বোধকরি আট ন' বছর হবে তখন পূর্ববঙ্গের এক পাড়া গাঁ থেকে প্রথম কলকাতায় আসি। কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশ ঘেঁষে যে গলিটি গেছে সেই গলির একটা বাড়িতে থাকতাম। ও জায়গাটা তখন সমাজপাড়া বলে পরিচিত ছিল। যদ্দূর জানি এখনও সেই নামটা বজায় আছে। প্রবাসী আপিস তখন ঐ গলির ভেতরে ছিল। বৃদ্ধ রামানন্দবাবুকে রোজ দেখতুম নিচের তলার ঘরে বসে কাজ করছেন। তিনি তখনও তেমন বৃদ্ধ হননি। তারপরে তাঁকে প্রায় তিরিশ বছর ধরে দেখেছি, কিন্তু তখনই তাঁকে কেমন বৃদ্ধ মনে হ'ত।

গলিটার ঠিক উল্টো দিকে কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ওপরে বেশ খানিকটা ফাঁকা মাঠ মতো ছিল। জায়গাটার নাম ছিল পান্তির মাঠ। ওখানটায় এখন বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেল হয়েছে। সারা কলকাতা শহরেই ফাঁকা যায়গাগুলো বুজে আসছে বোধকরি প্রকৃতি দেবীর মতো কলকাতা শহরও abhors vacuum.

পান্তির মাঠ নামটা কি করে হ'ল তা আমার জানা নেই। কৃষ্ণ পান্তির সঙ্গে এর যোগ আছে কিনা তাও আমি জানিনে, ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায় মশায়, হয়তো বলতে পারবেন।

ঐ মাঠটার সঙ্গে আমার বালককালের অস্পষ্ট স্মৃতি কিছু কিছু জড়িয়ে আছে। পাড়ার ছেলেদের ওটাই ছিল খেলার জায়গা। ও পাড়ায় এখনও নিশ্চয় ছেলেপিলে আছে, কিন্তু তারা খেলে কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। ইট পাথরের সভ্যতা এসে খেলার

জায়গাটিকে গ্রাস করেছে। সভ্যতার জুলুম ছেলেপিলে এবং অসহায়ের ওপরেই সবচাইতে বেশি। শিশুরা সভ্য নয়, তারা আদিম। Adult Franchise-এর যুগে সভ্যতা adult-দের জন্যই। শিশুদের খেলার প্রয়োজনীয়তাকে যে সভ্যতা অগ্রাহ্য করেছে সে সভ্যতা শিশুদের বৃদ্ধ করে তুলেছে। আজকের ছেলেরা সাধে কি অকালপক্ব হয়েছে? গড়ের মাঠে গিয়ে খেলা হয় না, খেলা দেখা হয়। আজকালের ছেলেরা খেলা দেখেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে।

ও মাঠের সম্পর্কে আমার আরেকটা কথা মনে আছে। একটি লোক প্রায়ই এসে ওখানটায় ম্যাজিকের খেলা দেখাত। একটা সতরঞ্চি পেতে বসে ডুগডুগি বাজিয়ে লোক জড় করত। ছেলেদেরই ভিড় হ'ত বেশী। টিকিটের বালাই ছিল না। খেলার শেষে একটা পাত্র হাতে সবার সুমুখে একবার ঘুরে যেত। যার ইচ্ছে দু একটা করে পয়সা ওরই মধ্যে ফেলে দিত। বড় হয়ে আনাতোল ফ্রাঁসের Ladies Juggler গল্পটা পড়ে পান্তির মাঠের সেই বাজিকরের কথা প্রায়ই আমার মনে পড়ে যেত।

আমি যখন দেখেছি তখনই পান্তির মাঠের আকৃতি অনেকখানি সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। তার আগে এখানে যে বড় বড় জনসভা হ'ত ইতিহাসে তার প্রমাণ আছে। কলকাতা শহরটা ক্রমে চারিদিকে যত হাত পা ছড়াচ্ছে ওর বুক তত খালি হয়ে যাচ্ছে। বুক খালি হচ্ছে মানে এই নয় যে, ওর মাঝখানটা ফাঁকা হচ্ছে। আগেই তো বলেছি ফাঁকা জায়গাগুলো বরং বুজে আসচে। বলতে যাচ্ছিলাম যে, ওর যে সমস্ত পুরোনো স্মৃতি ও এতকাল বুকে করে আগলে ছিল সে সব স্মৃতি ক্রমে লোপ পেয়ে যাচ্ছে। কলকাতার অলিতে গলিতে পাড়াতে পাড়াতে কত ইতিহাসের টুকরো ছড়িয়েছিল ইট পাথরের তলায় চাপা পড়ে সে সব লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে। কালের স্রোত চলতে চলতে

কেবলি পাক খেয়ে চলে সে আবর্তে স্মৃতির টুকরোগুলো ছিটকে বহুদূরে চলে যায়।

আজ যেখানে বিদ্যায়তন কাল সেখানে যে মেছোবাজার হবে না সে কথা কে বলতে পারে? উল্টোটাও হয়। আজকের আশুতোষ বিল্ডিং হয়েছে মাধববাবুর বাজারের ওপরে। কেউ কেউ অবশ্য ঠাট্টা করে থাকেন, বাজারটা আগে ছিল নীচে, এখন উঠেছে উপরে। যাই হোক গোল দীঘিকে কেন্দ্র করে বাঙলা দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ইতিহাস গড়ে উঠেছে। ধরুন একদিন যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দপ্তর এবং বিদ্যায়তন এখান থেকে সরিয়ে শহরের বাইরের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় (এবং তাই নেওয়া উচিত) তাহলে কি আর গোল দীঘির মানমর্যাদা অতটা থাকবে? সরস্বতীর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীও অন্তর্ধান করবেন। গোলদীঘ তখন লক্ষ্মীছাড়া হবে।

পান্তির মাঠেরও সেই দশাই হয়েছে। আজকের ছেলেরা তার নামই জানে না। বয়স্করা যাঁরা জানতেন তাঁরাও ভুলে যাচ্ছেন। অথচ বললে অনেকে অবাক হয়ে যাবেন যে, ঐ পান্তির মাঠে দাঁড়িয়ে স্বদেশী যুগে একদিন (২তশে কার্তিক, ১৩১২) রাজা সুবোধ মল্লিক জাতীয় শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। কাল এবং পাত্রের কথা যদিবা স্মরণ থাকে স্থানটির কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। আমাদের শিক্ষা কতখানি বিজাতীয় হয়েছে এসব কথা ভুলে যাওয়ার মধ্যেই তার প্রমাণ। এই মাঠটিকে কেন্দ্র করে সেই যুগে একটি শিক্ষা, সংস্কৃতি ও স্বদেশিকতার আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। গোড়াতেই তো বলেছি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সুমুখেই এই মাঠ। ব্রাহ্ম সমাজের গৃহটিই বাঙলা দেশের মস্ত বড় একটা সামাজিক বিপ্লবের নিদর্শন। শুধু সামাজিক বললে ভুল করা হয়, আমাদের রাষ্ট্রিক আন্দোলনেও ব্রাহ্ম সমাজের দান বড় কম নয়। সেদিনের যাঁরা অগ্রগামী দল তাঁরা

অনেকেই মুখ্য কিংবা গৌণভাবে ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সেইজন্য এই পাড়াটাতেই বিশেষ করে বাঙালী জীবন নানাভাবে পল্লবিত হয়ে উঠেছিল।

পান্তির মাঠের গা ঘেঁষে কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীটের ওপরে ছিল বিখ্যাত ফিল্ড এণ্ড এ্যাকাডেমী সভাগৃহ। এ সভাগৃহ তখনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এই সভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কোন কোন রাজনৈতিক প্রবন্ধ ফিল্ড এণ্ড এ্যাকাডেমী ভবনেই প্রথম পড়া হয় পি মিত্র প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারাও এই সভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ সভা (৭ই কার্তিক, ১৩১২) এই গৃহেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পান্তির মাঠের ঠিক পেছনেই শিব-নারায়ণ দাসের গলি। এরই ১৪ নম্বর বাড়িতে থাকতেন ডন্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ মুখোপাধ্যায়। ওখান থেকেই ডন্ সোসাইটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হ'ত। রবীন্দ্রনাথ এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ডন্ সোসাইটির ছাত্রদের সম্বোধন করে তিনি একাধিকবার বক্তৃতা করেছেন। বিংশ শতাব্দির প্রথম দশকে বাঙালী শিক্ষিত সমাজে ডন্ সোসাইটি অসীম প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইমাত্র কয়েক মাস আগে কাশীধামে সতীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হয়েছে। বাঙলা দেশে তাই নিয়ে বিশেষ কোন চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। অনেকে তাঁর নামই জানে না। আজীবন ব্রহ্মচারী এই অদ্ভুতকর্মা পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত উপন্যাসের ন্যায় বিচিত্র। তাঁর শিষ্যতুল্য অধ্যাপক বিনয় সরকার, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যদি সবিস্তারে সেই জীবন-কাহিনী প্রকাশ করেন তবে বাঙালী পাঠকসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

পান্তির মাঠের সম্পর্কে আরো দু একটি প্রতিষ্ঠানের কথা আপনি মনে এসে যায়। এই মাঠের লাগোয়া একটি বাড়িতে ছিল মজুমদার

লাইব্রেরী নামে এক বই-এর দোকান। দোকানের মালিক শৈলেশ মজুমদার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীশ মজুমদারের ভ্রাতা। এই দোকানটিতে একটি ঘরোয়া সাহিত্য-সভা গড়ে উঠেছিল, নাম ছিল 'আলোচনা সমিতি। আলোচনা সমিতির উদ্যোগে মাঝে মাঝে প্রকাশ্য সভার আয়োজন হ'ত। রবীন্দ্রনাথের বহু সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ এই সব সভায় পড়া হয়েছে।

এ ছাড়া আরেকটি প্রতিষ্ঠানেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের পাশেই ছিল সংগীত সমাজের গৃহ। গান বাজনা নাটক ইত্যাদি নির্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা সেকালে বড় একটা ছিল না। জোড়াসাঁকো কিংবা পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়িতে যে নাটকাদির ব্যবস্থা হ'ত তাতে সাধারণের গতিবিধি সহজ ছিল না। সংগীত সমাজ শিক্ষিত সাধারণের সে অভাব দূর করেছিল। বলতে গেলে আমাদের দেশে এইখানেই ক্লাব লাইফের আরম্ভ। রবীন্দ্রনাথ সংগীত সমাজের একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। তাঁর কোন কোন নাটক এখানেই প্রথম শিক্ষিত সাধারণের দ্বারা অভিনীত হয়। শুনেছি 'গোড়ায় গলদ' নাটকখানা সংগীত সমাজের সভ্যদের জন্যই বিশেষ করে লেখা হয়েছিল এবং তাঁরাই প্রথম অভিনয় করেছিলেন। কবি স্বয়ং প্রতিদিন রিহার্সেলে উপস্থিত থেকে এঁদের অভিনয় কৌশল শিক্ষা দিতেন। রিহার্সেল শেষে কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট থেকে জোড়াসাঁকোয় ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত, কোন দিন দেড়টা দুটো বাজত। এইসূত্রেই রসিকতা করে একদিন বন্ধুদের বলেছিলেন, রোজ রোজ বাড়ি ফিরে দেখি খাবার ঠাণ্ডা গিন্নী গরম। কথাটা পরে সংগীত সমাজের বন্ধু মহলে একটা প্রচলিত রসিকতায় দাঁড়িয়েছিল। যাক্ যে কথা বলছিলাম। 'গোড়ায় গলদ' অভিনয়ে কবি নিজে কোন ভূমিকায় নাবেননি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিল। নাটকের শেষ দৃশ্যে চন্দ্রবাবুর একটি

গান ছিল, কিন্তু যিনি চন্দ্রবাবু সেজেছিলেন তাঁর গানের গলা ছিল না। শেষ পর্যন্ত স্থির হ'ল রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কোন ছলে স্টেজে এসে গানটি গেয়ে দেবেন। শেষ দৃশ্যের অভিনয়সূত্রে চন্দ্রবাবু রঙ্গমঞ্চস্থ অন্য অভিনেতাদের উদ্দেশ করে বললেন, আমার বন্ধু কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আজ এখানে আসবার কথা আছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, ওঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেব। পরমুহূর্তেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবেশ। পরিচয়াদি হবার পরে অভিনেতাদের মধ্যে একজন বললেন, শুনেছি রবিবাবু খুব ভালো গাইতে পারেন, উনি যদি একটি গান করে শোনান তো বড় আপ্যায়িত হই। নিশ্চয়, নিশ্চয় বলে বাকি অভিনেতারা সমস্বরে ঐ প্রস্তাব সমর্থন করল। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ আপত্তি না করে একটি গান ধরলেন। বলা বাহুল্য ঐ গানটিই চন্দ্রবাবুর গাইবার কথা ছিল।

খুব সংক্ষেপে পান্তির মাঠের সামান্য একটু ইতিহাস বললুম। অবশ্য লৌকিক অর্থে এটা ইতিহাস নয়। যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকলে ইতিহাস হয় না। পলাশার যুদ্ধটা ইতিহাস অর্থাৎ যেখানে বাঙলা দেশ মরেছে সেটা ইতিহাস, যেখানে বাঙলা দেশ গড়ে উঠেছে সেটা ইতিহাস নয়। যে প্রচণ্ড ঝড়টা ডাল ভাঙ্গে, গাছ ওপড়ায, ঘরদোর ফেলে দেয এমন কি প্রাণনাশ করে তার কীর্তিকলাপ লেখা থাকে, কিন্তু যে মৃদু বসন্ত বাতাস ফুলের রেণু ছড়িয়ে যায়, নূতন সৃষ্টির বীজ বপন করে তার কথা ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। যথেষ্ট পরিমাণে কলরব করতে না পারলে কোন ব্যাপারই ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে না। ইতিহাসের মুখরতা যতখানি মূর্খতাও ততখানি। জানে না যে, সংসারের পরম বিস্ময় পরম নিঃশব্দে ঘটে।

যাক্ সে পান্তির মাঠও নেই সে কলকাতাও আর নেই। সাবেক কলকাতার অত্যন্ত মলিন মূর্তি। চারপাশে অনেক সব হালফ্যাশানের নতুন পাড়া গড়ে উঠেছে। কায়দাকানুনে সাবেক কলকাতা এদের

কাছেও ঘেঁষতে পারে না, কিন্তু কৌলিন্যের দিক থেকে এরা নিকৃষ্ট। চেহারাটাই ফচ্‌কে ছোড়ার মতো, সম্ভ্রম আদায় করবার মতো একেবারেই নয়। প্রাচীনে আর অর্বাচীনে যে তফাৎ এও তেমনি। বালিগঞ্জের চেহারা আপস্টার্টের চেহারা। এমন কি চোরবাগানের যে কৌলিন্য বালিগঞ্জ গার্ডেনস্ এর সে কৌলিন্য কোন কালে হবে কিনা সন্দেহ।

ব্যাঙ্ক ফেল

বাঙলা দেশে যখন যেটার হিড়িক পড়ে। কলেরা বসন্ত প্লেগ বন্যা সার্বজনীন দুর্গাপূজা যখন যেটা আরম্ভ হয় সেটাই মহামারীর আকার ধারণ করে। এবার পূজোর ঠিক আগটাতে হঠাৎ ব্যাঙ্ক ফেলের হিড়িক পড়ে গেল। তাসের ঘরের মতো একটার পর একটা ব্যাঙ্ক ওলটাচ্ছে, দেখে আমার বড় কৌতুক বোধ হয়েছিল। জানি পরের সর্বনাশে কৌতুক বোধ করাটা সৌজন্য সম্মত নয়, কিন্তু কি করব মনে মনে কিছুতেই হাসি চাপতে পারি নি। বাঙলা দেশের এতগুলো ব্যাঙ্ক ফেল পড়েও আমার এক পয়সা লোকসান ঘটাতে পারেনি, একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন এটা বড় কম কৌতুকের কথা নয়। ওদিক থেকে আমি সম্পূর্ণ নিরাপদ। দুনিয়ার সব ব্যাঙ্ক ফেল পড়লেও আমার টাকা মারা যাবার ভয় নেই, কেননা ব্যাঙ্কে আমার টাকা নেই।

আমার একটি বন্ধু প্রায়ই বলে থাকেন ব্যাঙ্ক ফেল, তহবিল তসরূপ এ সব নাকি বাঙালীর ন্যাশন্যাল ইন্‌ডাস্ট্রি। কথাটা স্বজাতি নিন্দার মতো শোনাত বলে কথাটাকে কোন কালে আমি আমল দিই নি।

এবারেও আমল দিয়েছি এমন মনে করবেন না। ব্যাঙ্কের ব্যবসাটা আসলে হচ্ছে পরের ধনে পোদ্দারি। বাঙালীরা পরের ধনে পোদ্দারি করতে জানে না বলেই বাঙালীর ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে। অন্য কোন জাতের ব্যাঙ্ক ফেল পড়তে তো কই বড় একটা শুনি না। বাঙালী ব্যাঙ্ক যে হামেশা ফেল পড়ছে সেটা নিন্দের কথা নয়। বরং এটাকে তার কৃতিত্ব বলেই ধরে নেওয়া উচিত। কিন্তু বাঙালী যে ক্রমে চরিত্রভ্রষ্ট হচ্ছে তার প্রমাণ এই ব্যাঙ্ক ফেল নিয়ে বাঙালা দেশে রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে গেছে। ব্যাঙ্কের মালিকদের সবাই মিলে বিষম গাল দিচ্ছে। এই ক'দিনের ধাক্কায় অনেক সব শ্রুত-কীর্তির কীর্তিনাশ হলো। অথচ আমি বলব এঁরা বাঙালীর মুখ রক্ষা করেছেন। কেননা, বাঙালী যেদিন খাঁটি ব্যবসাদার হবে সেদিন আর সে খাঁটি বাঙালী থাকবে না।

অবশ্য আপনারা বলতে পারেন অপরের গচ্ছিত ধন নষ্ট করা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজ; কিন্তু মনে রাখা উচিৎ যে, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজমাত্রই নীতি-বিরুদ্ধ কাজ নয়। অর্থনীতির মার্ক্সীয় ভাষ্যমতে মানুষের সঞ্চিত ধন অপরকে বঞ্চিত করা ধন। সঞ্চয় প্রবৃত্তি মানুষের দুষ্ট রিপু। বর্তমান সমাজের সমস্ত পাপের মূলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সঞ্চিত ধন। সে ধন যদি কোন কারণে নষ্ট হয়, তাতে পরোক্ষভাবে সমাজের কল্যাণ হতে পারে। সুতরাং যাঁরা ব্যাঙ্ক ফেল করাচ্ছেন, তাঁরা পরোক্ষভাবে সমাজের কাজ করছেন। অবশ্য এখানে কথা উঠবে যে টাকা কখনও নষ্ট হয় না। টাকা জিনিসটা একটা energy এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র মতে energyর লয় ক্ষয় নেই—একের টাকা অপরের ট্যাকে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তাহলেও এর একটা মূল্য আছে। এই ব্যাঙ্ক ফেলের মধ্যে একটি অতি কঠোর নীতির ক্রিয়া চলছে। অপরকে যে বঞ্চিত করবে সে নিজেও বঞ্চিত হবে। চোরাবাজারের টাকা বাটপাড়ের বাজারে যাবেই। চোরের চাইতে বাটপাড় মানুষ হিসাবে ভালো, কেননা চোর

ভালো মানুষকে ঠকায়, বাটপাড় চোরকে ঠকায়। চুরির চাইতে জোচ্চুরিটা যে উঁচু দরের আর্ট, একথা আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন।

এখানে অনেকে হয়তো বলবেন যে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা সবই তো আর অসৎ পথে অর্জিত টাকা নয়। অনেক নিরীহ ব্যক্তির সৎ পথে কষ্টার্জিত টাকাও নষ্ট হয়েছে। আমি বলব এসব নিরীহ ব্যক্তিরা অপরকে বঞ্চিত না করলেও নিজেদেরকেই বঞ্চিত করেছেন। অর্থাৎ যে টাকাটা ভালো খেয়ে ভালো পরে ভালোভাবে থেকে ব্যয় করতে পারতেন সেটা নিতান্ত লোভ বশত ব্যাঙ্কে জমিয়েছেন। যে ব্যক্তি নিজেকে ঠকায় সে সবচেয়ে বড় ঠক। যারা অপরের ধনে লোভ করে তাদেরকে বরং ক্ষমা করা যায় কিন্তু নিজের টাকার 'পরেই যার লোভ তার অপরাধের মার্জনা নেই। আমি সেই টাকাকেই বলি সদ্ভাবে অর্জিত যে টাকা সদ্ভাবে ব্যয়িত হয়। কাজেই উপরোক্ত নিরীহ ব্যক্তিদের প্রতি আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নেই।

কিন্তু আসল কৌতুকের কথাটা এখনও আপনাদের বলিনি। এই ব্যাঙ্ক ফেলের ব্যাপার নিয়ে একটা জিনিস গোড়া থেকেই লক্ষ্য করে আসছিলাম। পথে ঘাটে, ট্রামে বাসে, হাটে-বাজারে ক'দিন এ ছাড়া আর কথা ছিল না। যারই সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, আর মশাই বলেন কেন, ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে একেবারে বসিয়ে দিয়েছে। এত কষ্টের টাকা—যত সব ইত্যাদি ইত্যাদি। যতই মুখ শুকিয়ে বলুন না, এঁদের কথাবার্তায় কোথায় যেন একটু প্রচ্ছন্ন গর্বের ভাব আছে। তা আপনারও নিশ্চয় কিছু গেছে, কি বলেন? না মশায়, ব্যাঙ্কে জমাবার মতো টাকা থাকলে তবে তো যাবে। কথাটা বলতে গিয়ে নিজেই কেমন যেন লজ্জা পেয়েছি।

আমি যে অঞ্চলে বাস করি সেখানটায় সাধারণ মধ্যবিত্তের বাস—

ইস্কুল মাস্টার কিংবা আপিসের কেরাণী। ব্যাঙ্ক ফেল ইত্যাদি ব্যাপারে এসব অঞ্চলে কোন রকম চাঞ্চল্য ঘটবার কথা নয়। প্লেন্ লিভিং আর হাই থিংকিং-এর মন্ত্র জপ করে করে সবাইকার মনের ভেতরটাতে অবধি গেরুয়ার ছোপ লেগে গিয়েছে। আমার শীর্ণ মূর্তি এবং বেশভূষার শ্রী দেখলে আমার হাই থিংকিং সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কিন্তু এবারকার ব্যাঙ্ক ফেল—এ আমার মতো মানুষকেও নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। বেশ নামজাদা একটি ব্যাঙ্ক ফেলের পর ক্রমে কাণাঘুষার খবর আসতে লাগল ডাইনে বাঁয়ে সামনে পেছনে যেসব প্রতিবেশীরা বাস করেন, এঁদের সকলেরই কিছু কিছু টাকা ব্যাঙ্কে মারা গিয়েছে। টাকার অঙ্কটাও কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারে ফ্যালনা নয়। পাঁচ সাত শো, হাজার দু হাজার তো আছেই। উপরে একজনের চৌদ্দ হাজার পর্যন্ত গিয়েছে। এঁ্যাঃ তবে কি আমার প্রতিবেশীরা হাই থিংকিংএ বিশ্বাস করেন না? ভেতরে ভেতরে এতকালের চিত্তস্থৈর্য বিচলিত হয়ে উঠল, অবশ্যি বাইরে সেটা প্রকাশ পেতে দিই নি। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে, খবরটা অন্তঃপুরেও এসে পৌচেছে। গৃহিণীর মুখ বিষম ভার। মধুরভাষিণী একদিনেই রূক্ষভাষিণী হয়ে উঠেছেন। কেমন, খুব তো আমাকে বুঝিয়েছিলে, এখন দেখলে তো? আমাদের মতন অমন ভেতর-ফোঁপড়া কেউ নয়, সবারই কিছু না কিছু আছে। হেসে বললুম, আছে আর কই, সবই তো গেছে। গেলই বা, থাকলেই মানুষের যায়! আমাদের তো সে ওসাদটুকুও নেই।

আসলে হয়েছে কি শুনুন। পাড়ার গৃহিণীদের মধ্যাহ্ন মজলিশটা সেদিন আমাদের বাড়িতে বসেছিল। গৃহিণীরা একে একে তাঁদের ব্যাঙ্ক দুর্দৈবের ইতিবৃত্ত সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। সবাই কিছু বলেছেন, শুধু আমার স্ত্রী কিছু বলতে পারেন নি। কেরাণীবাবুর, অতি রুগ্ন স্ত্রীটি ঈষৎ হেসে বলছিলেন, আমার ভাসুরপো সরকারী

ব্যাঙ্কে কাজ করে কিনা। আগেই টের পেয়েছিল, তাই রক্ষে। বেশি না, এই শ আষ্টেক টাকা ছিল। ভাগ্যিস হপ্তাখানেক আগে তুলে নিয়েছিলুম। ঠাকুর খুব রক্ষে করেছেন।

যাক বোঝা গেল আমার প্রতিবেশীরা অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কিংবা হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন। আমরা যে এত বড় সুযোগ পেয়েও সর্বস্বান্ত হতে পারি নি, সেজন্যই সকলের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে হচ্ছে। গৃহিনী প্রসঙ্গক্রমে সেদিন যে সব মন্তব্য করেছিলেন, তার একটিরও জবাব দিতে পারি নি। আমি আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে এতদিন ধরে যে ‘ছোট ঘরে বড় মন’ ইত্যাদি ইস্কুলে শেখা বুলি আউড়েছি সেগুলো আমারই কাছে এখন ছোট মুখে বড় কথার মত শোনাচ্ছে।

যাক্ যা হবার তো হয়েছে। এখন বাঙলা দেশের যে কটি ব্যাঙ্ক এখনও টিকে রয়েছে, তাদের কাছে আমার একটি নিবেদন আছে। অদূর ভবিষ্যতে যদি কোন ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার সম্ভাবনা থাকে, তবে দয়া করে আমাকে যেন পূর্বাহ্নে একটু সংবাদ দেন। আমি ধারকর্জ করে হোক যেমন করে হোক অন্তত শখানেক টাকা জমা দিয়ে দেব, যাতে সকলের কাছে বলে বেড়াতে পারি যে ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি। সত্যি সত্যি দেখলুম কিনা ব্যাঙ্কে কিছু টাকা মারা না গেলে ঘরে-পরে কোথাও আর মান রক্ষা করা যায় না।

মাথার ছিট

আমার এই বন্ধুটি pun-রসিক। তিনি কথার মারপ্যাঁচ ভালবাসেন। কথাকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কোথায় যে নিয়ে যাবেন, তার ঠিকানা নেই। তাঁর কাছে কথা মাত্রই কথার কথা। কথায় যে কথা বাড়ে, এঁকে দেখেই প্রথম বুঝলুম। পানরসের ন্যায় pun রসেও মাদকতা আছে, কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে দুটোর ফলই শোচনীয় হয়ে ওঠে—একটায় মাতলামি আরেকটায় ভাঁড়ামি। মাত্রা ঠিক থাকলে পান দোষও তেমন দোষণীয় নয়। আর মাত্রা-মাজিত pun-এর তো কথাই নেই। দিশী বিলিতি সব শাস্ত্রেই তাকে ভাষার অলংকার বলা হয়েছে। সাহিত্যিকরা pun-এর সাহায্যে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। বিদগ্ধ সমাজের বিশ্রম্ভালাপে দেখেছি pun মুখে মুখে বিস্তারিত হয়ে চকমকি পাথরের ফুলকির মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গান্ধীজী যখন বৃদ্ধ বয়সে রেস্ট-কিওরের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন সহাস্যে তাঁকে এ্যারেস্ট-কিওরের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিংবা অতিরিক্ত ভোজনে কাতর অতিথিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ যখন সস্নেহ কৌতুকে বলেন, ওহে প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের কথা শুনেছি, কিন্তু আহারেণ ধনঞ্জয়ের কথা তো শুনিনি, তখন pun রস ভোজ্য বস্তুর চাইতেও উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

আমার বন্ধুটীর pun-এও মাঝে মাঝে দিব্য ঝাঁঝ থাকে। তবে যখন-তখন যত্র-তত্র করেন বলে কখনো কখনো মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সেদিন মন্ত্রিমণ্ডলীর উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি যখন কালীপদবাবু এবং খালিপদবাবুর নাম করছিলেন, তখন সত্যি আমার মেজাজ বিগড়ে

গিয়েছিল। পাঁজা মশাই-এর মতো bare-footed মন্ত্রীতে আমাদের আপত্তি নেই, মন্ত্রীরা bare-faced না হলেই হ'ল।

ঐ দেখুন, আসল কথার ধারে-কাছেও নয় আবোল-তাবোল বকেই চলেছি। pun সম্বন্ধে তো লিখতে বসিনি। অবশ্যি যে বস্তুটা নিয়ে লিখব ভেবেছি, আমার বন্ধুকৃত একটা pun থেকেই সে কথাটা উঠল। ছেলেপিলের জামা করানো দরকার। ছিটের কাপড় খুঁজছিলাম। বন্ধুকে জিগ্যেস করলুম, ছিট কোথায় পাওয়া যায় বলতো? বন্ধু বললে, কেন, মাথাতেই ঢের আছে। শুনুন কথা, আমার মাথায় নাকি ছিট আছে। বোধ করি মনে মনে চটেছিলাম। বললুম, বেশ তো, আমার মাথায় তবু তো ছিট আছে, বেশির ভাগ মানুষের মাথায় যে কিচ্ছু নেই, মাথা বেমালুম ফাঁকা।

Pun-এর খোঁচায় চটেছিলাম। নইলে মাথায় ছিট আছে বলতে আমি বুঝি মাথায় কিছু পদার্থ আছে। সত্যি বলতে কি মাথায় যাদের ছিট নেই, তাদের মাথায় কিচ্ছু নেই। সাধারণ আর অসাধারণের তফাৎটাই ওখানে। সংসারে পনেরো আনা মানুষই অত্যন্ত শীতল মস্তিষ্ক অর্থাৎ গতানুগতিক কিংবা বলতে পারেন অতি সাধারণ। খায় দায় ঘুমোয় ছাতা বগলে গলাবন্ধ কোট গায়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। সংসারের যেটুকু বৈচিত্র্য, সেটুকু আসচে বাকি একআনা মানুষের কাছ থেকে, যাদের মাথায় কিঞ্চিৎ ছিট আছে। সবাই বলচে, স্রোতে গা ভাসিয়ে নতুনের initiative যোগাচ্ছে সমাজের মুষ্টিমেয় ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি। এরা না থাকলে সমগ্র মানবসমাজের চেহারাটা হ'ত লেপাপোঁছা নাকথাঁদা মানুষের মতো—ধারালো ছুঁচলো কিছুই থাকত না।

ছিটগ্রস্ত মানুষের যে বদনাম তার আসল কারণটা খুব স্পষ্ট—আর দশজনের মতো হওয়াটাই নিয়ম, না হওয়াটাই ব্যতিক্রম। নিয়মের ব্যতিক্রমকে লোকে সুনজরে দেখে না। অপরের মতো চলুন লোকে

প্রশংসা করবে। আর নিজের মন মতো চলুন, বলবে মাথায় ছিট আছে। অমিট রায়ে লোকটা যে ছিটগ্রস্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। চলনে বলনে কাজে কর্মে তার প্রমাণ রয়েছে প্রচুর। অমিট্‌এর সৃষ্টিকর্তা গোড়াতেই বলে রেখেছেন, ও আর পাঁচজনের মতো নয়, একেবারে পঞ্চম। এই যে ব্যক্তিত্বের পঞ্চমত্ব, একেই বলে অসাধারণত্ব। অপর পক্ষে ব্যক্তিত্বের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলেই লোকটা হরেদরে সাধারণ হয়ে গেল। ব্যক্তিত্ব যেখানে অপ্রকাশ, সেখানে মানুষটা ব্যক্তিবিশেষ আর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেলেই বিশেষ ব্যক্তি।

আরো দেখুন রতনেই রতন চেনে। ইঙ্গবঙ্গ সমাজের অত সব চকচকে ঝকঝকে মেয়ে থাকতে অমিট খুঁজে পেতে লাবণ্যকে বের করল কেন? আর কেন? লাবণ্যরও যে মাথায় ছিট। সে-ও আর পাঁচজনের মতো নয়। অমিট নিজেই বলছে—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।

কেটি মিত্তিরের মতো অপরের ছাঁচে ঢালাই করে নিজেকে ও অপরূপ করে তোলে নি, আপন স্বরূপটি বজায় রেখেছে। ভাগ্যিস মাথায় ছিট ছিল, নইলে সে-ও সিসি-লিসির দলে ভিড়ে যেত। সিসি লিসি কেটি—এরা সব নাক উঁচুর দল, কিন্তু নাক উঁচু হ'লেই মাথা উঁচু হয় না। মাথা উঁচু রাখতে হ'লে মাথায় ছিট থাকা চাই।

মাথার ছিট জিনিসটা আসলে হচ্ছে মানুষের প্রতিভা। এ যুগের সব চাইতে ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং গান্ধীজী। তাঁর ক্রিয়াকলাপ সমস্তই সাধারণ মানবিক নিয়মের বহির্ভূত। তিনি ব্যারিষ্টার সাহেব, কিন্তু সাহেব হয়েও তিনি কৌপিনধারী, আইনজ্ঞ হয়েও তিনি আইন অমান্যকারী। পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রান্ত শক্তির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু কদাপি অস্ত্রধারণ করেন নি। গান্ধীজীর যেসব চ্যালারা মাথার

গান্ধীটুপি পরে দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করেছেন, তাঁরা মস্তকে গান্ধীটুপি ধারণ না করে যদি মস্তিষ্কে কিঞ্চিৎ ছিট পোষণ করতেন, তবে দেশের ঢের বেশি কল্যাণ হ'ত। মাথার ওপরে যা থাকে তা দিয়ে মানুষের বিচার নয়, মাথার ভেতরে কি থাকে, তাই দিয়েই মানুষের মূল্য। গান্ধীজীর মাথার ছিট ছিঁটে-ফোঁটা পরিমাণেও এঁদের মাথায় থাকলে দেশ থেকে অন্তত কালোবাজারের কালিমা দূর হতো।

মাথার ছিট সম্বন্ধে কেউ যদি গবেষণা করেন, তবে দেখতে পাবেন যে, জিনিসটা সভ্যতার বাই-প্রডাক্ট। অসভ্য মানুষের মাথায় ছিট থাকতে পারে না। কারণ ওদের জীবন খুব মোটা রকমের কয়েকটা অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অভ্যাস নিয়ন্ত্রিত জীবন যেদিন থেকে বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সেদিন থেকেই সভ্যতার শুরু। আবার দৈনন্দিন জীবনযাপনে অবশ্য প্রয়োজনীয় যে সামান্য বুদ্ধিটুকু তার মধ্যে মাথার ছিটের অবকাশ নেই। অবশ্য প্রয়োজনীয় বুদ্ধিকে ছাপিয়ে যে উদ্বৃত্ত বুদ্ধিটুকু মাথা থেকে উপচে পড়ে, তাকেই বলে মাথার ছিট। সে বুদ্ধিটা সংসারী বুদ্ধি নয়, প্রায়ই সংসারবিরোধী। এইজন্যই সংসারী লোকেরা ছিটগ্রস্ত মানুষকে ভয় করে চলে। কিন্তু এ কথা সত্য যে, সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ছিটগ্রস্তের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলবে। আবার সেই সঙ্গে ছিটগ্রস্তদের ছিটও ক্রমে সাধারণ মানুষের গা-সহা হয়ে আসবে। অসাধারণ মানুষের মাথার ছিট সাধারণ লোকেরা যে পরিমাণে বরদাস্ত করে নেবে, সভ্যতা সেই পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করবে।

ঐতিহাসিকরা ঠিক বলতে পারবেন, কিন্তু আমার মনে হয়, সভ্য যুগের সর্বপ্রথম ছিটগ্রস্ত ব্যক্তি হচ্ছেন সক্রেটিস। তিনি যেসব কথা বলতেন এবং যেসব কাজ করতেন, সেকালের গ্রীকদের কাছে তা অশ্রুতপূর্ব এবং অদৃষ্টপূর্ব। তাই সক্রেটিসকে তাঁরা একেবারে বরদাস্ত

করতে পারে নি ; একটা প্রচণ্ড উপদ্রব বলে মনে করেছে। রাগের সবচেয়ে বড় কারণ, লোকটা জোর করে সবাইকে ভাবিয়ে নিয়েছে। সব কথাতেই বলে—কেন ?—The why of it. জোর করে কাজ করিয়ে নিলেও লোকে অত চটে না, যত চটে জোর করে ভাবিয়ে নিলে। লোকে তার শোধ তুলেছে—জ্যান্ত উপদ্রবটাকে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

কেন জানি না, সক্রেটিসের কথা ভাবলেই আমার বিদ্যেসাগরের কথা মনে হয়। শারীরিক এবং মানসিক গঠনে এ দুইয়ের মধ্যে কোথাও একটা সাদৃশ্য আছে। সক্রেটিসের মতো বিদ্যেসাগর মশায়ও সে যুগের বাঙালী সমাজকে ভিৎশুদ্ধ নেড়ে দিয়েছিলেন। নিষ্ঠাবান শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়েও হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। অপরাধ কম নয়। বিষ খেয়ে যে তাঁকে মরতে হয়নি, এ তাঁর পরম ভাগ্যি। মাথায় অতখানি ছিট রেখেও যে মাথাটা বাচাতে পেরেছেন তার কারণ পূর্বেই বলেছি। অসাধারণ মানুষের মাথার ছিট সাধারণ মানুষের গা-সহা হয়ে এসেছে। এখন আর ছিটগ্রস্তের মুখে বিষভাণ্ড এগিয়ে দেয় না, নিজেদের মুখ থেকেই বিষোদ্গীরণ করে। দু' হাজার বছরে সভ্যতা এতটুকু অন্তত অগ্রসর হয়েছে।

বিরানব্বুই বছর

বার্নার্ড শ এর বিরানব্বুই বছর পূর্ণ হ'ল সাহিত্য জগতে এটা মস্ত বড় একটা ঘটনা। ইতিপূর্বে জগৎ প্রসিদ্ধ কোনো কোনো সাহিত্যিক আশির কোঠায় পৌচেছেন, কিন্তু নব্বুই-এর কোঠায় কাউকে পৌছতে শুনিনি। আমরা মর জীব, কেউ যদি দীর্ঘজীবী হয়ে সুদীর্ঘকাল মরণকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেন, তাহলে মনে মনে আমরা খুশি হই। অবশ্য বার্নার্ড শ শুধুই যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে এমন কিছু বড় কথা হতো না, কিন্তু বিরানব্বুই বছরেও মনকে তিনি এতখানি সজীব এবং সজাগ রেখেছেন যে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। বয়স এই মানুষটির কাছে হার মেনেছে।

এই সেদিন কোথাকার কাগজে খবর বেরিয়ে গিয়েছিল বার্নার্ড শ'র মৃত্যু হয়েছে। শ' তাতে ঘোরতর আপত্তি জানিয়েছেন, উঁহুঁ এখনও মরিনি, আধমরা হয়ে আছি, এই যা। কিন্তু বার্নার্ড শ সত্যি সত্যি আধমরা হয়ে আছেন, এ কথা ভাবা শক্ত। আমার তো মনে হয় এখনও এমন পর্যাপ্ত পরিমাণে বেঁচে আছেন যে দুনিয়া শুদ্ধ আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে পারেন। এমন মানুষের মৃত্যু যখনই ঘটুক, বলব অকাল মৃত্যু। আমাদের দেশে বাহাত্তরের একটা বিভীষিকা আছে। ঐখানটায় বয়সের একটা সীমানা টেনে দেওয়া হয়েছে, এর পরে আর মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিশ্বাস করতে নেই। ওটা ভীমরথের রাজ্য। বার্নার্ড শ বাহাত্তরের সীমানা পার হয়েছেন, কুড়ি বছর আগে। অথচ বুদ্ধিতে আজ পর্যন্ত এতটুকু মরচের দাগ পড়েনি। খাপখোলা (খাপছাড়া বললে ভালো হয়) তরবারীর মতো

শাণিত তাঁর বুদ্ধি। বোধ করি তাঁর ভয়ে ভীমরথ রাজ্যি ছেড়ে পালিয়েছে। পঞ্চাশ বছর আগে যেমন ভয়ংকর রকমের চমক লাগানো সব কথা বলেছেন, আজও অনায়াসে তেমনি বলছেন। তাঁর অক্ষয় তূণ থেকে সুতীক্ষ্ণ বাক্যবাণ অবিশ্রাম নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

ছাত্রাবস্থায় ওঁর বই পড়ে বাক্‌চাতুর্যে চমৎকৃত হয়েছি, আপাত-বিরোধী বাক্যস্রোতে বিভ্রান্ত বোধ করেছি। ভদ্রলোক এত কথাও বানিয়ে বলতে পারেন! শুধু সাহিত্যসৃষ্টিতে নয়, সাধারণ বাক্যালাপেও যে কোন ব্যক্তিকে অনায়াসে ঘায়েল করে ছাড়েন। শিষ্টব্যক্তির পক্ষে ওঁর সংগে শিষ্টালাপ করা বিড়ম্বনা। অমিট্ রায়ের মতো বোধ করি সকালবেলায় উঠেই ভেবে রাখেন আজকের দিনে কি কি উদ্ভট কথা বলে দুনিয়ার লোককে চমকে দেবেন। ভালো মানুষদের পিলে চমকে দেওয়াই ওঁর বিশেষ একটা কাজ। অমিটের মুখে একটা উদ্ভট বাক্য শুনে সিসি বলেছিল, অমিট্, একথাটা বোধকরি আগে থেকেই তোমার নোট বই এ টোকা আছে। অমিট্ বললে, নিশ্চয়, সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকাকেই বলে সভ্যতা। বর্বরতা সব সময়েই অপ্রস্তুত। বলা বাহুল্য বার্নার্ড শ জীবনে কখনো অপ্রস্তুত হননি, কিন্তু দুনিয়াশুদ্ধ মানুষকে অপ্রস্তুত করে বেড়িয়েছেন।

বাক্‌চাতুর্যে তিনি এ যুগের ডক্টর জনসন। দু'জন এক যুগের মানুষ হলে সেখানে সেখানে কোলাকুলি হতে পারত কিংবা গালাগালি। সাহিত্যিক হিসেবে জনসনের চাইতে শ বড়, কিন্তু সাহিত্য জগতে ডক্টর জনসনের যে আসন বার্নার্ড শ সে আসন লাভ করতে পারেন নি। তার কারণ, আজকাল পলিটিক্সে যদি বা ডিক্টেটরি চলে, সাহিত্যক্ষেত্রে ও জিনিসটা অচল। জনসনকে সে যুগের লোক বিনা প্রশ্নে মেনে নিয়েছিল। এ যুগের লোক শ'র সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন করেছে, কিন্তু তাঁকে মেনে নেয়নি। তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল যতখানি, ভক্তি

ততখানি নয়। ডক্টর জনসন আরেকদিক থেকেও শ'এর চাইতে বেশি ভাগ্যবান। তাঁর বস্‌ওয়েল ছিল, শ'এর বস্‌ওয়েল নেই। সে আমলের বস্‌ওযেলরা এ আমলে প্রেস রিপোর্টার হয়ে জন্মেছেন। এঁরা ব্যস্তবাগীশ মানুষ. ঘড়ি ধরে ইণ্টারভিয়ু আদায় করেন। সে ইণ্টারভিয়ুতে আর যাই থাক্ অন্তর্দৃষ্টি থাকে না।

শ এর মধ্যে যে জিনিসটা সবচাইতে মনকে বেশি টানে, সেটা তাঁর অহং ভাব। অহংকারী মানুষের একটা বিশেষ রূপ আছে, এ যুগের সাহিত্য জগতে শ সবচেয়ে colourful personality. সেক্সপিয়রকে গদিচ্যুত করে তিনি নিজে নাট্য সিংহাসন দখল করে বসবেন, এত বড় অহমিকা শ ছাড়া আর কেউ প্রকাশ করতে পারতেন না। বিশেষ করে ইংলণ্ডের মতো দেশে এটা অসমসাহসের কথা; কারণ, ওদেশে রাজ-সম্রাট এবং সাহিত্য সম্রাটের প্রতি ভক্তি অচলা এবং অটলা।

বার্নার্ড শ'র সাহিত্য দীর্ঘস্থায়ী হবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর জীবদ্দশাতেই লোকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে; তার কারণ, তাঁর সাহিত্যে রসাত্মক বাক্যের চাইতে শ্লেষাত্মক বাক্যের বেশি প্রাধান্য। সাহিত্যের মধ্যে wit এর স্থান অবশ্যই আছে, কিন্তু কেবলমাত্র wit সাহিত্যের স্থান গ্রহণ করতে পারে না। তা ছাড়া যে সমাজের প্রতি তিনি শ্লেষ উদ্গীরণ করেছেন, সে সমাজ দুদিনের। সমাজ যখন বদলাবে শ্লেষের ধার আপনি কমে আসবে।

এ যুগে মানুষ অনেকখানি বদলে গেছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় যে পুরুষ যতখানি বদলেছে তার তুলনায মেযেরা বদলেছে অনেক বেশি। পুরুষের পরিবর্তন হয়েছে ক্রমিক নিয়ম অনুসারে ধাপে ধাপে। মেযেরা অনেকদিন ছিল এক জায়গায থমকে দাঁড়িয়ে। তারপরে যেদিন পরিবর্তনের ধাক্কা এল সেদিন হঠাৎ বদলাতে লাগল হুড়মুড় করে। ছেলেদের পরিবর্তন evolution এর অপেক্ষাকৃত সমতল ক্ষেত্রে,

মেয়েদের পরিবর্তন revolution-এর চড়াই উৎরাই ভেঙ্গে। সনাতন নারীর আদর্শ সীতা, সাবিত্রী। আধুনিক নারীর আদর্শ Doll's House এর নোরা। ভারতবর্ষ নারী মাত্রকেই বলেছে—সাবিত্রী সমানা হও, ইয়ুরোপ বলেছে নোরার মতো অসামান্য হও। স্বামীর হয়ে দেবতার কাছে ভিক্ষা চেযো না, আদালতে গিয়ে কাজির কাছে ডিভোর্স আদায় কর। নোরা স্বামীর গৃহে খেলার পুতুল হয়ে থাকতে চায় নি, স্বামীগৃহ ত্যাগ করে এসেছিল। বেরিয়ে আসবার সময় স্বামীগৃহের দরজাটি এমন সশব্দে ভেজিয়ে দিয়ে এসেছিল যে, সেই শব্দে সমস্ত ইয়ুরোপ সেদিন চম্‌কে উঠেছে। আর যে সব সাহিত্যিকের মনে সে শব্দটা অনুরণন তুলেছিল তার মধ্যে বার্নার্ড শ সর্বপ্রধান। শ সনাতন-পন্থী নন, ইবসেনপন্থী। ইবসেনি ইস্কুলে তাঁর সাহিত্যের হাতেখড়ি। শ'এর প্রত্যেক নাটকের গোড়াতে যেমন সুদীর্ঘ ভূমিকা তেমনি তাঁর সমগ্র নাট্যজীবনের ভূমিকায় আছে তাঁরই লেখা—The Quintessence of Ibsenism.

ইব্‌সেনোত্তর যুগে ইয়ুরোপে যে নারীর জন্ম হয়েছে, তাকে বলা হয়েচে, the new woman. দুঃখের বিষয় এই new woman কথাটা আমি ভালো বুঝিনে। আমার যাঁরা পাঠিকা তাঁরা নিশ্চয় old women নন, কিন্তু তাঁদেরকে new women বলতেও কেমন বাধ বাধ ঠেকে। তাঁদের বসন-ভূষণ এমন কি মননেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু মনের ভিত শুদ্ধ নড়েছে বলে মনে করিনে। বাইরের প্রলেপটুকু ছেড়ে দিলে মনের অন্তস্তলে একালের নিপুণিকা চতুরিকারা সেকালের মঞ্জুলিকা পত্রলিখার মতোই আছেন। সত্যিকারের যে রমণী সে একেলেও নয় সেকেলেও নয়, সর্বকালের রমণীয়তা তার একমাত্র গুণ।

প্রমাণ শ এর নাটকেই। ভিভি ওয়ারেনকে না হয় বলতে পারেন, আনকোরা নতুন, কিন্তু ক্যাণ্ডিডাকে বলবেন কি? ক্যাণ্ডিডা কেরাণীর ঘরণী। স্বামীটি ভালোমানুষ। তার এক কবি-বন্ধু জুটেছে। কবিটি বন্ধুপত্নীর প্রণয়াসক্ত। সোজাসুজি বলে দিয়েছেন, আমাদের দুজনের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে হবে। স্বামী বন্ধুর মতলবটা টের পেয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর উপরে একটুও জোর খাটায়নি। স্ত্রী তো তার সম্পত্তি নয়। জোর খাটাতে গেলেই মুশকিল হতো। ক্যাণ্ডিডা স্বামীকেই বেছে নিলে। সে নইলে তার ভোলানাথ স্বামীকে দেখবে কে? এ ক্ষেত্রে স্বামীটিকেই বরং একেলে বলতে পারেন। কারণ, স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে সে মেনে নিয়েছে। কিন্তু ক্যাণ্ডিডাকে কি আপনারা একেলে বলবেন? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে নাটকের ভূমিকা যত ভয়ংকর আসলে শ এর নাটক তত ভয়ংকর নয়। ভূমিকায় যে বিদ্রোহবহ্নি জ্বলেছিল,নাটকের শেষ অংকে সেটি নিবে এসেছে। Getting married নাটক তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তার টেকনিকেরও বাহাদুরি আছে। ভূমিকায় যে সমস্যার অবতারণা করা হয়েছে, নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিরা গৃহস্থের রান্নাঘরে বসে সেই সমস্যা নিয়েই আলোচনা করছে। সমস্যার অবতারণাটা বিদ্রোহাত্মক, কিন্তু মীমাংসাটা আপোসগ্রাহ্য। আর আপনারা যাকে বলেন action কিংবা movement নাটকের মধ্যে তার ছিঁটে-ফোঁটাও নেই। অর্থাৎ নাটকটা একটুও নাটুকে নয়। অথচ বাক্যভঙ্গিতে এবং প্রসাদগুণে জিনিসটা সাহিত্য পদবাচ্য হয়েছে।

শ এর সব চাইতে বড় কৃতিত্ব তিনি Conventional moralityকে আস্কারা দেন নি। সমাজে respectability বলে একটা পদার্থ আছে। আপদটা সারাক্ষণ চোখ রাঙিয়ে বলছে, খবরদার মন যা চায় তা কোরো না, মান খোয়া যাবে। বার্নার্ড শ এই ভুয়ো respectabilityকে পাঠকের চোখে নিতান্ত হাস্যাস্পদ করে দেখিয়েছেন। মান বড় না

মন বড় ? তাঁর নায়ক সম্ভ্রান্ত গৃহস্বামীর কন্যাকে ছেড়ে চাকরাণীর সঙ্গে প্রেম করছে। বুর্জোয়া সমাজের চোখে অত্যন্ত গর্হিত কাণ্ড। কিন্তু শ বলছেন, তোমার ভালোবাসা তোমার ব্যাপার, সমাজ যা ইচ্ছে বলুক না।

ফুল বিক্রেতা রমণীকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তাকে মার্জিত উচ্চারণ ভঙ্গি শেখানো হচ্ছে। বিজড়িত বিলম্বিত অক্সফোর্ডি ড্রল শিখিয়ে সমাজে তাকেই ডাচেস বলে চালু করে দিয়েছেন। অর্থাৎ বলতে চান, তোমরা যাকে বল আভিজাত্য সেটা মূলতঃ উচ্চারণ কৌশল মাত্র। ঠাট-ঠমকটা আয়ত্ত করতে পারলে নকল জিনিসও আসল বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

শ বামপন্থী সাহিত্যিক। তিনি যে সমাজবিপ্লব চেয়েছেন তার বাহন নারী। আধুনিক সমাজে পুরুষের আধিপত্য। সেই আধিপত্য পাছে খোয়া যায় এই ভয়ে তারা সব রকম পরিবর্তনের বিরোধী। এক কথায় পুরুষরা re-actionary. নারীকে টলাতে পারলে তবে সমাজ টলবে। সেজন্য তাঁর সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্বকথা শুধু বুদ্ধিমতী মেয়েদের কাছে নিবেদন করেছেন—An intelligent woman's guide to Socialism.

বুদ্ধিমতী কথাটায় ধোঁকা লেগেছিল। মেয়ে মাত্রই কি বুদ্ধিমতী ? শ নিজেই তার শেভিয়ান ভাষ্য দিয়েছেন। বলেছেন, বুদ্ধিমতী মেয়েদের জন্য বই লিখেছি। যাঁরা বই কিনবেন তাঁরা কিনেই প্রমাণ করবেন যে, তাঁরা বুদ্ধিমতী। সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, বই এর দাম দশ শিলিং। দুর্মূল্যের বাজারে দাম নিশ্চয় আরো বেড়েছে, ফলে বুদ্ধিমতীদের সংখ্যাও নিশ্চয় কমেছে।

উপসংহারে এই প্রশ্ন উঠতে পারে, শ এর সাহিত্যিক মূল্য বাড়তির দিকে না কমতির দিকে ? সোজাসুজি জবাব না দিয়ে এইটুকু শুধু

বলা চলে, বুদ্ধিসর্বস্ব সাহিত্যিকের পরিধি বড় সংকীর্ণ। মানুষ যদ্দিন বেঁচে থাকে তদ্দিন বুদ্ধিটা খুবই কাজে লাগে, কিন্তু মরবার পরে বুদ্ধি কোন কাজে আসে না। মরবার পরেও যাঁরা বেঁচে থাকতে চান তাঁদের হৃদয়বত্তা থাকা চাই। শ-এর সাহিত্যে হৃদয়বত্তার অভাব। এই হৃদয়বত্তার অভাবে শ সংসারে বহু জিনিসের পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছেন, ঠিক মর্মমূলে পৌছতে পারেন নি।

২২শে শ্রাবণ স্মরণে

শুনেছি নাকি কোন্ এক ব্যক্তি গ্রীক পণ্ডিত এ্যারিস্টটলকে জিগ্‌গেস করেছিল, এক পায়ে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যায় তারই মধ্যে গ্রীক দর্শনের সারমর্ম বলে দিতে পারেন? গ্রীক পণ্ডিত উক্ত প্রশ্নের জবাবে কি বলেছিলেন সে আমি জানিনে; কিন্তু বেশ মনে আছে আমি যখন কলেজে পড়ি তখন জনৈক সহপাঠী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে বড় দান কি, এক কথায় বলতে পার? এ প্রশ্নের বহরটাও উপরোক্ত প্রশ্নের চাইতে কিছু কম নয়। যে কোন দার্শনিক পণ্ডিত ঘাবড়ে যেতে পারতেন। কিন্তু আমি কিছুমাত্র ভয় পাইনি। অল্প বয়সের প্রগলভতার ঐ একটি গুণ। তখন কোন প্রশ্নকেই ডরাই না, জবাব দিতেও মুহূর্ত বিলম্ব হয় না। এ ক্ষেত্রেও প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই জবাবটা বেরিয়ে এসেছিল। বলেছিলাম, এই অকাল বার্ধক্যের দেশে রবীন্দ্রনাথ যৌবনকে ফিরিয়ে এনেছেন। সেদিনের সেই নিঃসংশয় প্রগলভ জবাবে বন্ধুবর কি ভেবেছিলেন জানি

না। আজ চল্লিশের কোঠায় এসে পৌচেছি। এখন ভেবে চিন্তে কথা বলি। কিন্তু আজও যদি কেউ এসে ঐ প্রশ্নটি জিগগেস করেন তবে নিঃসন্দেহে বলতে পারি মুখ থেকে ঐ একই জবাব বের হবে। রবীন্দ্রনাথ যৌবনের কবি এবং আমার মতে যৌবনই জীবন।

ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশ। অস্থি মজ্জায় তার প্রবীণতা, হিমালয়ের মতো অটল তার গাম্ভীর্য। প্রবীণতা জিনিসটা এমনিতে হয়ত খারাপ নয়, কিন্তু যুগ যুগান্তের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে হতে জাতির প্রবীণতা ক্রমে স্থবিরতায় পরিণত হয়। সেই বিষম বিপত্তির যুগ আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় দর্শনে কোথাও একটি উদাসীন ভাব আছে যা মানুষকে সংসার-বিমুখ করে তোলে। এই সংসার-বিমুখতাই বার্ধক্যের লক্ষণ। মোহমুদ্গরের দেশ অকাল বার্ধক্যের দেশ। মুদ্গরের আঘাতে মেরুদণ্ড ভাঙবে তাতে আর আশ্চর্য কি ? মোহভঙ্গের তপস্যা তো বার্ধক্যেরই তপস্যা। মোহকে দূর করে করে জীবনকে এরা শুষ্ক শীর্ণ ঊষর করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে আবার মোহের জাল রচনা করেছেন। সেইখানেই রবীন্দ্রকাব্যের সম্মোহন শক্তি। মহাদেবের তপোভঙ্গ করেছিলেন গৌরী আর মহাভারতের তপোভঙ্গ করেছেন আমাদের কবি।

শংকরাচার্য বলেছেন—সংসারোঽয়ম্ অতীব বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথও ঠিক ঐ কথাটিই বলেছেন, কিন্তু ভিন্ন অর্থে। বলেছেন চেয়ে দেখ, কি বিচিত্র এই সংসার—রূপে রসে গন্ধে স্পর্শে কি বিচিত্র এই ধরণী। সে রূপের আর অন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে দেখেছি বলেই এই শ্যামল পৃথিবীকে এত সুন্দর দেখ্‌লুম। যে দেশে সব কিছুকে মায়া বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা সে দেশে জীবনের প্রতি মায়া বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। ভারতীয় দর্শন মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে খুঁজেছে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের চোখের সামনে, মুখের কাছে জীবনের সুধাভাণ্ড তুলে ধরেছেন।

আকণ্ঠ পান করেও তৃষা মিটছে না। যে দেশের লোক বলে মরলেই বাঁচি সে দেশে যিনি জীবনকে, সংসারকে মনোহর করে দেখিয়েছেন তিনি শুধু কাব্য-শিল্পী নন, জীবন শিল্পী।

ইতিহাসে দেখা গেছে জগতের সব প্রাচীন জাতিই ক্রমে জীবনের সদর রাস্তা ছেড়ে আঁধা গলিতে এসে বাসা বাঁধে। ভারতবর্ষেও তাই ঘটেছিল। সদর রাস্তার বার্তা প্রথম দিয়েছিলেন রামমোহন। তারপরে রবীন্দ্রনাথ একেবারে হাত ধরে আমাদের এনে দিলেন বৃহত্তম জগতের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে, চৌমাথার ধারে। বললেন, যেদিক খুশি চল, রাস্তা ভুল হয় তো হোক। তিনি যে সাবধানী পথিককে বারেক পথ ভুলে ঘুরে মরতে বলেছেন সে পথিকটি আমাদের এই প্রাচীন ভারতবর্ষ।

স্থবিরতার সব চাইতে বড় লক্ষণ গতানুগতিকতা। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গতানুগতিক জীবনকে নির্দয় আঘাত করেছেন। 'দস্যুর মতো ভেঙেচুরে দেয় চিরাভ্যাসের মেলা।' এই দস্যুটি কে? আপনারা যাই বলুন, রবীন্দ্রনাথকে ঋষি-কবি হিসেবে না দেখে দস্যু কবি হিসেবে ভাবতে আমার ভালো লাগে। এখানে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আমাদের আদি কবি বাল্মিকীও যৌবনকালে দস্যু ছিলেন। মহাকবিরা শুধু কাঁদুনি গায়না করেন না, দস্যিপনাও করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঘুম-ভাঙানীয়া কবি। রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুরটি সবপ্রথম ধরা দিয়েছে নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে। গিরিগুহা ত্যাগ করে সেইদিন যে নির্ঝর দুর্বার গতিতে নির্গত হয়েছে দীর্ঘ আশি বৎসরের কাব্য সাধনায় একদিনের জন্য সে গতিবেগ শিথিল হয়নি। সেই কারণেই রবীন্দ্রকাব্য উর্বশীর ন্যায় অনন্ত যৌবনা। যৌবন বেদনারসে উচ্ছল তাঁর দিন। তাঁর কাব্যসৃষ্টির আবেগ সেই যৌবন বেদনা থেকে উদ্ভূত। তিনি চিরচঞ্চল, চির নিদ্রাহীন। প্রশ্ন হতে পারে এই নিদ্রাহীন চাঞ্চল্য কবির

মনে কোথা থেকে এল? সহজ কথায় বলতে গেলে অস্থির চাঞ্চল্য কবিদের স্বভাবগত। কেবলমাত্র বেঁচে থাকবার জন্য যেটুকু প্রাণশক্তির আবশ্যক সেখানে মানুষটা আটপৌরে। আর উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তি নিয়ে যে মানুষের কারবার সেই মানুষই কবি, শিল্পী, বীর। এই উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তির নামই যৌবন।

যৌবনের প্রারম্ভেই পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ঘটেছিল। তার ফল ভালো ছাড়া খারাপ হয়নি। য়ুরোপের জীবন-সম্ভোগ-প্রিয়তা তাঁর কাব্যে মায়া বিস্তার করেছে, কিন্তু তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করেনি। জীবন-বিলাসী য়ুরোপ বলেছে— I will drink life to the lees. আমাদের কবিও জীবনকে আকণ্ঠ পান করেছেন—যা কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে—শুধু এইটুকু বলেই যদি ক্ষান্ত হতেন তবে বলতুম রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপের বার্তাবহ মাত্র—কিন্তু পরক্ষণেই বলেছেন—তোমার আনন্দ রবে তারই মাঝখানে। এখানে তিনি ভারতবর্ষের মুখপাত্র। প্রাচ্য পাশ্চাত্যের মিলন হয়েছে এইখানে। রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন ইয়ুরোপের বার্তাবহ, অপরদিকে তেমনি ভারতীয় ঐতিহ্যের আজ্ঞাবহ। ভারতবর্ষের মূর্তি ধ্যানগম্ভীর, য়ুরোপের মূর্তি যৌবন প্রগলভ। জীবনের যে রূপ রস ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য তাকে তিনি উপেক্ষা করেননি। আবার ধ্যানলোকে ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দের যে আভাস তাও তাঁর কাব্যে পূর্ণ সমাদর লাভ করেছে। বলা বাহুল্য এটিও যৌবনেরই প্রকাশ। এই আনন্দ, সৃষ্টির প্রাচীনতম আনন্দ। এর থেকেই বিশ্ব প্রকৃতির সৃষ্টি, বিশ্বমানবের সৃষ্টি। সবচেয়ে যা প্রাচীন তাই সব চেয়ে নবীন। কারণ যা চিরন্তন তা চির নবীন। রবীন্দ্রনাথের মোহ নতুনের মোহ নয়, নবীনের মোহ। আজকে যা নতুন কালকে তা পুরাতন হবে, কিন্তু নবীনের ক্ষয় নেই। আজকের যুবক

কালকে বৃদ্ধ হবে কিন্তু যৌবনের ক্ষয় নেই। রবীন্দ্রনাথ যে যৌবনের পূজারী তা বয়স নিরপেক্ষ। সে যৌবন অনায়াসে বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে—ন মমার ন জীর্যতি—কখনো মরে না, কখনো জীর্ণ হয় না। বিশ্ব প্রকৃতি সেই যৌবনের প্রতীক। প্রকৃতির মধ্যে কবি এই অক্ষয় যৌবনের লীলা দেখেছেন। এমন যে শীতঋতু প্রকৃতিকে রিক্তভাণ্ড করেছে—তাকেও কবি বলছেন নব-যৌবন-দূতরূপী শীত। বলছেন ভরা পাত্রটি শূন্য করে সে ভরিতে নূতন করি। একেই বলে অক্ষয় যৌবন।

ধরণীর পঞ্চশরে দগ্ধ হয়েছেন কবি আর নিজেকে বিশ্বময় দিয়েছেন ছড়ায়ে। বহুকালের অনাদৃতা ধরণী অকস্মাৎ যৌবন-সরসা হয়ে আমাদের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করেছে। 'স্পর্শ নিয়ে যাব ধরণীর, বলে যাবো তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে।' এই ধূলির তিলকই যৌবনের জয়টিকা। ২২শে শ্রাবণ ধরণীর জয়মন্ত্র উচ্চারণের দিন। সেই জন্যেই শান্তিনিকেতন আশ্রমে ২২শে শ্রাবণ তারিখে বৃক্ষ রোপণ উৎসবের আয়োজন। সেদিন আশ্রম প্রাঙ্গণে নবজাতকের অভিষেক। মৃত্যুদিবসে জন্মোৎসব।

আত্মচরিত

আমি এক রকম স্থির করেই ফেলেছি যে, আত্মচরিত লিখব না। আপনারা নিশ্চয় মনে মনে বলছেন—তুমি বাপু এমন কি ধনুর্ধর ব্যক্তি যে তোমার জীবন কাহিনী শুনবার জন্য আমরা বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। ব্যস্ত আপনারা নন, ব্যস্ত আমি। খ্যাতনামাদের জীবন-চরিত লিখবার জন্য কত লোক ব্যগ্র হয়ে আছে, কিন্তু আমি জানি আমার জীবন কাহিনী আমি নিজে না বললে আর কেউ বলবে না। তথাপি আমি যে আত্মচরিত লিখবার সংকল্প ত্যাগ করেছি তার কারণ এই নয় যে, আমার জীবনে আত্মচরিত লিখবার মতো মালমসলা যথেষ্ট পরিমাণে নেই। আর সত্যিকারের আত্মচরিতে মালমসলার তেমন প্রয়োজনও আমি দেখি না। আমি কি করেছি তার চাইতে আমি কি ভেবেছি তাই নিয়েই আমার চরিত কথা অর্থাৎ আত্মচরিত জিনিসটা কর্ম-কাহিনী নয় মর্মকাহিনী। অপরে যখন আমার জীবন-চরিত লিখবেন তিনি দেখবেন আমার বাইরের দিক্‌টা, কর্মে যার প্রকাশ। আর আমি যখন নিজের কথা বলব তখন নিজেকে দেখব অন্তরের দিক থেকে। সে জিনিসটা নিছক কর্মতালিকা হতে পারে না। আমি যে আমার নিজেকে অপরের চাইতে ভালো করে জানি এইটি প্রমাণিত না হলে আত্মচরিত লেখার কোন সার্থকতা আমি দেখি না।

জীবনচরিত বা আত্মচরিতের লেখককে প্রধানত সাহিত্যিক হতে হবে। এদিক থেকে ঔপন্যাসিক এবং জীবনচরিত লেখকের মধ্যে বিশেষ তফাৎ নেই। উপন্যাস কাল্পনিক নায়কের কাহিনী, জীবন-চরিত বাস্তব নায়কের। নায়ককে জীবন্ত করে দেখতে হ'লে কেবলমাত্র

উপকরণের উপরে নির্ভর করলে চলে না, প্রচুর কল্পনাশক্তি এবং সাহিত্যিক প্রসাদগুণ প্রয়োজন। হিটলারের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং কর্ম-কুশলতা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না; কিন্তু যাঁরা 'মাইন্ কামফ্' নামক গ্রন্থ পাঠ করেছেন তাঁরা স্বীকার করবেন যে, উক্ত গ্রন্থ বহুলাংশে অত্যন্ত নীরস পাঠ্য। তার কারণ হিটলারের সাহিত্যিক প্রতিভা বিন্দুমাত্রও ছিল না। সেদিক থেকে হিটলারের জ্ঞাতিভ্রাতা মুসোলিনি তাঁর চাইতে শ্রেষ্ঠ। মুসোলিনি আত্মচরিত লিখবার আগে উপন্যাস লিখে হাত পাকিয়েছিলেন।

লিখবার আর্ট জানা থাকলে যে কোন ব্যক্তি তাঁর জীবন কাহিনী লিখতে পারেন এবং সে কাহিনী সুখপাঠ্য হতে বাধ্য। অখ্যাত অজ্ঞাত চাষী কিংবা মজুরের জীবন-কাহিনী নিয়ে যেমন প্রথম শ্রেণীর উপন্যাস রচনা সম্ভব এও তেমনি। আত্মচরিত লেখককে খ্যাতনামা ব্যক্তি হতেই হবে এমন কোনো নিয়ম শাস্ত্রে লেখা নেই। একজন ইংরেজ লেখকের আত্মচরিত পড়েছিলাম। সে বই এর নাম—Myself not least—অর্থাৎ আমি কিছু ফ্যালনা লোক নই। সত্যি কথাই তো—সংসারে কেউ ফ্যালনা লোক নয়, সবার জীবনেই উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে এবং সেই কারণে সবাই আত্মচরিত লিখবার অধিকারী।

অতএব—নহি আমি অকিঞ্চন ব্যক্তি—ইত্যাকার কোনো নাম দিয়ে যদি আমার আত্মচরিত লিখতে শুরু করে দিই তবে অপরের কোন আপত্তির কারণ থাকতে পারে বলে আমি মনে করিনে। প্রত্যেকের জীবন কাহিনীই Experiments with life. আবার life এর চাইতে বড় সত্য আর নেই, কাজেই জীবন চরিত মাত্রই Experiments with truth.

আমার মতে স্বনামখ্যাত ব্যক্তিদের আত্মচরিত লিখবার কোনই

প্রয়োজন নেই। তাঁদের সমগ্র জীবন দেশের এবং দশের সম্মুখে প্রসারিত। প্রতিদিনের সংবাদপত্রই তাঁদের ধারাবাহিক জীবন-কাহিনী—ক্রমশ প্রকাশ্য। জওহরলালের আত্মচরিতে তাঁর ছেলেবেলার ফাউন্টেন পেন চুরির কাহিনীটি ছাড়া জ্ঞাতব্য তথ্য কমই আছে যা আগে থেকে আমাদের জানা ছিল না। মহাত্মাজীর আত্মচরিত সম্বন্ধেও ঐ কথাই বলা যেতে পারে। বাল্যকালের দু একটি কৌতুকময় কাহিনী ছাড়া তার জীবনের আর সব তথ্যই পূর্বাহ্নে সাধারণের সম্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। তথাপি সাহিত্যিক প্রসাদগুণ আছে বলে এসব বই অতিশয় সুখপাঠ্য। তা যদি না থাকত এঁদের জীবন কাহিনীও as tedious as a twice told tale হয়ে যেত।

মহাপুরুষদের বাল্যলীলায় এক আধটু চৌর্যবৃত্তি এবং মিথ্যাচারের উল্লেখ অনেকটা যেন নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। মহাত্মাজী গোপনে গয়না বিক্রি করে দোকানের দেনা শোধ করেছিলেন, আত্মচরিতে সে কথাটির উল্লেখ করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে এ ধরণের Confession জাতীয় উক্তিতে আমার আস্থা নেই। ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গে এসব ঘটনার খুব একটা যোগ আছে বলে আমি মনে করিনে। ফাউন্টেন পেন চুরি না করলেও জওহরলাল যা হবার তাই হতেন। ছেলেবেলায় রত্নাকর না হ'লে উত্তরকালে বাল্মীকি হওয়া যায় না এ ধারণা অনেক পাঠকের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। আমি যে আত্মচরিত লিখবার সংকল্প ত্যাগ করেছি এও তার একটা কারণ। ছেলেবেলায় আমি কোন জিনিস চুরি করিনি এমন কথা হলপ করে বলতে পারিনে। কিন্তু স্মৃতি বিভ্রমের দরুন সে সব কথা আমি ভুলে গিয়েছি। কাজেই আমার আত্মচরিতের শুরুতেই মস্ত বড় একটা ফাঁক থেকে যাবার আশংকা আছে। চুরির কথা উল্লেখ না করলে পাঠকরা গোড়াতেই ধরে নেবেন লোকটা

ফাঁকি দিচ্ছে। ছেলেবেলায় চুরি করনি তো আত্মচরিত লিখতে বসেছ কোন্ সাহসে ?

আমার বালককাল যে পরিমাণে নিষ্কলঙ্ক ঠিক সেই পরিমাণে নিষ্প্রভ। ওখানটার আত্মচরিতসুলভ প্রাথমিক stuntএর যথেষ্ট অভাব। রবীন্দ্রনাথের মতো ইস্কুল পালাতে পারলেও না হয় কথা ছিল। দুঃখের বিষয় তাও করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, ছেলেবেলায় ইস্কুল আমার ভালই লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে কোন পরীক্ষা পাশ করেননি সে কথা এমন প্রচ্ছন্ন গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে আমাদের মতো তিনটে চারটে পাশ দেওয়া ব্যক্তিদের মাথা আপনি হেঁট হয়ে আসে। সুভাষচন্দ্রের মতো কলেজ থেকে বিতাড়িত হতে পারলে অবশ্যি আর কথাই ছিল না। এক ঢিলেই অনেক পাঠককে ঘায়েল করতে পারতুম। বেশ বুঝতে পারছি এসব রোমাঞ্চের অভাবে আমার আত্মচরিত পাঠক মহলে মোটেই পাঠরোচক হবে না। ছেলেবেলায় অত্যন্ত সুবোধ বালক হতে গিয়ে ভবিষ্যৎ একেবার মাটি করে দিয়েছি। বাস্তবিক পক্ষে ভালো মানুষ হওয়ার মতো দুর্দৈব সংসারে আর নেই।

মহাপুরুষদের আত্মচরিত সম্বন্ধে আমার একটি অভিযোগ আছে। এঁরা নিজ নিজ বাল্যকালসম্বন্ধে অত্যন্ত কার্পণ্য দেখিয়েছিলেন। দু একটা অসংলগ্ন ঘটনার উল্লেখ করেই জীবনের আদিকাণ্ড শেষ করেছেন। আদি কাণ্ডটা যে সপ্তকাণ্ডের একটা বিশেষ কাণ্ড একথা এঁরা ভুলে যান। ইদানীং বোধ করি, এর প্রয়োজনীয়তা এঁরা বুঝতে পেরেছেন। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো থেকে 'মরা বাচ্‌পন' নামে যে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে তাতেই তার প্রমাণ।

বাল্য ইতিহাস লিখবার প্রধান সার্থকতা এই যে, সাধারণ পাঠক তা থেকে বুঝতে পারবেন যে এঁরা একেবারে রেডি মেড্ মহামানব হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হননি। দায়ে পড়লে আমাদের মতো এঁরাও চুরি

করেছেন, মিথ্যে কথা বলেছেন। তবে উত্তরকালে এঁরা যে সাধু হয়েছেন সেটা দায়ে পড়ে হননি, নিজগুণে হয়েছেন। আমরা যদি বা সাধু হয়ে থাকি, হয়েছি দায়ে পড়ে। সেইজন্যই আমরা মহাপুরুষ নই।

আমাদের দেশে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোনো মহাপুরুষ আলাদা করে বাল্যজীবনের ইতিহাস লেখবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এই ধরণের লেখার একটি বিশেষ সৌন্দর্য আছে। এই স্বল্প-পরিসর আত্মচরিতে বালখিল্য ব্যক্তিটি নিজে অকিঞ্চন পাত্র। তাঁর চোখে আর সবাই হিরো। 'ছেলেবেলা' নামক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ হিরো নন, হিরো ব্রজেশ্বর। অন্তত অনেক হিরোর মধ্যে ব্রজেশ্বর অন্যতম।

কুঁড়েমির কথা

আমি কুঁড়ে মানুষ। আত্মীয় এবং বন্ধু মহলে আমার সম্বন্ধে এই জাতীয় একটা অপবাদ প্রচলিত আছে। অবশ্যি আমি নিজে এটাকে অপবাদ বলে স্বীকার করি না, বরং আলস্য জনিত আরামের সঙ্গে মনে মনে এই নিয়ে গর্বই অনুভব করি। ছেলেবেলায় আমি আপনাদের মতো নীতিপাঠে জাড্য দোষ পরিহারের উপদেশ পড়েছি এবং জাড্য দোষ ত্যাগ না করলে যে আঢ্য লাভের সম্ভাবনা নেই সে কথাও শুনেছি। কিন্তু আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন অলস ব্যক্তিমাত্রেরই মন সম্পূর্ণরূপে নীতিভার মুক্ত, সুতরাং আর সব নীতিবাক্যের মতো আমি এটিকেও নির্বিবাদে বর্জন করেছি। বিশেষ করে আপনারা দেখবেন এই নীতিবাক্যটির মধ্যে তর্কশাস্ত্রের খুঁত রয়েছে। কারণ, এ যুগের শাস্ত্রীদের মতে ধনিক শ্রেণীকে বলা হয়েছে leisured class অর্থাৎ যাঁরা কোনও কালে কোনও কাজ করেন না, বলতে গেলে যাঁরা কুঁড়ের বাদশা। তাহ'লেই দেখুন আঢ্য লাভের জন্য আর যাই করা প্রয়োজন জাড্য দোষ ত্যাগের কোনও প্রয়োজন হয় না।

ধনীলোক মাত্রই অলস তাই থেকে আপনারা মনে করবেন না অলস লোক মাত্রই ধনী। ন্যায়শাস্ত্রে এমন কথা কখনই বলে না। ধরুন, সত্য কথা অপ্রিয় হয়, তাই বলে অপ্রিয় কথা মাত্রই সত্য হয় না। কাজেই আমি যে পরিমাণে জাড্য চর্চ্চা করেছি, বলা বাহুল্য, সে পরিমাণে আমার আঢ্য লাভ হয় নি।

কিন্তু একদিক থেকে আমার মস্ত লাভ হয়েছে। কুঁড়েমির দৌলতে আমি পরম শান্তিতে আছি। লোকে বলে বোবার শত্রু নেই, আমি

বণি কুঁড়ের শত্রু নেই। যে কোনও কালে কোনও কাজ করেনি সে নির্ঝঞ্ঝাট ব্যক্তি। তাকেই বলা চলে অজাতশত্রু। যারা সকল কাজের কাজী কেউ তাদের মিত্র নয়, তারা ঝঞ্ঝাট বাঁধায় ফলে মানুষের অভিশাপ কুড়িয়ে বেড়ায়।

এসব আমার মনগড়া কথা নয়, ইতিহাস খুঁজলেই এর নিদর্শন পাবেন। যাঁদের আমরা কর্মবীর বলে জানি তাঁরাই মানব সমাজের সব চেয়ে বেশি অকল্যাণ করেছেন। খলিফা ওমার ছিলেন দিগ্বিজয়ী বীর। পৃথিবীতে অনেক অঘটন ঘটিয়েছেন, আলেকজান্দ্রিয়ার বিরাট গ্রন্থাগার তিনি পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ বহু জ্ঞানবীর বহুযুগের নীরব সাধনায় যে জিনিস গড়ে তুলেছিলেন এই কর্মবীরটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাই ভস্মসাৎ করেছিলেন। আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। সি হুয়াং টি নামে চীন দেশে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি নিজেকে চীন দেশের প্রথম সম্রাট আখ্যা দিয়েছিলেন। অবশ্যি তাঁর পূর্বেও চীন দেশে ছোট বড় মাঝারি অনেক রাজা রাজত্ব করেছেন। কিন্তু সি হুয়াং টি'র মতে তাঁর পূর্বে যা কিছু হয়েছে সবই অবান্তর। তাঁর রাজত্ব থেকেই ইতিহাসের আরম্ভ। কাজেই তিনি আদেশ দিয়েছিলেন, তাঁর পূর্বে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে সমস্ত পুড়িয়ে ফেলতে হবে, যেন পূর্বতন ইতিহাসের চিহ্নমাত্র না থাকে। তাঁর আজ্ঞাবহরা সে আদেশ পালন করেছিল। কোন কোন জ্ঞান তপস্বী কিছু কিছু প্রাচীন পুঁথি মাটির তলায় লুকিয়ে ফেলেছিলেন। সি হুয়াং টি'র মৃত্যুর পরে সে সব মাটি খুঁড়ে বের করা হয় কিন্তু বেশির ভাগ প্রাচীন গ্রন্থই সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়েছিল। এ হ'ল আর একটি কর্মবীরের কীর্তি। তৈমুর লঙ্, চেঙিস খাঁএর ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও মানব সভ্যতার আংশিক সমাধি ঘটেছে। বর্তমান জগতে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছিলেন সেই হিটলারও মানবসমাজে সক্রিয়তার অভিশাপ বহন করে এনেছেন।

An active brain is devil's workshop. তার প্রমাণ এ সব কর্মবীরদের কীর্তিকলাপ। এঁরা কাজ বোঝেন, অবসর যাপনের আর্ট জানেন না। এরা ভোজসভায় রাজনীতির বক্তৃতা করেন, বন্ধু মজলিশে কূটনৈতিক চাল চালেন, বিয়ার সেলারএ বিয়ার না খেয়ে রাজনৈতিক পুটস্এর আয়োজন করেন। হিটলারের মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র আয়েস কিংবা আরামপ্রিয়তা থাকত নিদেন পক্ষে ভদ্রলোক যদি ধূমপান কিংবা মদ্যপানের অভ্যাসটাও করতেন, তবে পৃথিবীতে এত বড় সর্বনাশটা ঘটত না। ইংরেজ সাহিত্যিক জে বি প্রিস্টলি বলেছিলেন—১৯১৪ সনের গ্রীষ্মাবকাশে সব দেশের পররাষ্ট্র সচিবরা যদি যাঁর যাঁর রাজধানী ছেড়ে কিছু দিনের জন্য হাটে মাঠে ঘাটে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করে বেড়াতেন, আর কিছু না হোক শুধু গাছ তলায় পা ছড়িয়ে বসে পাইপ টানতেন তবে চৌদ্দ সনের সর্বনেশে যুদ্ধটা বোধ করি হ'ত না।

ঘরের কাছের একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। আমাদের চীনা প্রতিবেশীরা বেশ তো ছিল। আপিংএর নেশায় বুঁদ হয়ে বহু যুগ তারা কাটিয়ে দিয়েছে, কোনও ফ্যাসাদ ছিল না। সান ইয়াৎ সেনের পরামর্শ শুনে আপিংও ছাড়ল, ফ্যাসাদও বাঁধল। স্বার্থজ্ঞান টন্‌টনে হ'য়ে উঠল। সংঘর্ষ বাঁধল নিজের স্বার্থে, জাপানের স্বার্থে, ইয়োরোপের স্বার্থে। স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে। গত মহাযুদ্ধের শুরু হয়েছে চীন দেশে। ইয়োরোপের যুদ্ধ থেমেছে, চীন দেশের যুদ্ধ এখনও থামে নি। কত দিন এর জের চলে তাই দেখুন।

পৃথিবীতে যাঁরাই শান্তিকামী তাঁরাই মানুষের কর্মব্যস্ততাকে সংযত করবার চেষ্টা করেছেন। স্যার টমাস মূর যে ইয়োটপিয়া বা আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনা করেছিলেন তাতে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কোনও ব্যক্তিই সারাদিনে ৬ ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারবে না। আজকাল পৃথিবীময় কলের মালিক আর কলের মজুরদের মধ্যে এই ওয়ার্কিং

আওয়ার নিয়ে কত গোলমাল চলছে। চার শ' বছর আগে মুর যে কথা বলে গিয়েছেন আজকে শ্রমিকরা সেই দাবীই করছে। এর অর্থ-নৈতিক দিকটা ভেবে দেখুন। একজন লোক কাজ কম করলে আর একজন কাজের সুযোগ পায়, ওয়ার্কিং আওয়ার কমিয়ে দিলে আরও অনেক নতুন লোক এমপ্লয়মেণ্ট পেতে পারে। অর্থনীতিজ্ঞরা বলেছেন বর্ত্তমান দুর্গতির মূলে হচ্ছে ধন বণ্টনের অসাম্য বা unequal distribution of Wealth. আমার মতে এই যে পৃথিবী যোড়া বেকার সমস্যা তার মূলে রয়েছে unequal distribution of work. একজন প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাজ করছে, আর একজন ঠায় বসে আছে— কোলরিজের প্রাচীন নাবিকের মতো বলছে—কাজের সমুদ্রে ভাসছি, কিন্তু আমার বেলায় এক রত্তি কাজ জুটছে না।

স্যার টমাস মুর-এর মতো রবীন্দ্রনাথও আমাদিগকে একটি ইয়োটপিযা বা সব পেযেছির দেশের সন্ধান দিয়েছেন। সেখানে কোনও ব্যক্তির কোনও কাজের তাড়া নেই। যে চলে সেই গান গেয়ে যায় সব পেয়েছির দেশে। সেই দেশটি যে পরম সুখের রাজ্য সে বিষয়ে বোধ করি কারোই সন্দেহ নেই।

আপনারা হয়তো বলবেন আমি কুঁড়েমির কথা নিয়ে কাব্যিয়ানা করছি। কবিদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। বার্ট্রাণ্ড রাসেল মহা-মনীষী ব্যক্তি, তাঁকে বৈজ্ঞানিক বলা যেতে পারে। তিনি বলেছেন— I have hopes of idleness as a creed. তিনি আলস্যতাকে ধর্মের উচ্চাসনে বসিয়েছেন। তাঁর মতে আগামী দিনের সভ্যতার বনিয়াদ যাঁরা গড়বেন তাঁরা আগের দিনের সভ্যতাভিমানীদের মতো কর্মবীর হবেন না। মহাত্মা গান্ধী পৃথিবীর শান্তিকামীদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। তিনিও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছেন; কিন্তু তাঁর সংগ্রাম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ। কিছুই করতে হবে না, শুধু বলব

অন্যায়টাকে মানিনে। অন্যায়টার ঘাড়ে গর্দানে ধরে তাকে দু ঘা কষিয়ে দেবার তো কোনও প্রয়োজন নেই। ভবিষ্যৎ মানবের ইতিহাস এঁরাই গড়বেন মানুষের কর্মব্যস্ততায় লাগাম কসিয়ে দিয়ে।

আমরা যে ভগবানের সৃষ্ট জীব আমাদের বেদান্ত দর্শনে সেই দেবতাকে বলা হয়েছে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। বেদান্তবাদীদের মতে ব্রহ্ম আপ্তকাম—তাঁর কোনও কামনা বাসনা নেই। আর মানুষ হচ্ছে কামনাগ্রস্ত জীব। সে নিত্য অভাব সৃষ্টি করে, সেই অভাব পূরণের জন্যই তার কর্মরতি। এই কর্মস্পৃহা থেকে যত রকম দুর্গতির উৎপত্তি। ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয় এবং নির্বিকার। মানুষ ক্রিয়াশীল সুতরাং বিকারগ্রস্ত।

অলসতার স্বপক্ষে একটি খুব বড় কথার উল্লেখ এখনও করা হয় নি। পৃথিবীর শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন যত কুঁড়ে মানুষের দল। শিল্প-সাহিত্যকে বলা হয়েছে arts of peace and leisure. আজকের কর্মব্যস্ত মানুষ তার অবসরকে খর্ব করে শিল্প-সাহিত্যকেই টুঁটি চেপে মারছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন তো রবীন্দ্রনাথকে যদি আর দশজনের মতো দশটা পাঁচটা আপিস করতে কিংবা ইন্‌সিওরেন্সের দালালি করতে হ'ত তবে একশ সত্তরখানা গ্রন্থের মধ্যে ক'খানা তিনি লিখে উঠতে পারতেন? পণ্ডিত জওহরলাল সকাল সাতটায় চা খেয়ে এরোপ্লেনে চাপলেন। সাড়ে আটটায় পৌছলেন চট্টগ্রামে। জনসভায় বক্তৃতা করলেন, শহর থেকে পনর মাইল দূরে এক গ্রামে গিয়ে আর এক দফা বক্তৃতা হ'ল। লাঞ্চ খেয়ে আবার রওনা, ঢাকায় পৌছলেন বেলা আড়াইটেতে। সেখানে নাগরিক সম্বর্দ্ধনা, জনসভায় বক্তৃতা ইত্যাদি সেরে সন্ধ্যার আগেই কলিকাতায় ফিরে এসে চা পান করলেন। এই যদি তাঁর দৈনিক কার্য্যক্রম হয়, তবে তাঁকে দিয়ে দেশোদ্ধার হয়তো বা হ'তে পারে, কিন্তু দেশের শিল্প সাহিত্যের ভাণ্ডারে অনেকখানি বাদ পড়ে যাবে। ভাগ্যিস আমাদের ইংরেজ সরকার বুদ্ধি করে তাঁকে মাঝে মাঝে কুঁড়েমি করবার

অবসর জুগিয়ে দেন ; তাই না পৃথিবীর ইতিহাস লেখা সম্ভব হ'ল এমন কি ভারতবর্ষ পুনরাবিষ্কৃত হ'ল। শিল্পী এবং সাহিত্যিককে আমরা বলি সভ্যতার বাহন। আবার প্রচুর অবসর হচ্ছে এ দুইএর উপজীব্য। তাহ'লে তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী আমরা বলব সভ্যতার জন্ম হয়েছে অলসতা থেকেই।

আমি ভেবে দেখেছি কাজ মানুষকে শ্রীহীন করে ফেলেছে। এই যুগ হচ্ছে ব্যস্তবাগীশের যুগ, আর ব্যস্তবাগাশ মানুষ যেমনি হাস্যকর তেমনি শ্রীহীন। আজকের মানুষ চক্রবাহন, চক্রান্তে তার আহ্লাদ। পায়ে হেটে চলে না, চক্রযানে চলে। দুদণ্ড বসে বন্ধু সংসর্গে বিশ্রম্ভালাপের সময় নেই, টেলিফোনে কথা কয়। রঙ্গীন খামে পাতার পর পাতা চিঠি না লিখে টেলিগ্রামে সংবাদ পাঠায়। টেলিগ্রামটা এসে হরবর তরবর করে সংবাদ পেশ করে। সব কথা গুছিয়ে বলবার সময় নেই, মাঝখানে কথা ছেড়ে ছেড়ে যায়। তার মধ্যে সম্ভাষণ নেই, ভাব্যতা নেই, ব্যাকরণ নেই। আজকের জীবনের মধ্যে একটু অলস মন্থরতা নেই, মানুষের ক্লান্ত মুখে এতটুকু সুষমা নেই।

ইয়োরোপ একটি বিচিত্র কথার সৃষ্টি করেছে, বলে dignity of labour. এটা হচ্ছে এ যুগের সব চাইতে বড় চালাকি। মজুরির মধ্যে যে বিন্দুমাত্র dignity নেই সে কথা আপনিও জানেন আমিও জানি। সমাজ সেই ব্যক্তিকেই সম্মান দিচ্ছে যাকে কোনও কাজ করতে হয় না। অথচ এই কথাটার আমদানি তাঁরাই করেছেন যাঁরা হচ্ছেন সেই leisured class বা অবসরভোগী সম্প্রদায়ের লোক। Exploitation-এর সব চেয়ে বড় অস্ত্র এই মিথ্যে dignityর বুলি।

আদি যুগের অসভ্য মানুষ—কথায় কথায় রক্তপাত করেছে এ যুগের সভ্যতাভিমানী মানুষ অকারণে ঘর্মপাত করে। রক্তপাত আর ঘর্মপাত দুটোই বর্বরতার লক্ষণ। আদি যুগের ইতিহাস মানুষের রক্তপাতে

কলংকিত। আধুনিক ইতিহাস রক্ত এবং ঘর্ম দুই মিলে বীভৎস হয়ে উঠেছে। আজকের দিনের ঘর্মাক্ত কলেবর পৃথিবীর মূর্তিটা একবার কল্পনা করে দেখুন। রৌদ্রদগ্ধ পথের কুকুরের মতো জিব বের করে হাঁপাচ্ছে। ভাবলেই করুণা হয়। এই ভাবে চললে মানবজাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। আমি সেই আগামী দিনের কবির আশায় বসে আছি যিনি এসে মানুষকে কাজ-ভোলানো গান শুনিয়ে প্রকৃতিস্থ করবেন। ইতিমধ্যে অন্তত রবীন্দ্রনাথের কথাটা শুনে আসুন আমরা যথাকর্ত্তব্য করি :—

এস ভাই তোল হাই, শুয়ে পড় চিৎ
অনিশ্চিত এ সংসার একথা নিশ্চিত।

———